বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা

প্রধান সম্পাদক

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ মুরারিমোহন সেন· ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার· ডঃ ব্রতীশ ঘোষ· ডঃ তুষার মহাপাত্র· ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক· ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়· ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

ন ব প ত্র প্র কা শ ন

ভূমিকা

১

সম্প্রতি মনের জগতে বাঙালী দেউলে হতে বসেছে, শিক্ষার জগতে ব্রাত্যের কলঙ্কতিলক ভালে ধারণ করে একান্তে অবস্থান করছে, বিত্তের জগতে কাঞ্চন-কৌলীন্য হারিয়ে নিষ্কিঞ্চনতার শূন্য ঝুলি স্কন্ধে ফেলে বৈরাগ্যের বড়াই করছে। সংগ্রাম বিপ্লব ইত্যাকার উত্তপ্ত রাজনৈতিক বুলি বিধানসভায় বিবদমান দল-উপদলের 'চাপান-উতোরে' পর্যবসিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, যখন পায়ের তলা থেকে জননী বসুন্ধরার ঠাঁইটুকুও অপসারিত হয়ে যাচ্ছে, তখন এই নিবন্ধসংগ্রহটি কেন প্রকাশে উৎসাহী হওয়া গেল তার কারণটি দু-এক কথায় নিবেদন করি।

পশু ও মানুষের মধ্যে একটা বড়োরকমের পার্থক্য হচ্ছে মন। পশু যখন তৃণভূমিতে বিচরণ করে, আমমাংসের লোভে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, অতিভোজনে নিদ্রা যায়, কিংবা প্রজননক্রিয়ার দুর্নিবার আকর্ষণে সঙ্গিনীকে আয়ত্তের মধ্যে আনে, তখন সে নিতান্তই আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন প্রভৃতি স্থূল শারীরবৃত্তির দ্বারাই চালিত হয়। কিন্তু মানুষ তদতিরিক্ত প্রয়োজনের বশে অরণ্য ছেড়ে গুহাভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে, আমমাংসের বদলে অগ্নিপক্ক মাংসে তার রুচি বাড়ে, স্থূল দেহবাসনা একপ্রকার নির্দেহী আবেগ, আনন্দ ও বেদনার জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বায়ন লাভ করে, যাকে বলা যাবে প্রেম। আসলে মানুষ মনোজীবী, পশুরা দেহজীবী। তারা বংশানুক্রমিকতার দ্বারা দেশে ও কালে বিস্তার লাভ করে, কেউ কেউ-বা দেশকাল থেকে অপসৃত হয়ে স্মৃতির যাদুঘরে আশ্রয় নেয়। মানুষ দেশকাল সীমা অতিক্রম করে মনের ক্ষেত্রে অক্ষয়বটের বীজ বপন করে। এই মনের ক্রিয়া হল যমজ। জগৎ, জীবন ও জগদাতীত সত্তার প্রতি মানুষের কৌতূহল বেড়েছে সৃষ্টির ধাপে ধাপে। প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রকৃতির প্রতি তার ছিল বিস্ময়, কখনো-বা ভয়-ভীতি। ক্রমে অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি, ঘটনার পশ্চাতে আকস্মিকতার স্থলে অনিবার্যতার আবিষ্কার, এবং মনের মধ্যে বিশ্বকে প্রতিফলিত করে প্রত্যভিজ্ঞামূলক বস্তুপ্রত্যয়কে একটা চিদানন্দময় ব্যক্তিক সত্যরূপে উপলব্ধি করা তার মননের বিশেষ প্রকৃতি হয়ে পড়ল।

ধর্ম, দর্শন, নীতি—মানসিক নানা চর্যা ও বিদ্যার চর্চা একালে আমাদের মনকে উতলা করে তোলে। বাইরে ছড়িয়ে আছে এলোমেলো বিশৃংখল বস্তুপুঞ্জ, যার ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তার পারমার্থিক সত্তা আকার-আয়তন-

পরিমাণহীন অপরিণামী নৈঃশব্দ্যে বিলীয়মান। অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা এই বস্তুর স্বরূপ ও তাৎপর্য বুঝতে চাই। একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক ও সংযোগ যুক্তির মধ্যে না আনতে পারলে বিবেকবান মানুষ কিছুতেই স্থির হতে পারে না। যুক্তির পারম্পর্য মানুষের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার, তার মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য। যুক্তির দ্বারা আমরা জগৎ ও জীবনকে অধিগত করতে চাই; এই মননশীলতাই সমগ্র জাতির ঐতিহ্যগত ঋকৃথ। উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালীর মনে জগৎ, জীবন ও বহির্জাগতিক চেতনা তার চিন্তার সম্পদগুলিকে কতটা মার্জিত করেছে, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ধর্মাচার ও সদসৎ বোধরহিত রহস্যময় অনুভূতিকে কতটা তীক্ষ্ণ করেছে, এবং বাংলা গদ্যভাষায় তার স্বরূপ কতটা ধরা যায়, এই সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে আমাদের মনে হয়েছে, এই প্রায় দেড় শতাব্দীর বাঙালীর মনোলোকবাসী বীজকণাকে তুষমুক্ত করার চেষ্টা করে দেখা যাক, এ জাতির সমস্ত মানসিকতার অন্তরালে বিশেষ কোন্ সাধনা, শীল ও সদাচার ক্রিয়াশীল হয়েছে। বিশেষ কোনো কল্পান্তস্থায়ী তত্ত্বজ্ঞান, না ক্ষণভঙ্গ-বাদী অবভাস, কোনো চিন্তামণি, না কাচখণ্ড আমাদের হস্তামলকে পর্যবসিত হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের চিদাকাশে ভারতীয় পরাবিদ্যা ও য়ুরুপার অপরাবিদ্যা, দুয়ের রাসায়নিক, না যান্ত্রিক, কোন্ শ্রেণীর বিমিশ্রণ ঘটেছে, আমরা শিরীষ-বৃক্ষবাসী তালবেতালের কূট প্রশ্নের কতটা উত্তর দিতে পেরেছি, অথবা স্ফিংক্স রাক্ষসীর প্রহেলিক-প্রবন্ধের যুক্তিসঙ্গত সমাধান করতে পেরেছি কিনা—এই সঙ্কলনের নিবন্ধগুলি তার উপকরণ হিসেবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হল। বলা বাহুল্য, মূলতঃ ধর্ম, দর্শন, তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যে-সমস্ত বাংলা গ্রন্থ ও বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, যার কিছু পরিচিত, অনেকটাই অপরিচিত, এখানে সেই ধরনের প্রবন্ধই সঙ্কলিত হয়েছে।

২

পুরাতন কাল থেকে শুরু করে ইদানীন্তন কাল পর্যন্ত বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি প্রধানতঃ আবেগময়। তত্ত্বকে রসের আধারে, অরূপকে রূপকের পরিচ্ছদে আবৃত করে দেখাই তার স্বভাবধর্ম। অবশ্য বিশুদ্ধ আবেগ কোন কোন সময়ে নৈরাজ্যবাদী, স্বপ্নবিলাসী, ঐতিহ্যবর্জিত, চলতাধর্মী ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তুরীয় মার্গের নির্ভেজাল আবেগ কোন মহৎকর্ম সম্পাদনে অনেক সময়েই ব্যর্থ হয়। জাতির মেরুদণ্ড খাড়া থাকে মননের দ্বারা। মধ্য-যুগের বাঙালীর রসের পরিচয় পাওয়া যাবে ছ'শ বছর ব্যাপী বাংলা সাহিত্যে;

সে-সাহিত্যও কোন মার্জিত নাগর-সাহিত্য নয়, গ্রামীণতা তার মূল চরিত্র। ভারতচন্দ্রের কিছু কিছু চিত্তচমৎকারী বাগ্‌বৈভব বাদ দিলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গাত্রাবরণ থেকে গ্রাম্য আর্দ্রমাটির গন্ধ কখনো দূরীভূত হয় নি। অবশ্য পাল-সেন যুগ থেকেই এদেশে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশে কিছু কিছু রচনা হয়েছে ; 'অক্ষরডম্বর'-যুক্ত গৌড়ী রীতির দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃতে কিছু কিছু এমন লেখা পাওয়া গেছে যাতে বাঙালীর সাহিত্যচর্চা প্রকাশিত হয়েছে ; অবশ্য বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের বিশেষ প্রভাব উক্ত যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না। জয়দেবকে বাদ দিলে সর্বভারতীয় সারস্বত যজ্ঞে আমাদের কী-ই বা দেবার থাকে। কিছু ব্যাকরণ-অভিধান-আয়ুর্বেদ-ন্যায়-মীমাংসা প্রভৃতি 'অ-সাহিত্য' অনুশীলনে সেকালের বাঙালী পণ্ডিতসমাজ বেশ দক্ষ ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণব গোস্বামীপ্রভুদের দ্বারা যে-সংস্কৃত রচনার অনুশীলন শুরু হল, তা বিশুদ্ধ ভক্তিবাদী বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বচর্চা, আবেগ তার মূল প্রকৃতি হলেও সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক পারম্পর্য ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-প্রবণতাও তাতে উপেক্ষিত হয় নি। বিশেষতঃ নব্যন্যায়ের অনুশীলনের ফলে তত্ত্ববিদ্যা ও নৈয়ায়িক চর্চায় বাঙালীর বিশেষ সংস্কার জন্মে গিয়েছিল। বিস্ময়ের কথা, একইকালে আবেগ ও মনন, রসচর্চা ও যৌক্তিক পারম্পর্যবাদ বাঙালীমনের যুগ্মধারারূপে স্বীকৃত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য-দেব ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রায় একই কালের ব্যক্তি। একজন ভাবাবেগে আত্ম-হারা, আর-একজন সূক্ষ্ম চিন্তার সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে তৎপর। একজনের অবলম্বন হৃদয়, আর-একজনের বিষয় বুদ্ধির ব্যায়াম। এই যে ধাতুপ্রকৃতির বৈষম্য, মধ্য-যুগেই এর প্রকাশ ঘটেছিল বাঙালীর সাধনা ও চিন্তায়। চৈতন্য-জীবনীকাব্য, বিশেষতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বৃন্দাবনের গোস্বামী-প্রভুদের সংস্কৃতে-রচিত বৈষ্ণব রসতত্ত্ব, দর্শন ও নীতিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে সর্বাঙ্গীণ মনস্বিতা ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সমস্ত নির্বস্ত আলোচনায় এবং ভাবাবেগবেপথু অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণেও বাঙালীর তুল্যাধিকার লক্ষ্য করা যাবে।

মধ্যযুগের বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যে দার্শনিক প্রবণতা কখনো সূক্ষ্ম ও অস্পষ্টভাবে, কখনো লক্ষ্যগোচরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধসহজিয়া, শৈব নাথপন্থ, আর্যেতর সংস্কার থেকে উদ্ভূত মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তিতত্ত্ব, শাক্ত তন্ত্রাশ্রিত শ্যামাসঙ্গীত, আউল-বাউল সাঁই-সূফী, মারফতি-মুর্শিদা প্রভৃতি গান—যা বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের মূল কাঠামো, তার মৃত্তিকালগ্ন মনও যে মাঝে মাঝে দূর আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সমর্থ, এই

সমস্ত মননধর্মী রচনাই তার প্রমাণ। বস্তুতঃ বাঙালীর মন যে উভচর, স্থলের স্থূলত্ব ও জলের তারল্যে যে সমভাবে আকর্ষণ বোধ করে থাকে, তা মধ্যযুগের কিছু কিছু রচনায় লক্ষ্য করা যাবে।

৩.

বাঙালীমনের যথার্থ মননশীলতা ফুটেছে একালে। উনিশ শতকের দুই-তিন দশক ধরে, চিন্তার বহু উচ্চাবচ পথ পার হয়ে একাল পর্যন্ত তার দার্শনিক, তাত্ত্বিক ও যুক্তিমার্গীয় বিজ্ঞানমনস্ক চেতনায় প্রস্তুত হয়েছে। অবশ্য তার সঙ্গে চলেছে আবেগের ফসল—কাব্য, কথাসাহিত্য ও নাটকে তার ভূরিপরিমাণ দৃষ্টান্ত আছে। বস্তুতঃ রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, এবং তার পরেও তিন-চার দশক ধরে বাঙালীর মনোধর্মী রচনাসমুৎকর্ষ বাংলা গদ্যসাহিত্যকে বরণীয় করেছে। দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ধর্মতত্ত্ব, বিশেষতঃ আচারমূলক ধর্ম, সমাজনীতি ও শিক্ষানীতি অবলম্বনে সাময়িক পত্রিকায় প্রচুর বিতর্ক ও সমালোচনা হয়েছে, যার অনেকটাই গতায়ু সাময়িকপত্রের সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে গেছে ; যদিও তাতে কেবলমাত্র সাময়িকতার ক্ষণস্থায়ী লক্ষণ ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ—প্রায় শতবর্ষের বাঙালীমনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল ঘরে তুলবার জন্য আমরা একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করি, নবপত্র প্রকাশনের শ্রীযুক্ত প্রসূন বসু তাতে কৌতূহল প্রকাশ করে আমাদের শিরঃপীড়া অনেকাংশে দূর করেন। এই একশ বছর ধরে দর্শন-ধর্ম-তত্ত্ববাদে বাঙালীর মৌলিক প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে এই খণ্ডে কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। ব্যক্তির দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর কালসীমা। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরেও নানাবিভাগে প্রবন্ধসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। বাঙালী-চেতনার পূর্বাপর সঙ্গতি পরীক্ষার অভিপ্রায়ে একালের তাত্ত্বিকদেরও কিছু কিছু রচনা এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা বাঙালীমনীষার অন্যান্য শাখাগুলিকেও ক্রমশঃ কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করি। সমাজবিজ্ঞান-নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান, ভাষা-সাহিত্য-শিল্পতত্ত্ব, সমালোচনা ও রসতত্ত্ব প্রভৃতি নানা পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যায় একালের বাঙালীর উত্তরাধিকার কোন্ পথ অবলম্বন করেছে, ক্রমশঃ প্রকাশ্য সঙ্কলনগুলিতে তারই নিদর্শন সংগৃহীত হবে। যে-সমস্ত গ্রন্থ একালে সুপ্রচলিত, পাঠক হাতের কাছেই যার সন্ধান পান, তার বহুর কিছু কমিয়ে, যে-সমস্ত গ্রন্থ আজ আর প্রচলিত নেই, যে-সমস্ত মূল্য-

বান প্রবন্ধ বিস্মৃত সাময়িকপত্রেই রয়ে গেছে, অথচ তার মধ্যে ধর্ম-দর্শন-তত্ত্ব-বিষয়ে মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, তাদের মূকত্বের অভিশাপ থেকে উদ্ধার করে গ্রন্থাকারে পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই খণ্ডে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-দর্শন-তত্ত্ববিষয়ক রচনা থেকে শুরু করেছি। কেউ কেউ বলতে পারেন, আর-একটু পিছিয়ে গিয়ে রামমোহন থেকে শুরু করাও চলত। রামমোহন চিন্তার জড়ত্ব মোচনে ধৃতাস্ত্র প্রথম ক্রুশেডিয়ার তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি মূলতঃ তার্কিক, নৈয়ায়িক, যুক্তিপন্থী। বাংলা গদ্যে 'পলেমিক' রচনার তিনিই পথপ্রদর্শক। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা তাঁর প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে নি। কারণ মনের দিক থেকে তিনি সংস্কারকামী, বাস্তববাদী ও ঐহিক কল্যাণবোধে দৃঢ়আসক্ত। এদিক থেকে তিনি যেন উনিশ শতকের নব্য য়ুরোপের যথার্থ প্রতিনিধি। অপর দিকে তিনি ভারতীয় সনাতন জীবনধারায় নিজেকে পুরোপুরি গড়ে তুলেছিলেন। তর্ক-বিতর্ক ও লিপিযুদ্ধে এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়জনোচিত বীরধর্মেরই পরিচয় দিয়েছেন। এইজন্য তাঁর বেদান্তধর্ম, বেদান্তগ্রন্থ, সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তম সম্বাদ, পথ্যপ্রদান, গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকা থেকে কোন নিবন্ধ এই সঙ্কলনে গৃহীত হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে একাল পর্যন্ত সীমা প্রসারিত করে তত্ত্ব-দর্শন-ধর্ম-নীতিবিষয়ক কয়েকটি নির্বাচিত প্রবন্ধ, কখনো গোটা প্রবন্ধ, কখনো কিছু সংক্ষেপ,—এই সঙ্কলনে মুদ্রিত হয়েছে। পর্যায়বিন্যাসে আমরা তত্ত্ব-দর্শন ও ধর্মবিচার সম্পর্কে বাঙালীর চিন্তাধারাকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের কালক্রম ধরে বিষয়সন্নিবেশ করেছি। তিমিরাবৃত বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আলোকোজ্জ্বল বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের যে সাধনা, সংস্কার ও চর্যা বাংলা গদ্যে রূপ পেয়েছে, এখানে পাঠক তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবেন। বৈদিক যুগের কাম্যকর্ম ও বহুদেববাদ, ঔপনিষদিক যুগের জ্ঞানাত্মক চিত্তোৎকর্ষ এবং বৌদ্ধযুগের বেদ-বিরোধী ও বেদবহির্ভূত চিন্তা ও সংস্কারের দ্বারা ভারতবাসীর মন মার্জিত হয়েছিল। বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিকতা, জৈন ও বার্হস্পত্য সম্প্রদায় এবং আরো কিছু কিছু বস্তুবাদী ও ঐহিক সুখান্বেষীর দল খ্রীস্টপূর্ব শতাব্দী থেকেই এই সমস্ত চর্যা, শীল, সাধনা ও দেহতন্মাত্র-আশ্রিত ভুক্তিমুক্তি তত্ত্বের দ্বারা সমাজের অন্তরে ও বাইরে বিচিত্র দল-উপদল সৃষ্টি করেছিল। বৌদ্ধেরা তো সবই শূন্য, সবই অনাথ, কেবল নির্বাণ-ই শান্ত বলে একই সঙ্গে পঞ্চস্কন্ধাত্মক রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-ষড়ায়তনের ও পুদ্গলকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু কায়াকে তো শূন্য বলে অবহেলা করা যায় না—কারণ 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন'। সুতরাং কায়াসাধনা করো, রস-রসায়ন চর্চা করো, দেহের মধ্যেই বৈদেহী মুক্তি মোক্ষ-নির্বাণ লাভ করো। অতএব দেখা যাচ্ছে, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ভারতীয় চিন্তাজগতে প্রায় নৈরাজ্য নেমে এসেছিল। বৌদ্ধধর্মের তথতা ও শূন্যবাদ, আর তার সঙ্গে দেখা দিল জৈনদের 'ত্রিরত্ন', অর্থাৎ সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ চারিত্র। এই দুই মানসিক ও নৈতিক চর্যার মধ্যে দোলায়িত হচ্ছিল বার্হস্পত্য মত—যাঁরা মননে দেহাত্মবাদী ও নাস্তিক, দৃষ্টিভঙ্গীতে বাস্তববাদী এবং আচরণে ও উদ্দেশ্যে ইহকামী হেডোনিস্ট্। বেদবিরোধীরা, কেউ শূন্যতার মহাগহ্বরে, কেউ পারমার্থিক দিক থেকে নঙর্থক পুদ্গলতত্ত্বে, কেউ-বা দেহ-সরোবর মন্থন করে অমূল মৃণালের খোঁজে তৎপর হল, কেউ শিরঃস্থিত সহস্রারে সুষুম্না নাড়ীবাহী শিবশক্তির যুগনদ্ধ সামরস্যসম্ভূত সর্ববিধ বিকল্পাতীত তুরীয়ানন্দে বিভোর হলেন, যার মূলে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল কাম। এঁরা কায়াকেই এবং তদনুষঙ্গকে অস্তিত্বের একমাত্র মূলাধার এবং কায়াকেন্দ্রিক ভোগসমুখ অবাধ ইন্দ্রিয়চর্চাকেই পরম পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করলেন। এই যে চিন্তার রাজ্যে নৈরাজ্য, বিশৃংখলা, পারস্পরিক বিবদমানতা—খ্রীস্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে পুরাণ-ঐতিহ্য ও ষড়দর্শন, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত আচার-আচরণ, স্মৃতি-সংহিতার অনুশীলনে আবার নতুনভাবে ভারতীয় মানসে সমন্বয় ও স্থিতিস্থাপকতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল এবং উক্ত ভুক্তি-মুক্তি তত্ত্ব শিষ্ট-সমাজে কিছু কোণঠাসা হয়ে পড়ল, বেদবিরোধী ভাবনার বিষদাঁত ভেঙে গেল—অবশ্য বৈদিক যাগযজ্ঞ ও কাম্যকর্মসঙ্কুল বাসনাবন্ধও শিথিল হয়ে পড়ল। শুরু হল পৌরাণিক যুগ। ব্রাহ্মণ্য আচার ও ধর্ম পুনর্গঠনের জন্য ছত্রিশখানি পুরাণ-উপপুরাণের প্রয়োজন হয়েছিল। এ পুরাণ একাধারে ইতিহাস, বংশচরিত, দেবতত্ত্ব, দর্শন, সমাজ ও রূপকের রূপকথায় এক অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করেছে। আমরা প্রায়শঃ বেদ-উপনিষদের দোহাই দিই বটে, কিন্তু আচার-আচরণে ভারতের অধিকাংশ হিন্দুসমাজ বহুলাংশে পৌরাণিক আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হয়। বহুদেববাদী পুরাণ সাধারণ হিন্দুকে আশ্বস্ত করেছে। এই পৌরাণিক ঐতিহ্য খ্রীস্টীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে। বেদ, তন্ত্র, উপনিষদ, বৌদ্ধ-জৈনাদি বেদবিরোধী মুমুক্ষু তত্ত্ববাদ, অদ্বৈত বেদান্ত ও তজ্জাত ভক্তিবাদ, দেহাত্মবাদী বার্হস্পত্য সম্প্রদায় পৌরাণিক মতকে কখনো আঘাত করেছে, কখনো-বা এরই ছত্রতলে মিলিত হয়েছে। কখনো শ্রীচৈতন্য, কখনো শঙ্করদেব, কখনো কবীর-নানক-দাদূ-জ্ঞানেশ্বর-নরসি

মেটা, সূফী সাধকেরা পৌরাণিকতাকে আড়াল করেছে, কখনো-বা উনিশ শতকের নব্য-বৈদান্তিকগণ, ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, আর্যসমাজ এবং নব্য-বৈষ্ণবগণ পুরাণকে পাশ কাটিয়ে গেছেন বা একে কপোলকল্পিত রূপকথা বলে এর প্রতি ঔদাসীন্য বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। রামমোহন দয়ানন্দ প্রভৃতি বেদপন্থীরা পৌরাণিকতার প্রতি স্বতই বিরূপ ছিলেন। সেই বেদকেই বিশুদ্ধ ভারতপন্থা বলেছেন, কেউ-বা বেদান্ত-উপনিষদের জ্ঞানাত্মক আত্মতত্ত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪

ইসলামের সঙ্গে ভারতবর্ষের হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সম্প্রদায় দীর্ঘকাল বাস করেছে, বাংলাদেশেও প্রায় আট শ বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান কখনো আপ্রীতিতে, কখনো কিছু অপ্রীতিতে, কখনো আনুকূল্যে, কখনো প্রাতিকূল্যে বসবাস করে আসছে। যদিও দুটি ধর্মাদর্শ ও আচার, চর্যা ও জীবনবোধের ধারণা বহুলাংশে পৃথক, তবু নৈকট্য অনেক সময়ে প্রতিকূলতা, অজ্ঞতা ও উদাসীনতা অনেকাংশে দূর করে দেয়। সুতরাং ইসলাম ও হিন্দুধর্ম পারস্পরিকপরিচয়ের ফলে একের ধর্মবিশ্বাসের ও দার্শনিক প্রত্যয়ের ছিটেফোঁটা অপর ধর্মাবলম্বীকেও যৎকিঞ্চিৎ প্রভাবিত করেছে। আউল-বাউল-সাঁইপন্থী প্রভৃতি রহস্যবাদী সমাজের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম অধ্যাত্মচেতনা ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বাঁধা পড়েছে, তার নানা প্রমাণ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। বস্তুতঃ মধ্যযুগের সন্তসাধনার সঙ্গে পীর-ফকির-মুর্শিদ-মুরিদ সংক্রান্ত চর্যার কিছু সংযোগ হয়েছিল। এঁরা পুঁথিপত্র, পুরাণ-হাদিস, স্মৃতি-সংহিতার অনুশাসন উপেক্ষা করে হৃদ্‌পদ্মে আসন পেতেছিলেন। হিন্দু-বৌদ্ধ-নাথ ও কায়াসাধনার মিশ্রণের ফলে পিণ্ডদেহকে সিদ্ধদেহে পরিণত করে পাঞ্চ-ভৌতিক দেহসত্তার মধ্যে 'অধর' মানুষকে উপলব্ধি এবং অহং-এর বিনাশে সাধকের আত্যন্তিক মুক্তি—এই তত্ত্বদর্শন ও তার প্রতিষ্ঠাভূমি হিসেবে শারীর-দর্শন সম্বন্ধে গুহাহিত গুরুমুখী নানা তত্ত্ববিদ্যা সম্প্রদায়বিশেষে গোপনে-গোপনে অনুশীলিত হত। এখানে জাতপাঁতের ভেদব্যবধান প্রায় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়েছিল। ইসলামি তমদ্দুন ও ব্রাহ্মণ্য চর্যার পাষাণচত্বরে উদ্ভিদ জন্মাতে বহু বিলম্ব হয়, কিন্তু লোকায়ত চর্যার আর্দ্রমাটিতে সামান্য হলকর্ষণে সহজেই ফসল ফলে। ভক্তিবাদী সূফীতত্ত্ব তাই রহস্যপন্থী হিন্দুসমাজের গুহ্যসাধনার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল। বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন উইলসনের গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দুইখণ্ডে নানা দল-উপদল এবং তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত দেহকেন্দ্রিক চর্যাকে শ্রদ্ধা, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন, এজন্য এখনো তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

ধর্মীয় ও দার্শনিক অনুভাবনা বিচার করলে দেখা যাবে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা (আদিব্রাহ্মসমাজ, নববিধান, ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ), নব্য হিন্দুধর্ম—বঙ্কিমচন্দ্র যার নেতা, ভারতীয় বা বাঙালী খ্রীস্টানসমাজ, বাঙালী মুসলমানসমাজ (অধিকাংশ আরবি ধর্মসংস্কারে লালিত, কিছু-বা 'বেশরা'পন্থী দল), আধুনিক বৈষ্ণবপন্থীরা (গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কবি নবীনচন্দ্র সেন, ভক্ত শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি)—উনিশ ও বিশ শতাব্দীতেও বাঙালীর মনঃপ্রকৃতিকে কখনো চঞ্চল, কখনো আত্মস্থ করেছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায় বেদান্তপ্রোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব, ভক্তি ও জ্ঞান, মুমুক্ষা ও জীবসেবাকে এমন একটি সমন্বয়ের মধ্যে আনলেন যা অসাম্প্রদায়িক, মানবহিতবাদী ও বাস্তব-ধর্মী, অথচ ব্যক্তিগত সাধ্যসাধনকেই মূল নিয়ামক শক্তি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। বিবেকানন্দ-প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ববাদ নিছক বৈরাগ্যধর্ম গিরিদরী নির্বাসিত ইহবিস্মৃত লোকোত্তরবাদ নয়। জগৎ ও জীবনকে স্বীকৃতি দিয়ে এই আদর্শ বিশ্বমানবকে আহ্বান করেছে। তাই ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই তত্ত্ব জাতি-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে ভক্ত, মুমুক্ষু ও মানবসেবাব্রতীদের একপতাকার তলে সমবেত করেছে। একদা ইংরেজদের পাঠশালায় শিক্ষিত নব্যপড়ুয়ার দল হিতবাদ, ধ্রুববাদ ও অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে ধর্মকর্ম ও ইহবিস্মৃত দার্শনিক চিন্তা, আপ্তজ্ঞান প্রভৃতিকে ভ্রান্তি বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও একদা বেদান্তকে ভ্রান্তদর্শন বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। ইউরেশিয় যুবক-শিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রায়-কিশোর কয়েকটি কালাপাহাড় ছাত্র ভারতীয় ধর্মদর্শন সংস্কার ও বাঙালীর সামাজিক-পারিবারিক মূল্যবোধগুলিকে ফেনায়িত পানপাত্র সামনে রেখে ও ধূমায়িত সিগার অধরে ধরে মনে করেছিলেন—এ-সমস্ত স্বপ্নিল কুসংস্কার অসুস্থ মনের বিকারমাত্র। কিন্তু তাঁদের প্রচণ্ড হাঁকডাক সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখা, পুরাণাশ্রয়ী নব্য হিন্দুধর্ম, ভারতীয় ষড়দর্শন, বিশেষতঃ বেদান্ত ও তার সন্তানসন্ততি, নব্য-তান্ত্রিক মতবাদ এবং পশ্চিম দেশ থেকে আগত ভাববাদী ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলক বিজ্ঞান ও দর্শন, নীতি ও সমাজবাদ উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর চেতনাকে যেন রসানের দ্বারা মার্জিত করে নিল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ-

শতাব্দী ধরে বাঙালীর তত্ত্ব-দর্শন-ধর্মচিন্তা এই পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। এই গ্রন্থের 'উত্তরণ' উপচ্ছেদে সেই ধারায় কিছু কিছু নিবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি আধুনিক বিতর্কের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্প্রতি কেউ কেউ একটি সমস্যা উত্থাপন করেছেন, যা আমাদের মনে কিছু দ্বন্দ্বসংশয় জাগিয়ে তুলেছে। দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী যুবসম্প্রদায় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে বিশ্ব-প্রপঞ্চকে ইন্দ্রিয়ের আধারে মনের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। যুক্তিবাদে যা আয় দেয় না, তাই কুসংস্কার, সুতরাং সংহারযোগ্য—এই মতে বিশ্বাস স্থাপন করে সমাজ, শিক্ষা, ধর্মাদি স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনায় নির্ভেজাল বুদ্ধি ও বিজ্ঞানকেই একমাত্র নিয়ামক শক্তি বলে তারা মনে করেছিলেন। অথচ তাঁদের কেউ কেউ আবার অন্যদিকে সমাজ, পরিবার ও দেশাচার পালনেও কুণ্ঠিত হন নি। এই যে পরস্পরবিরোধী আচরণ এটা কি আমাদের আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কারের মজ্জাগত দুর্বলতা? একালেও কি বিজ্ঞান-অধীত নব্যবাঙালী, সর্ববৈনাশিক রাজনৈতিক তত্ত্বে আকণ্ঠমগ্ন যুবসম্প্রদায় ও নেতারা একই মন্ত্রে বিপ্লবী চিন্তার লালন ও সংস্কারগত কুলাচার পালন করে চলেন না? এই দ্বৈত বিরোধী মনোভাবের মূলে কি আছে হাল-আমলে-আমদানি-করা অজীর্ণ আধুনিক সংস্কার ও পুরাতন গতায়ু প্রথার সহাবস্থান? এখনো কি আমরা মাসি-পিসি-খুড়ি প্রভৃতি মাতৃকাদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে চলি না? কাজেই হয়তো কেউ কেউ এটি বাঙালীচরিত্রের ত্রুটি বলেই গণ্য করবেন। আধুনিক য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান কেবলমাত্র আমাদের চর্মের উপরিতলে রয়ে গেছে, শিরাধমনীতে সেই পুরাতন সংস্কারের ধারাই মন্থর বেগে বয়ে চলেছে। স্বয়ং রামমোহন গাত্রে-লগ্ন ব্রাহ্মণ্য চিহ্নের সূত্র কয়গাছির মমতা মৃত্যুকালেও বিসর্জন দিতে পারেন নি। ঘোরতর যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র শেষজীবনে ভক্তিধর্মে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। শোনা যায় নিরীশ্বরবাদী তাত্ত্বিক অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথমজীবনে ভোটের দ্বারা ঈশ্বরকে খারিজ করলেও শেষজীবনে দেবমন্দিরে শির নত করতেন। বিদ্যাসাগর ধর্মমতে হয় নিরীশ্বরবাদী আর না-হয় সংশয়বাদী ছিলেন; কিন্তু তিনিও স্মৃতি-নিয়ন্ত্রিত আচার-আচরণ পালন করতেন, দুর্গানাম স্মরণ করে চিঠির পাঠ লিখতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে যাবতীয় ঔর্ধ্বদৈহিক আচার পালন করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু উত্তরকালে 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'র তরণী ভর করেছিলেন। ডিরোজিওর সাক্ষাৎ অবতার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বর্ধমানরাজের বিধবা রাণীকে বিবাহ করে

পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করেন এবং রক্তের উত্তাপ হ্রাস পেলে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের মতোই শিখাসূত্র ধারণ করে জপতপাদিতে সময় অতিবাহিত করেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ বংশেই পুত্রকন্যাদের বিবাহ দিয়েছিলেন। এই যে ঘরে ফেরা, এটা কি বিবর্তনের পশ্চাদ্‌বর্তন নয়? আমরা, শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান সমাজ, যতই আধুনিকতা, প্রগতি, বিজ্ঞান-মনস্কতা ও যুক্তির দোহাই দিই, আসলে সকলেই অল্পাধিক সংস্কারের অঞ্চল ধরে চলতেই অভ্যস্ত—জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে। এর কারণ—পরমার্থ ও পার্থিব, এই দুই চেতনাকে, আমরা ভারতীয়েরা, দুটি স্বাভাবিক সত্যের দক্ষিণমুখ বলেই গ্রহণ করেছি। যিনি বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদী, তিনিও বহু দেবদেবীর উপাসনায় ভক্তিভরেই যোগ দিয়ে থাকেন। মধ্যযুগের কুশাগ্রতীক্ষ্ণ নব্য নৈয়ায়িকগণ যুক্তিকে একমাত্র শরণ্য বলে জেনেও রাধাকৃষ্ণাদি পৌরাণিক দেবতাদের উদ্দেশে যথারীতি প্রণাম নিবেদন করে তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। রামমোহনের সমসাময়িক পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কলকাতায় টোল খুলে ছাত্রদের বেদান্ত পড়াতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ঘোরতর বহুদেববাদী ছিলেন। আসল কথা, পারমার্থিক চিন্তা ও বাস্তব প্রয়োজন—দুটিকে মিলিয়ে-মিশিয়ে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে তুললে, এর কোনোটারই মর্যাদা রক্ষিত হয় না—বোধ হয় অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালীর এই ধরনের মানসিক প্রবণতা আছে। এটি ভালো, কি মন্দ, এই প্রসঙ্গে সে প্রশ্ন অবান্তর। মোটামুটি এইভাবেই বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি বিবর্তিত হয়েছে। একদিকে বিশুদ্ধ তত্ত্বের জীবন, আর-এক দিকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের জীবন—দুটোই সমান্তরাল রেখায় আমাদের মনের মধ্যে বয়ে চলেছে। একটিতে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ, নির্মোহ জ্ঞানদৃষ্টি, নিস্পৃহ তত্ত্ববোধ, আর-এক দিকে বহুকালাশ্রিত কুলাচার, স্মৃতিসংহিতার ছিটেফোঁটা আর পিসি-মাসিদের তাকতুক, ঝাড়ফুঁক, তাগা-তাবিজ-মাদুলি, জলপড়া-ফুলপড়া। তার সঙ্গে আছে গুরু-পুরোহিতের যজ্ঞযাজন, জ্যোতিষীর পরামর্শে রত্ন ধারণ, করকোষ্ঠীতে অটুট বিশ্বাস। এই দুই মানসিকতার মধ্যে স্বতঃবিরোধিতা বর্তমান। সে-বিরোধ মেটাতে ইংরেজী শিক্ষা, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান—কিছুই সমর্থ হয় নি। কাল বিবর্তনে বাঙালীর চিত্তমুকুর যে সম্পূর্ণরূপে মালিন্যমুক্ত হবে, সে আশাও দুরাশামাত্র। যাই হোক, আধুনিককালে বাঙালীর যে অধিমানস ধর্ম, দর্শন, তত্ত্ব ও যুক্তিকে অবলম্বন করে গদ্যের যে মননশীল মূর্তি নির্মাণ করেছে, এই সঙ্কলনে গৃহীত প্রবন্ধসমূহে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। ইংরেজীতে বাঙালী গুরুতর

চিন্তা করেছে, বলা বাহুল্য, অধিকসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌছাবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু বাংলাতেও এই সমস্ত গুরুতর চিন্তার যথেষ্ট প্রকাশ ঘটেছে তার দৃষ্টান্ত রইল এই প্রবন্ধগুলিতে।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রভূত সাহায্য পাওয়া গেছে বলে দুরূহ কর্মও সহজ হয়ে উঠেছে। ডঃ মুরারিমোহন সেন মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করি। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা বিষয়-বিন্যাস করেছি, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ঐতিহাসিক অয়নরেখাটিও তিনি সুনির্দিষ্ট করেছেন, শূন্যস্থানগুলির পূরণে তাঁর কৃতিত্বই সমধিক। সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে আছেন ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, ডঃ ব্রতীশ ঘোষ, ডঃ দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, ডঃ তুষার মহাপাত্র ও রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী। এই তরুণ সম্পাদকগণ সকলেই আমার ছাত্র এবং কেউ কেউ আমার সহকর্মী। তাঁরা যে-ধরনের পরিশ্রম করে, নানা গ্রন্থাগার ঢুঁড়ে, গলিতপ্রায় পত্র-পত্রিকা সন্ধান করে দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধের কপি প্রস্তুত করেছেন, নিজেরাই পাঠ মিলিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এখনো যে ভালোবেসে হাসিমুখে কঠিন পরিশ্রম করা যায়, এঁরাই তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাঙালীর সাম্প্রতিক নৈরাশ্যপীড়িত জীবনে এঁরা একটা সাহসিক বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী প্রেস কপি নকলে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এদের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। পরিশেষে প্রকাশক শ্রীযুক্ত প্রসূন বসু মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর সাগ্রহ সহৃদয়তায় না পেলে গ্রন্থটি সুচারুভাবে প্রকাশিত হতে পারত না।

পদক্ষেপ

বিশ্বের যা-কিছু কল্যাণকর, যা-কিছু বিস্ময় ও সৌন্দর্যের স্রষ্টা—সবার উদ্দেশেই বন্দনামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন আর্যঋষিগণ। উষা, সূর্য, রাত্রি, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু—বিচিত্র নিসর্গশক্তির মূলে বিমুগ্ধ প্রণাম নিবেদন করেই শুরু হয়েছিল মানুষের প্রথম ধর্মযাত্রা! মন্ত্রবিৎ ঋষি সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'; অনেক দেবতা, কোন দেবতাকে দেবো ঘৃতাহুতি?

তারপর তাদের ধ্যানলোকে একদিন এই প্রশ্নেরও উত্তর উদ্ভাসিত হল—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'! অনেক নেই, আছেন এক। নূতন উপলব্ধির আনন্দে উপনিষদের যুগেই তারা ঘোষণা করতে পেরেছিলেন—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—অন্ধকারের ওপারে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি জেনেছি! এই বিশাল বিশ্ব সেই পরম সত্যেরই বিচিত্র প্রকাশ—'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি!'

বিষয় সূচী

আদিযুগ

মধ্যযুগ

আধুনিকযুগ

প্রকাশকের নিবেদন

প্রকাশনার ব্যাপারে প্রকাশকের একটা বক্তব্য থাকে, মানে থাকতেই হয়, নইলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকে।

জাতীয় ধর্ম ও দর্শনচিন্তায় দীর্ঘকালের ইতিহাস একটিমাত্র খণ্ডে আমাদের ধরে রাখতে হয়েছে। বহু মনীষী এই বিষয়ে চিন্তা করেছেন, লিখেছেন—সেই অজস্র মূল্যবান রচনা থেকে নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা অসুবিধা বোধ করেছি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন—তরী ছোট, সোনার ধানের পরিমাণ বেশি।

এই সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগের প্রবন্ধ নির্বাচনে। উনবিংশ শতকের বাঙালীর চিন্তাজগৎ প্রভাবিত হয়েছিল বহু পাশ্চাত্য মনীষীর গবেষণা-মূলক রচনায়। এদের মধ্যে ছিলেন মিল, বেন্থাম, কাণ্ট, হেগেল এবং আরো অনেকে। বিচিত্র ভাবনার এই বেগবান প্রবাহের সম্পূর্ণ রূপ আমরা দেখাতে পারি নি; হয়তো অঙ্গহানি হল, কিন্তু উপায় নেই। আমাদের এই প্রচেষ্টা প্রথম—প্রথম বলেই গৌরব দাবি করি।

আমরা ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বাঙালীর চিন্তারাজ্যের দ্বার একটু উন্মুক্ত করে দিলাম, এইমাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চৈতন্যবাদ

এক

পৃথিবীতে ধর্ম কোথা হইতে আসিল ?

অনেকেই মনে করেন, এ কথার উত্তর অতি সহজ। খ্রীষ্টীয়ান বলিবেন, মূসা ও যীশু ধর্ম আনিয়াছেন। মুসলমান বলিবেন, মহম্মদ আনিয়াছেন, বৌদ্ধ বলিবেন, তথাগত আনিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধর্ম আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির ধর্মের মুসা মহম্মদ কেহ নাই। পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহার সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। সকলেরই এক একটা ধর্ম আছে, এমন কোনজাতি আজি পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাদের কোন প্রকার ধর্মজ্ঞান নাই। এই অসংখ্য জাতিদিগের ধর্মে প্রায় মহম্মদ মূসা খ্রীস্ট বৌদ্ধের তুল্য কেহ ধর্মস্রষ্টা নাই। তাহাদের ধর্ম কোথা হইতে আসিল ?

আর যাঁহারা বলেন যে, খ্রীস্ট বা বুদ্ধ, মুসা বা মহম্মদ ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় একটা ভুল আছে। ইঁহারা কেহই ধর্মের সৃষ্টি করেন নাই, প্রচলিত ধর্মের উন্নতি করিয়াছেন মাত্র। খ্রীস্টের পূর্বে য়িহুদায় য়িহুদী ধর্ম ছিল, খ্রীস্টধর্ম তাহারই উপর গঠিত হইয়াছে, মহম্মদের পূর্বে আরবে ধর্ম ছিল, ইসলাম তাহার উপর ও য়িহুদী ধর্মের উপর গঠিত হইয়াছে ; শাক্যসিংহের আগে বৈদিক ধর্ম ছিল, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সংস্করণ মাত্র। মুসার ধর্ম প্রচারের পূর্বেও এক য়িহুদী ধর্ম ছিল ; মুসা তাহার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই সকল আদিম ধর্ম কোথা হইতে আসিল ? তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যায় না। অর্থাৎ কদাচিৎ ধর্মের সংস্কারক দেখা যায়, কোথাও ধর্মের স্রষ্টা দেখা যায় না। সৃষ্ট ধর্ম নাই ; সকল ধর্মই পরম্পরাগত, কদাচিৎ বা সংস্কৃত।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এমনই একটা প্রশ্ন আছে—পৃথিবীতে জীব কোথা হইতে আসিল ? যদি বলা যায়, ঈশ্বরেচ্ছায় বা ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্রমে পৃথ্বীতলে জীবসঞ্চার হইয়াছে, তাহা হইলে বিজ্ঞান বিনষ্ট হইল। কেন না, সকলই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়াছে ; সকল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের এই উত্তর দিয়া অনুসন্ধান সমাপন করা যাইতে পারে। অতএব কি জীবোৎপত্তি কি ধর্মোৎপত্তি সম্বন্ধে এ উত্তর দিলে চলিবে না।

কেন না, ধর্মোৎপত্তিও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ইহারও অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক প্রথায় করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথা এই যে, বিশেষের লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করিতে হয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই এই প্রণালী অনুসারে ধর্মের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু নানা মুনির নানা মত। কাহারও মত এমন প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয় না যে, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। আমি নিজে যাহা কিছু বুঝি পাঠকদিগকে অতি সংক্ষেপে তাহার মর্মার্থ বুঝাইতেছি।

ধর্মের উৎপত্তি বুঝিতে গেলে সভ্যজাতির ধর্মের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কিছু পাইব না। কেন না সভ্যজাতির ধর্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই, প্রথমাবস্থা নহিলে আর কোথাও উৎপত্তি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গাছ কোথা হইতে হইল, অঙ্কুর দেখিলে বুঝা যায়; প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়া বুঝা যায় না। অতএব অসভ্য জাতিদিগের ধর্মের সমালোচন করিয়া ধর্মের উৎপত্তি বুঝাই ভাল।

এখন, মনুষ্য যতই অসভ্য হোক না কেন, একটা কথা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে যে, শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক সামগ্রী।

এই একজন মানুষ চলিতেছে, খাইতেছে, কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে। সে মরিয়া গেল আর সে কিছুই পাইল না। তাহার শরীর যেমন ছিল, তেমনই আছে, হস্তপদাদি কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সে আর কিছুই করিতে পারে না। একটা কিছু তাহার আর নাই, তাই আর পারে না। তাই অসভ্য মানুষ বুঝিতে পারে যে, শরীর ছাড়া জীবে আর একটা কি আছে, সেইটার বলে জীবত্ব, শরীরের বলে জীবত্ব নহে।

সভ্য হইলে মনুষ্য ইহার নাম দেয়, "জীবন" বা "প্রাণ" বা আর কিছু। অসভ্য মনুষ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিসটা বুঝিয়া লয়। বুঝিলে দেখিতে পারে যে, এটা কেবল জীবেরই আছে, এমত নহে, গাছ-পালারও আছে। গাছ-পালাতেও এমন একটা কি আছে যে, সেটা যত দিন থাকে, ততদিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফল ধরে, সেটার অভাব হইলেই আর ফুল হয় না, পাতা হয় না, ফল হয় না, গাছ শুকাইয়া যায়, মরিয়া যায়। অতএব গাছ পালারও জীবন আছে। কিন্তু গাছ-পালার সঙ্গে জীবের একটা প্রভেদ এই যে, গাছ-পালা নড়িয়া বেড়ায় না, খায় না, গলায় শব্দ করে না, মারপিট লড়াই বা ইচ্ছাজনিত কোন ক্রিয়া করে না।

অতএব অসভ্য মনুষ্য জ্ঞানের সোপানে আর এক পদ উঠিল। দেখিল, জীবন ছাড়া জীবে আর একটা কিছু আছে, যাহা গাছ-পালায় নাই। সভ্য হইলে তাহার নাম দেয়, "চৈতন্য"। অসভ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিসটা বুঝিয়া লয়।

আদিম মনুষ্য দেখে যে, মানুষ মরিলে তাহার শরীর থাকে—অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মানুষ নিদ্রা যায়, তখন শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মূর্ছাদি রোগে শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। তখন সে সিদ্ধান্ত করে যে, চৈতন্য শরীর ছাড়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু।

এখন অসভ্য হইলেও, মনুষ্যের মনে এমন কথাটা উদয় হওয়ার সম্ভাবনা যে, এই শরীর হইতে চৈতন্য যদি পৃথক্ বস্তু হইল, তবে শরীর না থাকিলে এই চৈতন্য থাকিতে পারে কি না? থাকে কি না?

মনে করিতে পারে, মনে করে, থাকে বৈ-কি? স্বপ্নে দেখি; স্বপ্নে শরীর এক স্থানে রহিল, কিন্তু চৈতন্য গিয়া আর এক স্থানে দেখিতেছে, বেড়াইতেছে, সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, নানা কাজ করিতেছে। ভূত আছে, এ কথা স্বীকার করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সভ্য কি অসভ্য মনুষ্য কখন ভূত দেখিয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিবার বোধহয় কাহারও আপত্তি নাই। মস্তিষ্কের রোগে, কিম্বা ভ্রমবশতঃ মনুষ্যে ভূত দেখে, ইহা বলা যাউক। যে কারণে হউক মনুষ্য ভূত দেখে। মরা মানুষের ভূত দেখিলে অসভ্য মানুষের মনে এমন হইতে পারে যে, শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে। এই বিশ্বাসই পরলোকে বিশ্বাস, এইখানেই ধর্মের প্রথম সূত্রপাত।

ইহা বলিয়াছি যে, অসভ্য মনুষ্য বা আদিম মানুষ যাহাকে ক্রিয়াবান্, আপনার ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান দেখে, তাহারই চৈতন্য আছে বিশ্বাস করে।

জীব, আপন ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্, এজন্য জীবের চৈতন্য আছে, নির্জীব ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ নহে, এজন্য নির্জীব চেতন নহে। কিন্তু আদিম মনুষ্য সকল সময় বুঝিতে পারে না, কোন্‌টা চৈতন্য যুক্ত, কোন্‌টা চৈতন্যযুক্ত নহে। পাহাড় পর্বত, জড় পদার্থ সচরাচর ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ নহে, সচরাচর ইহাদের অচেতন বলিয়া বুঝিতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা পাহাড় অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদন করে। সেটাকে ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ বলিয়া বোধ হয়; আদিম মনুষ্যের সেটাকে অচৈতন্য বলিয়া বোধহয়। কলনাদিনী নদী, রাত্রিদিন ছুটিতেছে, শব্দ করিতেছে, বাড়িতেছে, কমিতেছে, কখন ফাঁপিয়া উঠিয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিয়া সর্বনাশ করিতেছে, কখন পরিমিত

জলসেচ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে, ইহাকেও ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। সূর্যের কথা বড় আশ্চর্য। জগতে যাহাই হোক না কেন, ইনি ঠিক সেই নিয়মিত সময়ে পূর্বদিকে হাজির। আবার ঠিক আপনার নির্দিষ্ট পথে সমস্তদিন ফিরিয়া, ঠিক নিয়মিত সময়ে পশ্চিমে লুক্কায়িত। ইহাকেও স্বেচ্ছাক্রিয়া বলিয়া বোধহয়, ইহাও সচৈতন্য বোধহয়। চন্দ্রও তারা সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কোথা হইতে আকাশে মেঘ আসে? মেঘ আসিয়া কেন বৃষ্টি করে? বৃষ্টি করিয়া কোথায় চলিয়া যায়? মেঘ আসিলেই বা সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন? যে সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য হইবে, সচরাচর ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি হয় কেন? সচরাচর তাহা হয়, কিন্তু এক এক সময়ে তাই বা হয় বা কেন? কখন কখন অনাবৃষ্টিতে দেশ জ্বলিয়া যায় কেন? এ সব আকাশের ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বা বৃষ্টির ইচ্ছা, এজন্য আকাশ সচেতন, মেঘ সচেতন, বা বৃষ্টি সচেতন বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বা বায়ু সম্বন্ধেও ঐরূপ। বজ্র বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটে। অগ্নি সম্বন্ধেও যে ঐরূপ ঘটিবে, তাহা অগ্নির ক্রিয়া সকলের সমালোচনা করিলে সহজে বুঝা যাইতে পারে। অগাধ, দুস্তর, তরঙ্গ-সঙ্কুল, জলচরে সংক্ষুব্ধ রত্নাকর সমুদ্র সম্বন্ধেও সেই কথা হইতে পারে। ইত্যাদি।

এইরূপে জড়ে চৈতন্য আরোপ, ধর্মের দ্বিতীয় সোপান। ইহাকে ধর্ম না বলিয়া, উপধর্ম বলিতে কেহ ইচ্ছা করেন, আপত্তি নাই। ইহা স্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, উপধর্মই সত্য ধর্মের প্রাথমিক অবস্থা। বিজ্ঞানের প্রথমাবস্থা যেমন ভ্রমজ্ঞান, ইতিহাসের প্রথমাবস্থা যেমন লৌকিক উপন্যাস বা উপকথা, ধর্মের প্রথমাবস্থা তেমনি উপধর্ম। মতান্তর আছে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বিজ্ঞান নিকৃষ্ট, ইতিহাস নিকৃষ্ট, দর্শন কাব্য সাহিত্য শিল্প, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাবুদ্ধি, সবই নিকৃষ্ট, কেবল তত্ত্বজ্ঞান উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সম্ভব নহে।

তারপর ধর্মের তৃতীয় সোপান। যে সকল জড়পদার্থে মনুষ্য চৈতন্যারোপ করিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতিশয় ক্ষমতাশালী, তেজস্বী, বা সুন্দর। সেই আগ্নেয়গিরি একেবারে দেশ উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে, তাহার ক্রিয়া দেখিয়া মনুষ্যবুদ্ধি স্তম্ভিত, লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। সেই কূলবিপ্লাবিনী, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চারিণী নদী, মঙ্গলে অতিশয় প্রশংসনীয়া, অমঙ্গলে অতি ভয়ঙ্করী বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান কে? ইহাদের অপেক্ষা ভীমকর্মা কে? যদি ইহাদের অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে, তবে সূর্য ; ইহার প্রকাণ্ড তেজ, আশ্চর্য গতি ফলোৎপাদন জীবোৎপাদন শক্তি, আলোক, সকলই বিস্ময়কর। ইহাকে জগতের রক্ষক বলিয়া বোধ হয়, ইনি যতক্ষণ অনুদিত থাকেন, ততক্ষণ জগতের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হইয়া থাকে।

এই সকল শক্তিশালী মহা মহিমময় জড় পদার্থ, যদি সচেতন, স্বেচ্ছাচারী বলিয়া বোধ হইল, তবে মানুষের মন ভয়ে বা প্রীতিতে অভিভূত হয়। ইহাদের কেবল শক্তি এত বেশী তাই নহে, মনুষ্যের মঙ্গলামঙ্গল ইহাদিগের অধীন। সচরাচর দেখা যায় যে, যে চৈতন্যযুক্ত, সে তুষ্ট হইলে ভাল করে রুষ্ট হইলে অনিষ্ট করে। এই সকল মহাশক্তি যুক্ত মঙ্গলামঙ্গল সম্পাদক পদার্থ যদি চৈতন্য বিশিষ্ট হয়, তবে তাহারাও সেই নিয়মের বশীভূত, ইহা আদিম মনুষ্য মনে করে মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাখিতে পারিলে সর্বত্র মঙ্গল, তাহারা রুষ্ট হইলে সর্বনাশ হইবে। ইহাতে উপাসনার উৎপত্তি। ইহাই ধর্মের তৃতীয় সোপান। এই জন্য সর্বদেশে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ঝড়, বৃষ্টি, অগ্নি, জলধি, আকাশাদির উপাসনা। এই জন্য বেদের ইন্দ্রাদি আকাশ দেবতা, সূর্য দেবতা, বায়ু দেবতা, অগ্নি দেবতা প্রভৃতির উপাসনা।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। উপাসনা দ্বিবিধ। যাহার শক্তিতে ভীত নই, বা যাহার শক্তি হইতে সুফল পাইবার আশা করি ; তাহার উপাসনা করি। কিন্তু তাছাড়া আরও এমন সামগ্রী আছে, যাহার উপাসনা করি, সেবা করি, আদর করি। যাহার ভয়দায়িকা শক্তি নাই, অথচ হিতকর তাহারও আদর করি। অচেতন ওষধি বা ঔষধের আমরা এরূপ আদর করি। ছায়াকারক বট বা স্বাস্থ্যদায়ক শেফালিকা বা তুলসীর তলায় জল সিঞ্চন করি। উপকারী অশ্বের ভৃত্যবৎ সেবা করি। গৃহরক্ষক কুক্কুরকে যত্ন করি। দুগ্ধ-দায়িনী গাভী, এবং কর্ষণকারী বলদকে আরও আদর করি। ধার্মিক মানুষকে ভক্তি করি। এ এক জাতীয় উপাসনা। এই উপাসনার বশবর্তী হইয়া হিন্দু ছুতার কুড়ালি পূজা করে, কামার হাতুড়ি পূজা করে, বেশ্যা বাদ্যযন্ত্র পূজা করে, লেখক লেখনী পূজা করে, ব্রাহ্মণ পুঁথি পূজা করে।

আরও আছে। যাহা সুন্দর, তাহা আমরা বড় ভালবাসি। সুন্দর হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোন উপকার পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর করি। যে ছেলে চন্দ্র হইতে কি উপকার বা অপকার পাওয়া যায়, তাহার কিছুই জানে না, সেও চাঁদ ভালবাসে। যে ছবির পুতুল, আমাদিগকে ভাল মন্দ কিছুই করিতে পারে না, তাহাকেও আদর করি। সুন্দর ফুলটি, সুন্দর পাখিটি,

সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর করি। চন্দ্র কেবল সৌন্দর্য গুণেই দেবতা! সাতাইশ নক্ষত্র তাঁহার মহিষী।

প্রকৃতপক্ষে ইহা উপাসনা নহে, কেবল আদর। কিন্তু অনেক সময় ইহা উপাসনা বলিয়া গণিত হয়। বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে তাই অনেক সময়ে হইয়াছে। কথাটা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় অনুবাদ করা যাউক তাহা হইলেই অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

যাহা শক্তিশালী, তাহা নৈসর্গিক পদার্থের কোন বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়াই শক্তিশালী। কার্বনের প্রতি অম্লজানের নৈসর্গিক অনুরাগই অগ্নির শক্তির কারণ। তাপ, জল, ও বায়ু, এই তিন পদার্থের পরস্পরে বিশেষ কোন সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়াতেই মেঘের শক্তি।

এই যে জাগতিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা বলিলাম, এই সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নাম সত্য। সত্যই শক্তি। কেবল জড়শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। যীশু বা শাক্য সিংহের উক্তি সকল বা কর্ম সকল সমাজের সহিত নৈসর্গিক শক্তি বিশিষ্ট, অর্ধেক জগৎ আজিও তাঁহাদের বশীভূত।

যাহা হিতকর, শক্তিশালী হউক বা না হউক, কেবল হিতকর, ঊনবিংশ শতাব্দী তাহার নাম দিয়াছে, শিব। সুন্দর যা সৌম্যের নূতন নাম কিছু হয় নাই, সুন্দর সুন্দরই আছে, সৌম্য সৌম্যই আছে।

এই সত্য (The True) শিব (The God) এবং সুন্দর (The Beautiful) এই ত্রিবিধ ভাব মানুষের উপাস্য। এই উপাসনা দ্বিবিধ হইতে পারে। উপাসনার সময়ে অচেতন উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে, আদিম মনুষ্য তাহাই করিয়া থাকে। এই উপাসনা-পদ্ধতি ভ্রান্ত, কাজেই অহিতকর। দ্বিতীয় বিধ উপাসনায়, অচেতনকে অচেতন বলিয়াই জ্ঞান থাকে! গেটে (Goethe) বা বর্ডস্বর্থ (Wordsworth) এই জাতীয় জড়োপাসক। ইহা অহিতকর নহে, বরং হিতকর কেন না ইহার দ্বারা কতকগুলি চিত্তবৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিণতি সাধিত হয়। ইহা অনুশীলন বিশেষ। এখানকার দেশী পণ্ডিতেরা (বিশেষ বালকেরা) তাহা বুঝিতে পারিয়া উঠে না। কিন্তু কতকগুলি বৈদিক ঋষি তাহা বুঝিতেন। বেদে দ্বিবিধ উপাসনাই আছে।

বেদ

দুই

বেদ, হিন্দুশাস্ত্রের শিরোভাগে। ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শাস্ত্রের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্যশাস্ত্রে যাহা বেদাতিরিক্ত আছে তাহা বেদমূলক বলিয়া চলিয়া যায়। যাহা বেদে নাই বা বেদবিরুদ্ধ, তাহাও বেদের দোহাই দিয়া পাচার হয়। অতএব, আগে বেদের কিছু পরিচয় দিব।

সকলেই জানেন, বেদ চারিটি—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় যে, বেদ তিনটি—ঋক্, যজুঃ, সাম। অথর্ব সে সকল স্থানে গণিত হয় নাই। অথর্ব বেদ অন্য তিন বেদের পর সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিচারে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস, বেদকে এই চারিভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, আগে চারি বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল। বাস্তবিক দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের অনেক শ্লোকার্দ্ধ যজুর্বেদে ও সামবেদে পাওয়া যায়। অতএব এক সামগ্রী চারি ভাগ হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

যখন বলি, ঋক্ একটি বেদ, যজুঃ একটি বেদ, তখন এমন বুঝিতে হইবে না যে, ঋগ্বেদ একখানি বই বা যজুর্বেদ একখানি বই। ফলতঃ এক একখানি বেদ লইয়া এক একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরি সাজান যায়। এক একখানি বেদের ভিতর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

একখানি বেদের তিনটি করিয়া অংশ আছে—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ। মন্ত্রগুলির সংগ্রহকে সংহিতা বলে, যথা—ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা। সংহিতা, সকল বেদের এক একখানি, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ অনেক। যজ্ঞের নিমিত্ত বিনিয়োগাদি সহিত মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা সহিত গদ্যগ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মপ্রতিপাদক অংশের নাম উপনিষৎ। আবার আরণ্যক নামে কতকগুলি গ্রন্থ বেদের অংশ। এই উপনিষদ্‌ই ১০৮ খানি।

বেদ কে প্রণয়ণ করিল? এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এক মত এই যে, ইহা কেহই প্রণয়ণ করে নাই। বেদ অপৌরুষেয় এবং চিরকালই আছে। কতকগুলি কথা আপনা হইতে চিরকাল আছে। মনুষ্য হইবার আগে, সৃষ্টি হইবার আগে হইতে, মনুষ্য-ভাষায় সঙ্কলিত কতকগুলি গদ্য পদ্য আপনা হইতে চিরকাল আছে; অধিকাংশ পাঠকই এ মত গ্রহণ করিবেন না, বোধ হয়।

আর এক মত এই যে, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বর বসিয়া বসিয়া অগ্নিস্তব ও ইন্দ্রস্তব ও নদীস্তব ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির বিবিধ রচনা করিয়াছেন, ইহাও বোধ হয় পাঠকের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস না করিতে পারেন। বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক মত আছে, সে সকল সবিস্তারে সঙ্কলিত করিবার প্রয়োজন নাই। বেদ যে মনুষ্য প্রণীত তাহা বেদের আর কিছু পরিচয় পাইলেই, বোধহয় পাঠকেরা আপনারাই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। তাঁহারা আপন আপন বুদ্ধিমতো মীমাংসা করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বেদ যেরূপেই প্রণীত হউক, একজন উহা সঙ্কলিত ও বিভক্ত করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। সেই বিভাগ মন্ত্রভেদে হইয়াছে এবং মন্ত্রভেদানুসারে তিন বেদই দেখা যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্র ছন্দোনিবদ্ধ স্তোত্র ; যথা, ইন্দ্রস্তোত্র, অগ্নিস্তোত্র, বরুণস্তোত্র। যজুর্বেদের মন্ত্র প্রশ্লিষ্টপাঠ গদ্যে বিবৃত, এবং যজ্ঞানুষ্ঠানই তাহার উদ্দেশ্য। সামবেদের মন্ত্র গান। ঋগ্বেদের মন্ত্রও গীত হয় এবং গীত হইলে তাহাকেও সাম বলে। অথর্ববেদের মন্ত্রের উদ্দেশ্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি।

হিন্দু মতানুসারে অন্য বেদের অপেক্ষা সামবেদের উৎকর্ষ আছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "বেদানাং সামবেদোস্মি দেবানামিত্যাদি" কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কাছে ঋগ্বেদেরই প্রাধান্য। বাস্তবিক ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধহয়। এই জন্য আমরা প্রথমে ঋগ্বেদের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হই। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের পরিচয় পশ্চাৎ দিব, অগ্রে সংহিতার পরিচয় দেওয়া কর্তব্য হইতেছে।

ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল ও আটটি অষ্টক। এক একটি মন্ত্রকে এক একটি ঋচ্ বলে। এক ঋষির প্রণীত এক দেবতার স্তুতি সম্বন্ধে মন্ত্রগুলিকে একটি সূক্ত বলে। বহুসংখ্যক ঋষি কর্তৃক প্রণীত সূক্তসকল একজন ঋষি কর্তৃক সংগৃহীত হইলে একটি মণ্ডল হইল। এইরূপ দশটি মণ্ডল ঋগ্বেদ সংহিতায় আছে। কিন্তু এরূপ পরিচয় দিয়া আমরা পাঠকের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারিব না। এগুলি কেবল ভূমিকা স্বরূপ বলিলাম। আমরা পাঠককে ঋগ্বেদ সংহিতার ভিতরে লইয়া যাইতে চাই। এবং সেইজন্য দুই একটা সূক্ত বা ঋক্ উদ্‌ধৃত করিব। সর্বাগ্রে ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক্ উদ্‌ধৃত করিতেছি। কিন্তু ইহার একটি "হেডিং" আছে। আগে "হেডিং"টি উদ্‌ধৃত করি।

"ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দ্দেবতা
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ।"

আগে এই "হেডিং" টুকু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ "হেডিং" সকল সূক্তেরই আছে। ব্রাহ্মণ পাঠকেরা দেখিবেন, তাঁহারা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করেন, তাহাতে যে সকল বেদমন্ত্র আছে, সে সকলেরও ঐরূপ একটু একটু ভূমিকা আছে। দেখা যাক, এই "হেডিং"টুকুর তাৎপর্য কি? ইহাতে চারিটি কথা আছে, প্রথম, এই সূক্তের ঋষি, বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা। দ্বিতীয়, এই সূক্তের দেবতা অগ্নি। তৃতীয়, এই সূক্তের ছন্দ গায়ত্রী। চতুর্থ এই সূক্তের বিনিয়োগ ব্রহ্মযজ্ঞান্তে এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে। এইরূপ সকল সূক্তের একটি ঋষি, একটি দেবতা, ছন্দ এবং বিনিয়োগ নির্দিষ্ট আছে। ইহার তাৎপর্য কি?

প্রথম ঋষিশব্দটুকু বুঝা যাক্। ঋষি বলিলে এক্ষণে আমরা সচরাচর সাদা দাড়ীওয়ালা গেরুয়াকাপড়-পরা সন্ধ্যাহ্নিক-পরায়ণ ব্রাহ্মণ—বড় জোর সেকালের ব্যাস বাল্মীকির মতো তপোবল বিশিষ্ট একটা অলৌকিক কাণ্ড মনে করি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেরূপ কোন অর্থে ঋষি শব্দ এ সকল স্থলে প্রযুক্ত হয় নাই।

বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহার নাম "নিরুক্ত'। নিরুক্ত একটি "বেদাঙ্গ"। যাস্ক, স্থৌলষ্টিবী, শাকপূণি প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ নিরুক্তকর্তা। বেদের কোন শব্দের যথার্থ অর্থ জানিতে হইলে, নিরুক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখন নিরুক্তকার ঋষির শব্দের অর্থ কি বলেন? নিরুক্তকার বলেন এই যে, "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ" অর্থাৎ যাহার কথা সে ঋষি। অতএব যখন কোন সূক্তের পূর্বে দেখি যে, এই সূক্তের অমুক ঋষি, তখন বুঝিতে হইবে যে, সূক্তটির বক্তা ঐ ঋষি। এই বক্তা অর্থে প্রণেতা বুঝিতে হইবে কি? যাঁহারা বলেন, বেদ নিত্য অর্থাৎ কাহারও প্রণীত নহে, তাঁহাদের উত্তর এই যে, বেদমন্ত্র-সকল ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাঁহারা মন্ত্র রচনা করেন নাই, জ্ঞানবলে দৃষ্ট করিয়াছিলেন। যে ঋষি যে সূক্ত দেখিয়াছিলেন, তিনিই সেই সূক্তের ঋষি। শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে ইহা জানি, কিন্তু যোগ-বলেই হউক আর যে বলেই হউক, শব্দ যে দৃষ্ট হইতে পারে ইহা অনেকে কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। যদি কেহ বিশ্বাস করিতে চান যে, যখন লিপিবিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই; তখন মন্ত্রসকল মূর্তি ধারণ করিয়া ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করুন, আমরা আপত্তি করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে বেদেই অনেক স্থলে আছে যে, মন্ত্রসকল ঋষিপ্রণীত, ঋষিদৃষ্ট নহে। আমরা ইহার অনেক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু অপর সাধারণের পাঠ্য প্রচারে এরূপ উদাহরণের স্থান

হইতে পারে না। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন অনেক সূক্ত আছে যে. তাহাতে ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, আমরা মন্ত্র করিয়াছি, গড়িয়াছি, সৃষ্ট করিয়াছি বা জন্মাইয়াছি। সে যাহা হউক, ইহা স্থির যে, ঋষি অর্থে আদৌ তপোবলবিশিষ্ট মহাপুরুষ নহে, সূক্তের বক্তা মাত্র।

এই প্রথম সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দা। তারপর দেবতা অগ্নি। সূক্তের দেবতা কি? যেমন ঋষি শব্দের আলোচনায় তাহার অলৌকিক অর্থ উড়িয়া গেল তেমনি দেবতা শব্দের আলোচনায় ঐরূপ দেবতার লৌকিক অর্থ উড়িয়া যায়। নিরুক্তকার বলেন যে, "যস্য বাক্যং স ঋষি যা তেনোচ্যতে সা দেবতা"। অর্থাৎ সূক্তে যাহার কথা থাকে, সেই সে সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ সূক্তের যা "Subject" তাই দেবতা।

ইহাতে অনেকে এমন কথা বলিতে পারেন, এক্ষণে যাহাদিগকে দেবতা বলি, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি, সূক্ত সকলে তাঁহারাই স্তুত হইয়াছেন, অতএব এখন যে অর্থে তাঁহারা দেবতা, সেই অর্থেই তাঁহারা বেদমন্ত্রে দেবতা। এরূপ আপত্তি যে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ দানস্তুতিসকল। কতকগুলি সূক্ত আছে, সেগুলিকে দানস্তুতি বলে। তাহাতে কোন দেবতারই প্রশংসা নাই, কেবল দানেরই প্রশংসা আছে। অতএব ঐ সকল সূক্তের দানই দেবতা। ইহা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি দেবতা শব্দের অর্থ সূক্তের বিষয় (Subject), তবে দেবতার আধুনিক অর্থ আসিল কোথা হইতে? এ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য দেবতা শব্দটি একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন "যো দেবঃ সা দেবতা" যাহাকে দেব বলে, তাহাকেই দেবতা বলা যায়। এই দেব শব্দের উৎপত্তি দেখ। দিব্ ধাতু হইতে দেব। দিব দীপনে বা দ্যোতনে যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব। আকাশ, সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি উজ্জ্বল, এই জন্য এ সকল আদৌ দেব। এ সকল মহিমাময় বস্তু, এই জন্য আদৌ ইহাদের প্রশংসায় স্তোত্র, অর্থাৎ সূক্ত রচিত হইয়াছিল। কালে যাহার প্রশংসায় সূক্ত রচিত হইতে লাগিল তাহাই দেব হইল। পর্জ্জন্য যিনি বৃষ্টি করেন। তিনি উজ্জ্বল নহেন, তিনিও দেব হইলেন। ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে। সংস্কৃতে একটি 'র' প্রত্যয় আছে। রুদ্ ধাতুর পর 'র' করিয়া রুদ্র হয়, অসু ধাতুর পর 'র' করিয়া অসুর হয়। ইন্দ্ ধাতুর শর 'র' করিয়া ইন্দ্র হয়। অতএব যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। যিনি বৃষ্টি করেন তাহাকে উজ্জ্বল বলিয়া মনে কল্পনা করিতে পারি না; কিন্তু —তিনি ক্ষমতাবান্ বৃষ্টি না হইলে শস্য হয় না, শস্য না হইলে লোকের প্রাণ বাঁচে না। কাজেই তিনিও বৈদিক সূক্তে স্তুত হইলেন। বৈদিক সূক্তে স্তুত

হইলেন বলিয়াই তিনি দেবতা হইলেন। এ সকল কথার সবিস্তার প্রমাণ ক্রমে পাওয়া যাইবে।

"ঋষির্মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।" ছন্দ বুঝিতে কাহারও দেরী হইবে না। কেন না, ছন্দ ইংরাজি বাঙ্গালাতে আছে। ঋকৃগুলি পদ্য, কাজেই ছন্দে বিন্যস্ত। "যদক্ষর পরিমাণং তচ্ছন্দঃ।" অক্ষর পরিমাণকে ছন্দ বলে। চৌদ্দ অক্ষরে পয়ার হয়—পয়ার একটি ছন্দ। আমাদের যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, নানা রকম ছন্দ আছে, বেদেও তেমনি গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ্ বৃহতী, পঙ্‌ক্তি প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দ আছে। যে সূক্ত যে ছন্দে রচিত আমরা তাহাকে "হেডিং" বলিয়াছি, তাহাতে দেবতার ও ঋষির পর ছন্দের নাম কথিত থাকে। যাঁহারা মাইকেল দত্ত ও হেমচন্দ্রের পূর্বকার কবিদের কাব্য পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এ প্রথা বাংলা রচনাতেও ছিল। আগে বিষয় অর্থাৎ দেবতা লিখিত হইত যথা—"গণেশ বন্দনা।" তাহার পর ছন্দ লিখিত হইত, যথা—"ত্রিপদী ছন্দ" বা "পয়ার"। শেষে ঋষি লিখিত হইত, যথা—"কাশীরাম দাস কহে" কি "কহে রায় গুণাকর।" ইংরাজিতেও দেবতা ও ঋষি লিখিতে হয়; ছন্দ লিখিত হয় না। যথা **De Profundis** দেবতা **Alfred Tennyson** ঋষি।

ঋষি দেবতা ও ছন্দের পর বিনিয়োগ। যে কাজের জন্য স্থক্তটির প্রয়োজন, অথবা যে কাজে উহা ব্যবহার হইবে, তাহাই বিনিয়োগ। যথা, অগ্নিষ্টোমে বিনিয়োগঃ অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ইহার নিয়োগ বা ব্যবহার। অতএব ইংরাজিতে বুঝাইতে হইলে বুঝাইব যে (ঋষি (**author**) দেবতা (**subject**) ছন্দ (**metre**) বিনিযোগ (**use**)।

এক্ষণে আমরা ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিতে পারি।

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥"

'ঈলে,' কি না স্তব করি। "অগ্নিমীলে" কি না অগ্নিকে স্তব করি। এ ঋকের এইটিই আসল কথা। "অগ্নিং" কর্ম "ঈলে" ক্রিয়া। আর যতগুলি কথা আছে, সব অগ্নির বিশেষণ। সেগুলি পরে বুঝাইব। আগে অগ্নি শব্দটি বুঝাই। বেদের টীকাকার সায়নাচার্য বলেন, অগ্নি অগ্ ধাতু হইতে হইয়াছে, "অগ কম্পনে।" বাচস্পত্য অভিধানে লেখে "অগ বক্রগতৌ" কিন্তু ইহার আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে পীড়িত করিব না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা অনেক কাজ করিয়াছে। নিরুক্তে সেটি পাওয়া যায়।

"অগ্র" শব্দ পূর্বক 'নী' ধাতুর পর ইন্‌ প্রত্যয় কর, তাহা হইলে অগ্রণী হইবে। নিরুক্তকার বলেন, ইহাতে "অগ্নি" শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। যাহা অগ্রে নীয়মান। এখন যজ্ঞ করিতে গেলে হোম চাই। হোমে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। নহিলে দেবতারা পান না। এই জন্য যাহা প্রথমে যজ্ঞে নীয়মান তাহাই অগ্নি। এই ব্যাখ্যাটি পরিশুদ্ধ বলিয়া কোন মতে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না অগ্নি এই নাম অন্যান্য আর্যজাতির মধ্যে দেখা যায়। যথা, **Latin ignis Slav Ogni**। তবে নিরুক্তকারের জন্যই হউক আর যে জন্যই হউক, ব্যাখ্যাটা চলিয়াছিল, চলিয়া দেবগঠনে লাগিয়াছিল, তাই ইহার কথা বলিলাম।—কাজেই যদি অগ্রপূর্বক 'নী' ধাতু হইতে অগ্নি হইল, তবে অগ্নি দেবতাদিগের অগ্রণী হইলেন, যদি অগ্রণী হইলেন, তবে তিনিই দেবতাদের প্রধান, আগে যান এ কথাও উঠিল। বহ্বৃক্‌ মন্ত্রভাগে আছে— "অগ্নির্মুখং দেবতানাম্‌।" অগ্নি দেবতাদিগের প্রথম ও মুখস্বরূপ। আর অগ্নিবৈঁ দেবানামবনঃ" দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিই মুখ্য। এইরূপ কথা হইতে হইতেই কথা উঠিল, "অগ্নিবৈঁ দেবানাং সেনানী" অর্থাৎ অগ্নি দেবতাদিগের সেনানী। সেনানী কি-না সেনাপতি।

তার পর এক রহস্য আছে। আমাদিগের বর্তমান হিন্দুশাস্ত্রে অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দুয়ানিতে দেবতাদিগের সেনাপতি কে? পুরাণেতিহাসে কাহাকে দেবসেনানী বলে? কুমার কার্তিকেয়, স্কন্দ, ইনিই এখন দেবসেনানী। শেষ প্রচলিত মত এই যে, কার্তিকেয়, মহাদেব অর্থাৎ রুদ্রের পুত্র। যখন এই মত প্রচলিত হইয়াছে, তখন অগ্নি রুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। অগ্নির সঙ্গে রুদ্রের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ক্রমে পরে দেখাইব, কিন্তু অতি প্রাচীন ইতিহাসে, যখন অগ্নি রুদ্র হন নাই তখন কার্ত্তিকেয় অগ্নির পুত্র। যাঁহারা এ তত্ত্বের বিশেষ প্রমাণ খুঁজেন তাঁহারা মহাভারতের নবপর্বের মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্বাধ্যায়ের ১১২ অধ্যায়ে এবং তৎপরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখিতে পাইবেন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" অগ্নির দেব-সেনানী শেষ দাঁড়াইল, অগ্নির ছেলে দেব-সেনানী। কুমার রুদ্রজ, অতএব শেষ মহাদেবের পুত্র।

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্‌
হোতারং রত্নধাতমম্‌।"

"অগ্নিমীলে"। অগ্নিকে স্তব করি। অগ্নি কি রূপ তাহা বলা হইয়াছে। "পুরোহিতং।" অগ্নি পুরোহিত। অগ্নি হোমকার্য সম্পন্ন করেন, এই জন্য অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নিকে পুনঃ পুনঃ পুরোহিত বলা হইয়াছে। বেদব্যাখ্যায় পাঠক মহাশয়েরা যদি একটুখানি ব্যঙ্গ মার্জনা করিতে

পারিতেন, তাহা হইলে আমরা বলিতাম যে, আধুনিক পুরোহিতদিগের সহিত অগ্নির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে ; যজ্ঞীয় দ্রব্য উভয়েই উত্তমরূপে সংহার করেন।

"যজ্ঞস্য দেবং।" অগ্নি যজ্ঞের দেব। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা বলিয়াছি—দিব্‌ ধাতু দীপনে বা দ্যোতনে। "যজ্ঞস্য দেবং" যিনি যজ্ঞে দীপ্যমান।

ঋত্বিজং। "ঋত্বিক্‌ বলে যাজককে। তখনকার এক একটি বৈদিক যজ্ঞে ষোলজন করিয়া ঋত্বিক্‌ প্রয়োজন হইত। চারিজন হোতা, চারিজন অধ্বর্যু, চারিজন উদ্গাতা, আর চারিজন ব্রহ্মা। যাহারা ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিত, তাহারা হোতা। যজুর্ব্বেদী ঋত্বিকেরা অধ্বর্যু। আর যাঁহারা সামগান করেন, তাঁহারা উদ্গাতা। যাহারা কার্য পরিদর্শক, তাঁহারা ব্রহ্মা।

হোতারং। হোতৃগণ ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, অগ্নি হবিরাদি বহন করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, এইজন্য অগ্নি হোতা। "ঋত্বিজং হোতারং" সায়নাচার্য ইহার এই অর্থ করেন যে, অগ্নি ঋত্বিকের মধ্যে হোতা।

রত্নধাতমম্‌। ধাতমম্‌ ধারয়িতারম্‌। যিনি রত্ন দান করেন, তিনি রত্নধাতম। অগ্নি যজ্ঞফলরূপ রত্ন প্রদান করেন, এই নিমিত্ত অগ্নি রত্নধাতম।

এই একটি ঋক্‌ সবিস্তারে বুঝাইলাম। এই সূক্তে এমন নয়টি ঋক্‌ আছে। অবশিষ্ট আটটি এইরূপ সবিস্তারে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তাহার একটা বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছি।

"অগ্নি পূর্বঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন এবং নূতনের দ্বারাও। তিনি দেবতাদিগকে এখানে বহন করুন। ২।

যাহা দিন দিন বাড়িতে থাকে, এবং যাহাতে যশ ও শ্রেষ্ঠ ধীরবত্তা আছে, সেই ধন অগ্নির দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩।

হে অগ্নে! যাহা বিঘ্নরহিত এবং তুমি যাহার সর্বতোভাবে রক্ষাকর্তা, সেই যজ্ঞই দেবগণের নিকট গমন করে। ৪।

যিনি আহ্বান-কর্তা, যজ্ঞকুশল, বিচিত্র যশঃশালিগণের শ্রেষ্ঠ এবং সত্যস্বরূপ, সেই অগ্নিদেব দেবগণের সহিত আগমন করুন। ৫।

হে অগ্নে! তুমি হবির্দাতার যে মঙ্গল কর, হে অঙ্গির! তাহা সত্যই তোমা ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। ৬।

হে অগ্নে! আমরা প্রতিদিন রাত্রে ও দিবসে ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে সমীপস্থ হই। ৭।

তুমি যজ্ঞসকলের জ্বলন্ত রাজা, সত্যের জ্বলন্ত রক্ষাকর্তা এবং স্বগৃহে বর্ধমান, (তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে আমরা তোমার সমীপস্থ হই)।৮।

হে অগ্নি! পিতা যেমন পুত্রের, তুমি তেমনি আমাদের অনায়াসলভ্য হও; মঙ্গলার্থে তুমি আমাদের সন্নিহিত থাক। ৯।

অনেক হিন্দুরই বিশ্বাস আছে যে, বেদের ভিতর মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য অতি দুরূহ কথা আছে; বুঝিবার চেষ্টা করা কর্তব্য, কণ্ঠস্থ করাই ভাল—তাও দ্বিজজাতির পক্ষে। এজন্য আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম সূক্তের অনুবাদ পাঠককে উপহার দিলাম। লোকে বলে, একটা ভাত টিপিলেই হাঁড়ির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনমতে আরও কোন কোন সূক্ত উদ্‌ধৃত করিব। সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

ইহার পর দ্বিতীয় সূক্তের এক দেবতা নহেন। প্রথম তিন ঋকের দেবতা, বায়ু, ৪-৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু; শেষ তিনটি ঋকের দেবতা, মিত্র ও বরুণ, সংস্কৃতে "মিত্রাবরুণৌ।" মিত্র কে তাহা পরে বলিব। বেদের অনুশীলনে, এমন অনেক দেবতা পাওয়া যাইবে যে, আধুনিক হিন্দুয়ানিতে যাহার নাম মাত্র নাই। আবার আধুনিক হিন্দুর কাছে যে সকল দেবতার বড় আদর, তাহার মধ্যে অনেকের নামমাত্র ও বেদে পাওয়া যাইবে না।

তৃতায় সূক্তে দেবতাও অনেকগুলি। ১-৩ ঋকের দেবতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বেদে তাঁহাদের নাম "অশ্বিনৌ।" ৪-৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র ৭-৯ ঋকের দেবতা "বিশ্বেদেবাঃ।" আধুনিক হিন্দু ইহাদিগের নামও অনবগত। ১০-১২ ঋকের দেবতা সরস্বতী।

চতুর্থ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তবই অধিক। ৪ হইতে ১১ পর্যন্ত সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। তন্মধ্যে ষষ্ঠ সূক্তে মরুতেরাও আছেন। মরুতেরা বায়ু হইতে ভিন্ন। সে প্রভেদ পরে বুঝাইব।

দ্বাদশের আবার অগ্নিদেবতা। ইন্দ্রের পর ঋগ্বেদে অগ্নির স্তবই অধিক।

ত্রয়োদশ সূক্ত "আপ্রী" সূক্ত। আপ্রীসূক্তের বিনিয়োগ পশুযজ্ঞে। ঋগ্বেদে মোট দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। এই আপ্রীসূক্তের দেবতাও অগ্নি, কিন্তু সূক্তের ১২টি ঋকে অগ্নির দ্বাদশ মূর্তির স্তব করা হইয়াছে।

চতুর্দশ সূক্তের অনেক দেবতা, যথা—বিশ্বদেবাঃ, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, আদিত্য ও মরুদ্গণ।

পঞ্চদশে ইন্দ্রাদি অনেক দেবতা। সায়নাচার্য বলেন, ঋতুরাই ইহার দেবতা। ষোড়শে একা ইন্দ্র দেবতা। সপ্তদশে ইন্দ্র, বরুণ। অষ্টাদশের এক দেবতা

ব্রহ্মণস্পতি। তিনি কে? সে বড় গোলযোগের কথা। আরও ইন্দ্র ও সোম আছেন, তদ্ভিন্ন দক্ষিণাও সদসস্পতি বা নারাশংস বলিয়া এক দেবতা আছেন। উনবিংশ স্থক্তের দেবতা অগ্নি, মরুৎ।

এক অধ্যায়ের দেবতার তালিকা দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। বৈদিক দেবতা কাহারা, তাহা পাঠককে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এতটা দুঃখ দিলাম। এই এক অধ্যায়ে যে সব দেবতার নাম আছে, অবশ্য এমত নহে। কিন্তু পাঠক দেখিলেন যে, এই এক অধ্যায়ের মধ্যে, যে সকল দেবতা এখনকার পূজার ভাগ খাইতে অগ্রসর তাঁহারা কেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, ইঁহারা কেহই নাই। আমরা ঋগ্বেদের অন্যত্র বিষ্ণুকে খুব মতে পাইব; আর শিবকে না পাই, রুদ্রকে পাইব। ব্রহ্মাকে না পাই, প্রজাপতিকে পাইব। লক্ষ্মীকে না পাই, শ্রীকে পাইব। কিন্তু আর ঠাকুর ঠাকুরানীগুলির বৈদিকত্বের ও মৌলিকত্বের ভারী গোলযোগ। বাঙ্গালার চাউল কলার উপর তাঁহাদের আর যে দাবি দাওয়া থাকে থাকুক, বেদকর্ত্তা ঋষিদিগের কাছে তাঁহারা সনন্দ পান নাই, ইহা নিশ্চিত। এখন দেবত্র বাজেয়াপ্ত করা যাইবে কি?

বাজেয়াপ্ত করিলে, অনেক বেচারা দেবতা মারা যায়। হিন্দুর মুখে তো শুনি, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। কিন্তু দেখি বেদে আছে দেবতা মোটে তেত্রিশটি। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৩৪ স্থক্তের, ১১ ঋকে অশ্বীদিগকে বলিতেছেন, "তিন একাদশ (১১ × ৩ = ৩৩) দেবতা লইয়া আসিয়া মধুপান কর।" ১।৪৫।২ ঋকে অগ্নিকে বলা হইতেছে, "তেত্রিশটিকে লইয়া আইস" ঐরূপ ১।১৩৯।১১ ও ৩।৬।৯ ও ৮।২৮।১ ও ৮।৩০।২ ও ৮।৩৫।৩ ও ৯।৯২।· ঋকে ঐরূপ আছে। কেবল ঋগ্বেদে নয়, শতপথ ব্রাহ্মণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও তেত্রিশটিমাত্র দেবতার কথা আছে।

এখন তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটি হইল কোথা হইতে? ইহার উত্তর, বিদ্যাস্থন্দরের ভাটের কথায় দেওয়া উচিত—

"এক মে হাজার লাখ মেয় কহা বনায়কে"।

ঋগ্বেদের ৩।৯।৯ ঋকে আছে ত্রীণি শতা ত্রীসহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চ অসপর্যন্।" তিন শত, তিন সহস্র, ত্রিশ, নয় দেবতা।, তেত্রিশ কোটি হইতে আর কতক্ষণ লাগে।

তারপর জিজ্ঞাস্য এই তেত্রিশটি দেবতা কে কে? ঋগ্বেদে সে কথা নাই; থাকিবার কথাও নয়। তবে শতপথব্রাহ্মণে ও মহাভারতে উঁহাদিগের শ্রেণী

বিভাগ ও নাম পাওয়া যায়। শ্রেণী বিভাগ এইরূপ। দ্বাদশটি আদিত্য, একাদশটি রুদ্র, এবং আটটি বসু। "আদিত্য", "রুদ্র" এবং "বসু" বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, দেবতার শ্রেণী বা জাতি বাচক মাত্র।

এই হইল একত্রিশ। তার পর এ ছাড়া "দ্যাবা পৃথিবী" এই দুটি লইয়া তেত্রিশটি। শতপথব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে ধরিয়া ৩৪ গণা হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে উহাদিগের নাম নির্দ্দেশ আছে। যথা—

আদিত্য। অংশ ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু।

রুদ্র। অজ, একপদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন, ঈশ্বর।

বসু। ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস।

বেদের দেবতা

তিন

আমরা বেদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য যে কেবল পাঠককে দেখাইব, বেদে কি রকম সামগ্রী আছে, তাহা নহে। আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে বেদে কোন্ দেবতাদের উপাসনা আছে? ঋগ্বেদ সংহিতা বেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, তাই আমরা এখন ঋগ্বেদ সংহিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত, কিন্তু সময়ে বেদের অন্যান্যাংশের দেবোপাসনার স্থূল মর্ম যাহা পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইব। এখন, আমরা দেখিয়াছি, ঋগ্বেদে আছে, দেবতা তিত্রিশটি কবি ভক্ত বা ঠাকুরাণীদিদিদিগের গল্পে গল্পে তেত্রিশ কোটি হইয়াছে।

তারপর দেখিয়াছি যে, সেই তেত্রিশটি দেবতা শতপথব্রাহ্মণে (ইহাও বেদ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, যথা (১) আদিত্য (২) রুদ্র, (৩) বসু। তারপর মহাভারতের এই তিন শ্রেণীর দেবতার যেরূপ নাম দেওয়া আছে, তাহাও দিয়াছি।

ঋগ্বেদের সঙ্গে ইহার কিছু মিলে না। ইহার মধ্যে কোন কোন দেবতার নামও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে এমন অনেক দেবতার নাম পাওয়া যায়, যাহা এই তালিকার ভিতর নাই। ঋগ্বেদে কতকগুলি আদিত্যের নাম আছে বটে, এবং রুদ্র ও বসু শব্দদ্বয় বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ

আদিত্য, একাদশ রুদ্র, এবং অষ্ট বসু, এমন কথা নাই; ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত দেবতাদিগের নাম পাওয়া যায়।

১. মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্তণ্ড, সূর্য, সবিতা ও ইন্দ্র। ইহাদিগকে ঋগ্বেদের কোন স্থানে না কোন স্থানে আদিত্য বলা হইয়াছে।

ইহার মধ্যে অর্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্তণ্ড, ইঁহাদিগের কোন প্রাধান্য নাই।

২. আর কয়টির, অর্থাৎ মিত্র, সূর্য, বরুণ, সবিতা ও ইন্দ্রের খুব প্রাধান্য। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত দেবতারাও ঋগ্বেদ-সংহিতায় বড় প্রবল।

অগ্নি, বায়ু, মরুদ্গণ, বিষ্ণু, পর্জন্য, পূষা, ত্বষ্টা অশ্বাদ্বয়, সোম।

৩. বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও যমেরও কিছু গৌরব আছে।

৪ ত্রিত, আপ্ত্য, অহির্ব্রধ্ন ও অজ একপদের নাম স্থানে-স্থানে পাওয়া যায়।

৫. এই কয়টি নামে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বুঝায়—বিশ্বকর্মা, হিরণ্যগর্ভ, স্কম্ভ, প্রজাপতি, পুরুষ, ব্রহ্ম।

৬, তদ্ভিন্ন কয়েকটি দেবী আছেন। দুইটি দেবী বড় প্রধানা—অদিতি ও উষা।

৭ সরস্বতী, ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, ধীষণা, অরণ্যানী, অগ্নায়ী, বরুণানী, অশ্বিনী, রোদসী, রাকা, সিনিবালী, গুঙ্গূ, শ্রদ্ধা, ও শ্রী,—এই কয় দেবীও আছেন। তদ্ভিন্ন পরিচিতা সকল নদীগণও স্তুত হইয়াছেন।

এখানে, আগে আদিত্যদিগের কথা কিছু বলিব। আদিত্য শব্দে এখন সচরাচর সূর্য বুঝায়। দ্বাদশ আদিত্য বলিলে অনেকেই বারটি সূর্য বুঝেন। অনেক পণ্ডিত আবার এই ব্যাখ্যা করেন যে, দ্বাদশ আদিত্য অর্থে বারটি মাস বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে আদিত্য সকল দেবতাদিগের সাধারণ নাম, এরূপ প্রয়োগও আছে। যাঁহারা অমরকোষের ছত্র দুই-চারি পড়িয়াছেন, তাঁহারাও জানেন যে, "দেব" ইহার প্রতিশব্দ মধ্যে "আদিতেয়" শব্দটি ধরা হইয়াছে। আদিতেয়, আদিত্য, একই। এরূপ গণ্ডগোল কেন? দেখা যাউক, আদিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। দিতি, যাহার বন্ধন নাই, সীমা আছে, খণ্ডিত বা ছিন্ন। অদিতি যাহার বন্ধন নাই, অখণ্ড, অছিন্ন, সীমা নাই, যে অনন্ত; The Infinite.

এই জড় জগৎ সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, মেঘ সবই সেই অখণ্ড বা অনন্ত হইতে উৎপন্ন। পূর্বে বুঝাইয়াছি, যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব, সূর্যাদি রশ্মিময় পদার্থ দেব। তাহারা অনন্ত হইতে উৎপন্ন; অদিতি অনন্ত, তাই অদিতি দেবমাতা;

দেবতারা আদিত্য। কিন্তু সকল দেবতার মাতা যে অদিতি, ঠিক এ কথা বেদে পাওয়া যায় না। এ কথা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। পুরাণেতিহাসেই, বেদে অঙ্কুরিত যে হিন্দুধর্ম, তাহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনকার সাঁহেব-দিগের এবং সাহেব শিষ্যদিগের মত এই যে, পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা এবং উপধার্মিকতা, ভণ্ডামি এবং নষ্টামি। বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম অঙ্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। তবে বৃক্ষটিতে এখন অনেক বানরের বাসা হইয়াছে বটে। ভরসা আছে, সময়ান্তরে সে কথা বুঝাইব। এক্ষণে কথাটা যাহা বলিতেছি, তাহা এই ঃ—পৌরাণিকেরা বুঝাইয়াছিল যে, এই অনন্ত,—অনন্তকাল ও অনন্ত স্থিতি, অনন্ত জড় পরম্পরা, অনন্ত জীবন পরম্পরা এই অদিতি ; (The Infinite in time, space and existence) ইহাই সর্বপ্রসূতি। সর্বপ্রসূতি বলিয়া যাহা তেজঃপুঞ্জ, যাহা সুন্দর, যাহা দীপ্তিমান, যাহা মহৎ, যাহা বলবান—আকাশ চন্দ্র সূর্য বরুণ মরুৎ পর্জন্য সকলেরই প্রসূতি। তাই অদিতি দেবমাতা। কিন্তু ঋগ্বেদে অদিতির এতটা বিস্তার নাই। ঋগ্বেদে অদিতি অনন্ত বটে, কিন্তু সে অনন্ত আকাশ। আকাশ অনন্ত, আকাশ অদিতি। তাই বেদে অদিতি কেবল সূর্যাদি আদিত্যদিগের মাতা। অদিতি যে আকাশ, তাহা বেদের অনেক স্থানেই লেখা আছে ;—যথা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকে "যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীযূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ" —ইত্যাদি।

এখানে অদিতির বিশেষণ 'দ্যৌঃ' শব্দ। 'দ্যৌঃ' শব্দে আকাশ।

অদিতি একটি প্রধানা বৈদিকী দেবী ইহা বলিয়াছি ; কিন্তু দেখিতেছি ইনি আকাশ মাত্র। ইহাকে আকাশ-দেবতা বলা যাইতে পারে। বেদের যে-সকল দেবতার নাম করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আরও আকাশ-দেবতা পাইব। বাস্তবিক ঋগ্বেদের দেবতারা, হয়,

১. আকাশ, যথা, অদিতি, দ্যৌস্, বরুণ (ইনি আদৌ জলেশ্বর নহেন), ইন্দ্র, পর্জন্য।

২. নয়, সূর্য দেবতা, যথা, সূর্য, মিত্র, সবিতা, পূষা, বিষ্ণু।

৩ নয়, অগ্নি দেবতা, যথা, অগ্নি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, রুদ্র।

৪. নয়, অন্যবিধ আলোক দেবতা, যথা, সোম, উষা, অশ্বীদ্বয়।

৫ নয়, বায়ু দেবতা, যথা, বায়ু, মরুদ্‌গণ।

৬ নয়, সৃষ্টিকর্তা, যথা, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষ, বিশ্বকর্মা।

৭ ত্বষ্টা, যম প্রভৃতি দুই চারিটি মাত্র এই শ্রেণীর বাহিরে।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই

প্রথমে জড়োপাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যবিশিষ্ট বিবেচনা হয়, জড় হইতে জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়মাধীন। একজন সর্বনিয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বর জ্ঞান। কিন্তু যে সকল জড়কে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া লোকে উপাসনা করিত, ঈশ্বর জ্ঞান হইলেই তাহাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত বলিয়া উপাসিত হইতে থাকে।

তবে দেবগণ ঈশ্বর সৃষ্ট, এ কথা ঋগ্বেদের সূক্তির ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। কেন না, সূক্ত সকল ঐ সকল দেবগণেরই স্তোত্র; স্তোত্রে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহে না। কিন্তু ঐ ভাব উপনিষদ সকলে অত্যন্ত পরিস্ফুট। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের আরম্ভেই আছে,

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎকিঞ্চনমিষৎ অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল একমাত্র আত্মাই ছিলেন—আর কিছু মাত্র ছিল না। পরে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন।

স ঈক্ষতে মে নু লোকা লোকাপালান্নু সৃজা ইতি। ইত্যাদি। আমরা বলিয়াছি যে, পরিশেষে যখন জ্ঞানের অধিক্যে লোকের আর জড় চৈতন্য বিশ্বাস থাকে না, তখন উপাসক ঐ সকল জড়কে ঈশ্বরের শক্তি বা বিকাশ মাত্র বিবেচনা করে। তখন ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদির ভেদ থাকে না, ইন্দ্রাদি নাম, ঈশ্বরের নামে পরিণত হয়। ইহাই আচার্য্য মোক্ষমূলরের Henotheism। ঋগ্বেদ হইতে তিনি ইহার বিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং যিনি এই কথার বৈদিক প্রমাণ চাহেন, তাঁহাকে উক্ত লেখকের গ্রন্থাবলীর উপর বরাত দিলাম। এখানে সে সকল প্রমাণের পুনঃসংগ্রহের প্রয়োজন নাই। যে কথাটা আচার্য্য মহাশয় বুঝেন নাই, তাহা এই। তিনি বলেন, এটি বৈদিক ধর্মের বিশেষ লক্ষণ যে, যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয়, তখন সেই দেবতাকে সকলের উপর বাড়ান হয়। স্থূল কথা যে, উহা বৈদিক ধর্মের বিশেষ লক্ষণ নহে—পুরাণেতিহাসে সর্বত্র আছে; —উহা পরিণত হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদের সঙ্গে প্রাচীন বহু দেবোপাসনার সংমিলন। যখন দেবতা একমাত্র বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি নামগুলি তাঁহারই নাম হইল। এবং তিনিই ইন্দ্রাদি নামে স্তুত হইতে লাগিলেন।

এই ইন্দ্রাদি যে শেষে সকলই ঈশ্বর স্বরূপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ

বেদ হইতে দিলাম না। আচার্য মোক্ষমূলরের গ্রন্থে সকল উদ্ধৃত **Henotheism** সম্বন্ধীয় উদাহরণগুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। আমি দেখাইব যে, ইহা কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকটি স্তোত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। ইন্দ্র স্তোত্র আদিপর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই—যেহেতু তুমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু; তুমি মেঘ; তুমি অগ্নি; তুমি গগন মণ্ডলে সৌদামিনী রূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘটনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দেশ করে; তুমি ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃ স্বরূপ; তুমি আদিত্য; তুমি বিভাবসু; তুমি অত্যাশ্চর্য মহাভূত; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি; তুমি সহস্রাক্ষ; তুমি দেব; তুমি পরমগতি; তুমি অক্ষয় অমৃত; তুমি পরম পূজিত সৌম্যমূর্তি; তুমি মুহূর্ত; তুমি তিথি; তুমি বল; তুমি খল; তুমি শুক্লপক্ষ, তুমি কৃষ্ণপক্ষ; তুমি বালা, কাষ্ঠা, ত্রুটী, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্ত পর্বত ও বনসমাকীর্ণ বসুন্ধরা, তুমি তিমির বিরহিত ও সূর্যসংস্কৃত আকাশ; তুমি তিমিতিমিঙ্গিল সহিত উত্তুঙ্গ তরঙ্গকুলসঙ্কুল মহার্ণব। এই স্তোত্রে জগদ্ব্যাপী পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইল।

তারপর আদিপর্বের দুইশত-উনবিংশ অধ্যায় হইতে অগ্নি স্তোত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত করি। "হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকাল মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্মবিজিত ইষ্টগতি প্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশ বিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন· তোমা হইতে অস্ত্র সমুদায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে; হে জাতবেদঃ, এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্মাণ করিয়াছ; তুমি সর্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনীকুমার; তুমি মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।

বনপর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্য স্তোত্র এইরূপ "ওঁ সূর্য অর্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্ অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতব, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি,

জঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্মধ্বজপ, বেদকর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, ক্ষমা, যাম, ক্ষণ, সম্বৎসরকার, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত, পুরুষ, শাশ্বতযোগী. কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্তক, বহ্নি, সর্বাদি, আলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাক্ষর, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্তা, প্রশাস্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মতা ও মৈত্রেয়, সয়ম্ভূ ও অমিততেজা।"

তারপর আদিপর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি ঃ -

"হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে, তোমরাই সর্বভূতপ্রধান হিরণ্য গর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চ স্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশ কাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না, তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ; তোমরা শরীর বৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরমাণু সমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর, তোমরাই স্বীয় প্রকৃতি বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিল বিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ।"

দুই-শত-একত্রিশ অধ্যায়ে, কার্তিকেয়ের স্তোত্র এইরূপ—"তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র, মন্ত্র সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে; তুমিই বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্ধমাস, অয়ন ও দিক্। হে রাজীবলোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু; তুমি লোকসকলের পাতা, তুমি পরম পবিত্র হবি, তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকর্তা; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা; তুমি সহস্রভূ; তুমি সহস্র ভুজ ও সহস্রশীর্ষ; তুমি অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরুশক্তিধারী।"

তারপর আদিপর্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গরুড় স্তোত্রে—

"হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎ যশ; তুমি প্রভু, তুমি আমাদিগের পবিত্র স্থান, তুমি

বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান্, তুমি অন্তক, তুমি স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচর স্বরূপ, হে ভূতকীর্তি গরুড় ! ভূতভবিষ্যৎ ও বর্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সূর্যের তেজরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ, হে হুতাশনপ্রভু ! তুমি কোপবিশিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্বসংহারে উদ্যত যুগান্ত বায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবল, পরাক্রান্ত বিদ্যুৎ সমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিত পরাক্রমশালী খগকুলচূড়ামণি, গরুড়ের শরণ লইলাম।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য পুরাণাদিতে আছে যে, তাহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না, এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করি—

যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ গীতা।৯।২৩

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধি-পূর্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।

—বঙ্কিম রচনাবলী (সংসদ) সঙ্কোপিত

ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ

উপনিষৎ

উপনিষৎ বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। সকল বেদের মধ্যেই উপনিষৎ আছে। উপ-পূর্বক-নি-পূর্বক সদ্-ধাতু হইতে উপনিষৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সদ্-ধাতুর অর্থ—অবসাদনে, গতিতে ও বিনাশে। যাহা দেহাত্মবুদ্ধিকে, বা সংসারই সার বস্তু—এই বুদ্ধিকে, অবসাদিত বা শিথিল করে, যাহা পরব্রহ্মে গতির উপায়, বা পরব্রহ্মকে প্রাপ্তির উপায় জানাইয়া দেয় এবং যাহা সংসার-বীজভূতা মায়ার বা অবিদ্যার বিনাশ করে বা বিনাশের উপায় জানাইয়া দেয়, তাহাই উপনিষৎ। ব্রহ্মবিদ্যাই এই সকল কার্য সাধন করিতে পারে। তাই ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক গ্রন্থই হইল উপনিষৎ। উপনিষৎকে শ্রুতিও বলা হয়। সমস্ত বেদের পর্যাবসানই ব্রহ্মবিদ্যায় বা উপনিষদে। উপনিষদেই বেদের অভীষ্ট চরম বাক্য নিহিত আছে। ইহাই বেদের শেষ বা অন্ত। ইহার পরে আর কিছু নাই। এজন্য উপনিষৎ-সমূহকে বেদান্তও বলা হয়।

উপনিষদের সংখ্যা

উপনিষদের মোট সংখ্যা কত, তাহা জানিবার উপায় নাই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ দশ-এগারখানি উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না যে—উপনিষদের সংখ্যা মাত্র দশ-এগার; যেহেতু, তদপেক্ষা অনেক বেশি উপনিষৎ প্রচলিত আছে, দেখা যায়, এবং ভাষ্যকারগণ যে সকল উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, সে সকল উপনিষদ ব্যতীত অন্যান্য উপনিষদের প্রমাণ বা উল্লেখ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতেও দৃষ্ট হয়। ইহাও অনুমান করা সঙ্গত হয় না যে—ঐ দশ-এগারখানি উপনিষৎই মুখ্য, অন্যগুলি গৌণ বা অবান্তর। কেন না, উপনিষৎ হইতেছে পরব্রহ্মের বাক্য জীবের কল্যাণের নিমিত্ত প্রকটিত। তাঁহার বাক্যের কোনও অংশ মুখ্য, কোনও অংশ গৌণ বা অবান্তর - ইহা বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ বলেন, বর্তমানে দুই শতেরও অধিক উপনিষদের প্রচলন দেখা যায়। নানা কারণে অনেক উপনিষদ যে নষ্ট বা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অনুমানও অস্বাভাবিক নহে। বোম্বাই নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত "ঈশাদি-বিংশোত্তর-শতোপনিষদঃ"—নামক গ্রন্থে একশত বিশখানি উপনিষদের মূল দৃষ্ট হয়। নিম্নে এই উপনিষদগুলির নাম লিখিত হইতেছেঃ—

(১) ঈশাবাস্যোপনিষৎ, (২) কেনোপনিষৎ, (৩) কঠোপনিষৎ, (৪)

প্রশ্নোপনিষৎ, (৫) মুণ্ডকোপনিষৎ, (৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, (৭) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, (৮) ঐতরেয়োপনিষৎ, (৯) ছান্দগ্যোপনিষৎ, (১০) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, (১১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, (১২) ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, (১৩) কৈবল্যোপনিষৎ, (১৪) জাবালোপনিষৎ, (১৫) হংসোপনিষৎ, (১৬) আরুনিকোপনিষৎ, (১৭) গর্ভোপনিষৎ, (১৮) নারায়ণাথর্বশির উপনিষৎ, (১৯) মহানারায়ণোপনিষৎ, (২০) পরমহংসোপনিষৎ, (২১) ব্রহ্মোপনিষৎ, (২২) অমৃতনাদোপনিষৎ, (২৩) অথর্বশির-উপনিষৎ, (২৪) অথর্বশিখোপনিষৎ, (২৫) মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ, (২৬) কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষৎ, (২৭) বৃহজ্জাবালোপনিষৎ, (২৮) নৃসিংহপূর্বতাপনীয়োপনিষৎ, (২৯) নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ, (৩০) কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ, (৩১) মৈত্রেয়্যুপনিষৎ, (৩২) সুবালোপনিষৎ (৩৩) ক্ষুরিকোপনিষৎ, (৩৪) মন্ত্রিকোপনিষৎ, (৩৫) সর্বসারোপনিষৎ, (৩৬) নিরালম্বোপনিষৎ, (৩৭) শুকরহস্যোপনিষৎ, (৩৮) বজ্রসূচিকোপনিষৎ, (৩৯) তেজবিন্দূপনিষৎ, (৪০) নাদবিন্দূপনিষৎ, (৪১) ধ্যানবিন্দূপনিষৎ, (৪২) ব্রহ্মাবিদ্যোপনিষৎ, (৪৩) যোগতত্ত্বোপনিষৎ (৪৪) আত্মপ্রবোধোপনিষৎ, (৪৫) নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, (৪৬) ত্রিশিখব্রাহ্মণোপনিষৎ, (৪৭) সীতোপনিষৎ, (৪৮) যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ, (৪৯) নির্বাণোপনিষৎ, (৫০) মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ, (৫১) দক্ষিণামূর্ত্যপনিষৎ, (৫২) শরভোপনিষৎ, (৫৩) স্বন্দোপনিষৎ, (৫৪) ত্রিপাদ্‌বিভূতি-মহানারায়ণোপনিষৎ, (৫৫) অদ্বয়তারকোপনিষৎ, (৫৬) রামরহস্যোপনিগৎ, (৫৭) শ্রীরাম-পূর্বতাপন্যোপনিষৎ, (৫৮) শ্রীরামোত্তরতাপন্যুপনিষৎ, (৫৯) বাসুদেবোপনিষৎ, (৬০) মুদ্গলোপনিষৎ (৬১) শাণ্ডিল্যোপনিষৎ, (৬২) পৈঙ্গলোপনিষৎ, (৬৩) ভিক্ষুকোপনিষৎ, মুদ্গলোপনিষৎ (৬৪) মহোপনিষৎ, (৬৫) শারীরকোপনিষৎ, (৬৬) যোগশিখোপনিষৎ, (৬৭) তুরীয়াতীতোপনিষৎ, (৬৮) সন্ন্যাসোপনিষৎ, (৬৯) পরমহংস-পরিব্রাজকোপনিষৎ, (৭০) অক্ষমালিকোপনিষৎ, (৭১) অব্যক্তোপনিষৎ, (৭২) একাক্ষরোপনিষৎ, (৭৩) অন্নপূর্ণোপনিষৎ, (৭৪) সূর্যোপনিষৎ, (৭৫) অক্ষ্যুপনিষৎ, (৭৬) অধ্যাত্মোপনিষৎ, (৭৭) কুণ্ডিকোপনিষৎ, (৭৮) সাবিত্র্যুপনিষৎ, (৭৯) আত্মোপনিষৎ, (৮০) পাশুপতব্রহ্মোপনিষৎ, (৮১) পরব্রহ্মোপনিষৎ, (৮২) অবধূতোপনিষৎ, (৮৩) ত্রিপুরাতাপিন্যোপনিষৎ, (৮৪) দেব্যুপনিষৎ, (৮৫) ত্রিপুরোপনিষৎ, (৮৬) কঠরুদ্রোপনিষৎ, (৮৭) ভাবনোপনিষৎ, (৮৮) রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ, (৮৯) যোগকুণ্ডল্যুপনিষৎ, (৯০) ভস্মজাবালোপনিষৎ, (৯১) রুদ্রাক্ষজাবালোপনিষৎ, (৯২) গণপত্যুনিষৎ,

(৯৩) শ্রীজাববালিদর্শনোপনিষৎ, (৯৪) তারসারোপনিষৎ, (৯৫) মহাবাক্যোপনিষৎ, (৯৬) পঞ্চব্রহ্মোপনিষৎ, (৯৭) প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ, (৯৮) গোপালপূর্বতাপিন্যুপনিষৎ, (৯৯) গোপালোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ, (১০০) কৃষ্ণোপনিষৎ, (১০১) যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ, (১০২) বরাহোপনিষৎ, (১০৩) শাট্যায়নীয়োপনিষৎ, (১০৪) হয়গ্রীবোপনিষৎ, (১০৫) দত্তাত্রেয়োপনিষৎ, (১০৬) গারুড়োপনিষৎ, (১০৭) কলিসন্তরণোপনিষৎ, (১০৮) জাবাল্যুপনিষৎ, (১০৯) গণেশপূর্বতাপিন্যুপনিষৎ, (১১০) গণেশোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ, (১১১) সন্ন্যাসোপনিষৎ, (১১২) গোপীচন্দনোপনিষৎ, (১১৩) সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ, (১১৪) পিণ্ডোপনিষৎ, (১১৫) মহোপনিষৎ, (১১৬) বহ্বৃচোপনিষৎ, (১১৭) আশ্রমোপনিষৎ, (১১৮) সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষৎ, (১১৯) যোগশিখোপনিষৎ এবং (১২০) মুক্তিকোপনিষৎ।

উল্লিখিত তালিকায়, ৬৮—সংখ্যক এবং ১১১—সংখ্যক উপনিষদ্বয়ের একই নাম—সন্ন্যাসোপনিষৎ। তাহাদের বিবরণও ভিন্ন এবং শান্তিমন্ত্র হইতে জানা যায়, তাহারা বিভিন্ন বেদের অন্তর্গত। ৬৮—সংখ্যক সন্ন্যাসোপনিষৎ সামবেদান্তর্গত এবং ১১১—সংখ্যক সন্ন্যাসোপনিষৎ শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত। একই নামের দুইখানা উপনিষৎ আরও দুইস্থলে দৃষ্ট হয়! ৬৪—সংখ্যক মহোপনিষৎ সামবেদান্তর্গত এবং ১১৫—সংখ্যক মহোপনিষৎ অথর্ববেদান্তর্গত। আবার ৬৬—সংখ্যক যোগশিখোপনিষৎ কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত এবং ১১৯—সংখ্যক যোগশিখোপনিষৎ শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত।

৩—সংখ্যক কঠোপনিষৎকে কোনও কোনও সংস্করণে কঠকোপনিষৎও বলা হইয়াছে।

"সর্বোপনিষৎসারঃ"—নামে আর একখানা মুদ্রিত উপনিষৎ দৃষ্ট হয়। ইহা অথর্ববেদের অন্তর্গত!

—গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ১ম খণ্ড, ১৩৬৩

বেদবিরোধী ভাবনা

তারপর তপোবনের নিভৃত ছায়ান্ধকারে দেখা দিল অরুণোদয়—বিশ্বাসের ধর্মচেতনায় এলো সমীক্ষার সন্ধানী আলো, হলো বেদবিরোধী ভাবনার সূচনা !

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড কঠোর শাস্ত্রের নিয়মে বাঁধা, সাধারণের অগম্য ; নারী বা শূদ্রজাতির কোন অধিকার ছিল না বৈদিক অনুষ্ঠানে ! তাই জটিল পদ্ধতির পরিবর্তে চাই সহজতর বিধান—সকলের পক্ষেই পালনীয়। পরবর্তী তন্ত্রসাহিত্যে সূচিত হলো বেদবিরোধিতার আভাষ—আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে।

কিন্তু এই পথেই কি ভারতীয় বস্তুবাদের জন্ম ? বার্হস্পত্য দর্শনে বলা হলো—প্রত্যক্ষ ছাড়া কোন প্রমাণ নেই, ঈশ্বর নেই, পরলোক নেই—অর্থ ও কামই একমাত্র পুরুষার্থ !

কুণ্ডলিনীতত্ত্ব

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

এক

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে কুণ্ডলিনী কিংবা ষট্‌চক্রাদির কোন উল্লেখ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ও জৈনাদির গ্রন্থেও কুণ্ডলিনীর কোন আলোচনা নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা তন্ত্রের নিজস্ব, কেহ বলেন, ইহা এবং এতৎসম্পর্কীয় বর্ণোপাসনা প্রণালী ভারতের বহির্দেশ হইতে (সম্ভবতঃ মগ দেশ হইতে) সমাগত। ভারতবর্ষে হঠযোগ এবং অক্ষর উপাসনা লইয়া যখন একটা নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তখনই ইহার প্রাধান্য স্থাপিত হয়। আবার কেহ মনে করেন, এই কুণ্ডলিনীযোগ উপায়বিশেষ—ইহা অবলম্বন না করিয়া, উপায়ান্তর দ্বারাও মোক্ষলাভ সম্ভবপর।

কুণ্ডলিনী চৈতন্য কিছু নূতন জিনিস নহে। কুণ্ডলিনী কি? তাহার চৈতন্য সম্পাদন কি?—তাহা না বুঝিলে তৎসম্পর্কে কোন আলোচনাই ফলপ্রদ হইবে না। কুণ্ডলিনীর অপর নাম আধার-শক্তি—যে শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় দিয়া সকল পদার্থের মূলসত্তারূপে বর্তমান রহিয়াছে। ইহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে ইহা নিরাধার হইয়া যায়। যখন কুণ্ডলিনী নিরাধার, তখন জগতের সকল বস্তুই নিরাধার। কুণ্ডলিনী যখন চৈতন্যময় হইয়া যায়; তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই চৈতন্যময় রূপ ধারণ করে। সুতরাং যাহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা হয়, তাহা ও "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিনির্দিষ্ট সর্বত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মময়তা অনুভবের সাধনা একই বস্তু। এই জাগরণ ক্রমশঃ হয়। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি এই জাগরণেরই অবস্থাভেদ মাত্র। যখন জাগরণ সম্পূর্ণ হয়, যখন নিদ্রা আর লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না, তখনই পরিপূর্ণ অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ হয়, তাহার পূর্বে দ্বৈতস্ফূর্তি অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকেই পূর্ণহন্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

দুই

মূল বস্তুটি পরম সাম্যাবস্থাস্বরূপ। উপনিষৎ ইহার স্বরূপনির্দেশ প্রসঙ্গে "পরমং সাম্যম্" এই পদই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে নামরূপ কল্পনা চলে না, ইহার চিন্তা নাই, বর্ণনা নাই—ইহা অবাঙ্‌মনসগোচর। আবার যাবতীয় নামরূপ চিন্তা ও বর্ণনার—এক কথায় সমগ্র বিশ্বের ইহাই মূল। ইহাকে তত্ত্ব ও তত্ত্বাতীত উভয়ই বলা হইয়াছে। ইহা বিশ্বাত্মক (immanent) হইয়াও বিশ্বাতীত (transcendent)। ইহাই উপনিষদের 'পূর্ণ' (The absolute)

কেহ যেন মনে করেন, এই বিশ্বাত্মক দিকটা মিথ্যা, বিশ্বাতীতই সত্য। লক্ষ্যভেদ বশতঃ জীব পরম পদার্থের যে কোন দিকে স্থিতি নিতে পারে। বস্তু যখন অভিন্ন অথচ স্বপ্রকাশ তখন যে-কোন দিকে স্থিতি নিলে উভয় দিক্‌ই যে সমভাবে খুলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

এই যে বিশ্বের দিক্—ইহাই "অপর" সাম্য। ইহাই বিন্দু-মহাবিন্দু। এখানে শিব ও শক্তি, ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি সমরস—একাকার। ইহা নিত্য অবস্থা। এখানে অনন্ত বৈচিত্র্য রহিয়াছে—অথচ সব একাকার।

যখন এই সাম্যভঙ্গ হয় অর্থাৎ স্তরানুসারে বিশ্বের আবির্ভাব হয়, তখন এই বিন্দুই শক্ত্যংশে পরিণাম লাভ করে এবং শিবাংশে সাক্ষী থাকে। সাক্ষী অপরিণামী ও একই, কিন্তু শক্তি ক্রমশঃ স্তরে স্তরে প্রসারিত হইতে থাকে। সাক্ষী কেন্দ্রস্থ, মূল শক্তিও তাই—উভয়ই একভাবাপন্ন। তবে শক্তির প্রসারণ ও সঙ্কোচ, এই দুইটি অবস্থা আছে। সাক্ষীর তাহা নাই—সাক্ষী সকল অবস্থার নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র, অর্থাৎ ইহা যেমন কেন্দ্রস্থ আত্মভাবাপন্ন মূল কিংবা সাম্যময়ী শক্তির দ্রষ্টা তেমনই প্রসারণ ও সঙ্কোচ নামক অবস্থাদ্বয়েরও দ্রষ্টা। সাক্ষী বিশ্বাতীত, সুতরাং নিত্যই কালচক্রের উর্ধ্বে অবস্থিত, অথচ ইহা কালচক্রের নাভিস্বরূপ। শক্তির প্রসারকে সৃষ্টি বলে, সঙ্কোচনকে সংহার বলে। প্রসার ও সঙ্কোচ উভয়েরই আদি ও অন্ত সাম্যাবস্থা। মধ্যে বৈষম্য কিংবা কালচক্রের আবর্তন। কিন্তু বৈষম্যেরও অন্তস্থলে সাম্যাবস্থা নিহিত রহিয়াছে।

সৃষ্টি ও সংহার, অর্থাৎ প্রসার ও সঙ্কোচ, শক্তির স্বভাব - স্বধর্ম, সুতরাং অনপায়ী। ইহা নিয়তই হইতেছে। এই বহির্গতি ও অন্তর্গতি, অধোগতি ও উর্ধ্বগতি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সম্মিলিতভাবে বৃত্তরূপে কল্পিত হয় এবং কালচক্র নামে অভিহিত হয়।

প্রদীপ হইতে যেমন প্রভা নির্গত হয়, জলাশয়ে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে সেখান হইতে যেমন চারিদিকে মণ্ডল রচিত হয়, বিন্দুও সেইভাবে প্রসারিত হয়। ক্রমবর্ধমান—কিন্তু বৃদ্ধির সীমা আছে। কারণ, সৃষ্টির প্রসৃতি অনন্ত হইতে পারে না—উহা প্রেরণার তীব্রতাসাপেক্ষ। আমরা পূর্বেই সঙ্কোচ ও প্রসার এই দুইটি ধর্মের উল্লেখ করিয়াছি। প্রসারশক্তি যতই ক্ষীণ হইয়া আসে, সঙ্কোচ-শক্তি ততই পুষ্ট হইতে থাকে। সঙ্কোচশক্তির ক্ষয়ে প্রসারের পুষ্টিও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। সঙ্কোচ ও প্রসারশক্তি ক্রমশঃ একটির-পর-অপরটি,প্রকট হইতে থাকে, ইহাই কালচক্রের আবর্তন—উর্ধ্বতম স্তর হইতে সর্বনিম্নভূমি পর্যন্ত সমগ্র

বিশ্ব এই চক্রে আবর্তিত হইতেছে। এইভাবে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ মধ্যস্থ বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। বিন্দু অপরিবর্তনশীল, সাক্ষী, উদাসীন।

বিন্দুরূপা সাম্যশক্তি যখন বিভক্ত হইয়া ব্যাকৃতরূপ ধারণ করে, তখন উহা তিনটি স্বতন্ত্র বিন্দুরূপে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, সাক্ষীর সহিত অভেদভাবাপন্ন তৃতীয় বিন্দু তখনও অবিকৃতই থাকে। সাম্যাবস্থায় ঐ তুরীয় বিন্দুর সহিত অপর বিন্দুত্রয়ের কোনই ভেদ নাই, কিন্তু বৈষম্যকালে মূল বিন্দু হইতে তিনটি বিন্দুই পৃথগ্‌ভাবে প্রকটিত হয়। বিন্দুর প্রাকট্যে রেখার সৃষ্টি, ইহা রেখাগণিতের সিদ্ধান্ত। বিন্দু কম্পিত বা স্পন্দিত হইলেই রেখা উৎপন্ন হয়। সংকল্পই কম্পনের হেতু সুতরাং সঙ্কল্প যেখানে বিকল্প-রহিত অর্থাৎ দ্বিতীয় সংকল্প-রহিত—যাহাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় সত্যসংকল্প বলা হয়—সেখানে রেখাও অখণ্ড—অনবচ্ছিন্ন, অবাধিত। রেখা চারিদিকে সমভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া, মণ্ডলাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রথম মণ্ডলটি সহস্রার নামে পরিচিত। বিন্দুটি ব্রহ্মবিন্দু বা আদিসূর্য, সহস্র রেখাই সহস্র অংশু বা চারিদিকে প্রসারিত সহস্ররশ্মি। এই জ্যোতির্ময় লোক ব্রহ্মলোক প্রভৃতি নানা নামে, ভাবভেদবশতঃ বিভিন্নভাবে, সর্বশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বময় রাজ্য।

এই জ্যোতির্মণ্ডলের বাহিরে দ্বিতীয় বিন্দুর মণ্ডল। আমরা ইহাকে তটস্থ, মধ্যস্থ কিংবা উদাসীনমণ্ডল নাম দিব। ইহার কেন্দ্র 'রজঃ' নামক দ্বিতীয় বিন্দু। 'রজঃ' শব্দের অর্থ কণা বা অণু। প্রথম স্তর অখণ্ড জ্যোতির্ময় ধাম। প্রসারণ শক্তি যখন যে-স্তরের চরম সীমা—জ্যোতিরেখার অন্ত্যবিন্দু ছাড়াইয়া বাহির হয়, তখন তাহারই প্রেরণায় জ্যোতিরাশি হইতে কণাসকল বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এইসকল কণা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতন অখণ্ড সত্ত্বের অংশ। অখণ্ড সত্ত্বের ন্যায় এই সমস্ত খণ্ড-সত্ত্বেও যে জ্যোতির্ময়, চৈতন্যময়, তাহা বলা বাহুল্য। পঞ্চরাত্রগণ ও ভাগবতসম্প্রদায় এই সকল কণাকে 'চিৎকণ' নাম দিয়াছেন। শৈবাচার্যগণের পরিভাষা অনুসারে ইহাদের নাম 'বিজ্ঞানাকল'। ইহাই বিশুদ্ধ জীবভাব। ইহার উর্ধ্বে সহস্রারের প্রান্তভূমি হইতে, শিবভাব বা ঈশ্বরভাব আরব্ধ হইয়াছে। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাতেও এই তটস্থ-মণ্ডলকেই 'সনাতন জীবলোক' বলা হইয়াছে—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'। এইসব নিত্য জীব অনন্ত শূন্যগর্ভে নৈশাকাশবিহারী উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে। কেহ-কেহ আপন উপাধি নিরুদ্ধ করিয়া কৈবল্যপদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদের স্বরূপ মূল সাক্ষীর সহিত অভিন্ন, উপাধি নিত্য হইলেও অব্যক্ত; সুতরাং এই সকল কেবলীদিগকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমে যাহা বলা

হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রথম মণ্ডলের পরেই মহাশূন্য, তন্মধ্যেই বিশুদ্ধ জীববিন্দুর স্থিতি।

আর একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিতেছি। সাক্ষীর দৃষ্টিক্ষেত্র যাহা, তাহাই আকাশ। সাম্যাবস্থার কথা কিংবা মহাপ্রলয়ের কথা আলোচনা করিব না। কিন্তু প্রথম বিন্দুর প্রসারক্ষেত্র চিদাকাশ। ইহাকে 'পরব্যোম' শব্দেও কোন কোন স্থানে নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিন্দুর প্রসারক্ষেত্রই চিত্তাকাশ—যাহার মধ্যে খদ্যোতমালার ন্যায় কোটি ব্রহ্মাণ্ড-পঙ্‌ক্তি ভাসমান রহিয়াছে।

এই দ্বিতীয় মণ্ডলের বাহিরে গভীর অন্ধকারময় তৃতীয় মণ্ডল। ইহা অখণ্ড তমোময় এবং বিভক্ত তৃতীয় বিন্দুর প্রসারণ হইতে উদ্ভূত। ইহাকে ভূতাকাশ বলিতে পারা যায়। ইহাই মায়া বা আবরণ। বৈষ্ণবগণ এই স্তরকে বহিরঙ্গ নাম দিয়াছেন। যে প্রসারণ শক্তি বিশুদ্ধ জীবভাব পর্যন্ত অভিব্যঞ্জনা করিয়াছে, তাহা তখনও ক্রিয়াশীল বলিয়া জীবরূপ বিন্দু প্রসৃত হইতে হইতে রশ্মিরূপে এই অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করে। এই ভূতাবরণ পঞ্চভাগে বিভক্ত বলিয়া তটস্থ-বিন্দু বিকৃত অবস্থায় পঞ্চবিন্দুরূপে বিভক্ত হইয়া প্রসারণের ফলে পঞ্চমণ্ডলরূপে পরিণাম লাভ করে। ইহারই পারিভাষিক নাম বিশুদ্ধাদি পঞ্চ চক্র। তটস্থ বিন্দু হইতে যে মণ্ডলের বিকাশ হয়, তাহার নাম আজ্ঞা চক্র। তাহার ঊর্ধ্বেই সহস্রার চক্র। মূলাধার বা সর্বনিম্ন চক্রই ঘোর অন্ধকারের কেন্দ্রস্থল।

মূলাধার বিন্দু হইতে বহির্গত হইলেই জীবকণা বা সুষুম্নাবাহী জীবরশ্মি স্থূল পঞ্চকৃত ভূতময়-আবরণে বেষ্টিত হইয়া পড়ে। এই স্তরেই স্থূল জগতের জীব গঠিত হইয়া অবস্থিত থাকে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার স্থূল বস্তু ছিল, আছে এবং হইবে সে-সমুদায়ের বীজ এই স্তরে চিরবর্তমান। মহাপ্রলয়ের সময় এই পঞ্চীকৃত স্তর স্বভাবের নিয়মে অপঞ্চীকৃত হইয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয় এবং বিশুদ্ধাদি চক্রে বিলীন হইয়া যায়। বলা বাহুল্য এই অবস্থা প্রসারশক্তির ক্রিয়াবসানে সঙ্কোচশক্তির উন্মেষ হইলে হইয়া থাকে। সঙ্কোচশক্তির ক্রিয়া যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ততই পঞ্চচক্র ক্রমশঃ উপসংহৃত হইয়া পঞ্চবিন্দুরূপ ধারণ করে, এবং পঞ্চবিন্দু পরে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। আজ্ঞামণ্ডল অথবা তটস্থ চিৎপরমাণুপুঞ্জও এইপ্রকারে উপসংহৃত হয়। সহস্রার মণ্ডল ও মূল সত্ত্ববিন্দুতে আকুঞ্চিত হইয়া যায়। তদন্তের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন বিন্দু বা মূলত্রিকোণরূপ মহাশক্তির তিন কোণ—যাহা ত্রিবৃৎকরণ প্রণালীতে অভিব্যক্ত হইয়াছিল—বৈষম্য পরিত্যাগপূর্বক অন্তঃস্থ মহাবিন্দুতে

সাম্যভাবে অবস্থান করে। এই মহাবিন্দুই বৈষ্ণবগণের মহাবিষ্ণু, ত্রিক মতাবলম্বী শৈবাচার্য এবং শাক্তাগমবিদ্‌গণের সদাশিব। বেদান্তে ইহাকে তুরীয় বলে,—ইহা সাম্যরস্য অবস্থা। এখানে সাক্ষী ও সাম্যশক্তি একাকার—অদ্বৈত-ভাবাপন্ন। এখানে দেশ নাই, কাল নাই, কলা নাই, মন নাই—এমন কি উন্মনী-শক্তি পর্যন্ত এখানে নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে। ইহার উপরেও অবস্থা আছে। কেহ কেহ তাহাকে তুর্যাতীত নাম দিয়াছেন। শৈব এবং শাক্তগণের শিব-শক্তি বা কামেশ্বর-কামেশ্বরী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রাধা-কৃষ্ণ এই মহাবিন্দুর উর্ধ্বে অবস্থিত।

পঞ্চীকরণ অথবা স্থূলজগৎ বা বীজসৃষ্টি সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। বিশুদ্ধাদি পঞ্চবিন্দু হইতে রশ্মি বিকীর্ণ হয়—ইহাই পঞ্চ তন্মাত্রাচক্র। রশ্মি বিকীর্ণ হইলেই পরস্পর মিশ্রণ হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রথম বিন্দু হইতে নির্গত রশ্মিজাল দ্বিতীয়াদি চারিটি বিন্দু হইতে নির্গত রশ্মিসহ একত্র হয়, মিশ্রিত হয়। এইপ্রকারে শব্দতন্মাত্রা স্পর্শাদি চতুর্বিধ তন্মাত্রাসহ মিশ্রিত হইয়া প্রথম চক্রকে আকাশমণ্ডলরূপে পরিণত করে। এই আকাশ স্থূলাকাশ, যাহাতে শব্দাংশের প্রাধান্য থাকিলেও স্পর্শাদি তন্মাত্রার মিশ্রণ আছে। এইরূপে দ্বিতীয় বিন্দু হইতে রশ্মি বহির্গত হইয়া অন্যান্য স্তরের রশ্মির সহিত মিশ্রিত হইয়া স্থূল বায়ু-মণ্ডল রচিত হয়। ইহা দ্বিতীয় অধস্তন বিন্দুর চক্র—সুতরাং আকাশমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রণালীতে স্থূল তৈজস মণ্ডল এবং ভূমণ্ডল রচিত হইয়া ক্রমশঃ অভ্যন্তরে স্থিতিলাভ করে। স্থূলতম ভূমণ্ডল মধ্যস্থলে—অর্থাৎ নিম্নভূমিতে—অবস্থিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ভূমণ্ডল বলিতে কেহ যেন এই পৃথিবীমাত্রকে না বুঝেন। এই পৃথিবী এবং অনন্ত পৃথিবী—শুধু তাহাই নহে, যাহা কিছু পার্থিব বা পৃথ্বীবহুল পঞ্চীকৃত বস্তু,—সবই এই ভূমণ্ডল বা ভূলোকের অন্তর্গত। অন্যান্য মণ্ডল সম্বন্ধেও এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। পঞ্চীকরণ কালে পঞ্চতন্মাত্রার মিশ্রণের তারতম্যনিবন্ধন অনন্তপ্রকার স্থূল কণা বা অণু (যাহাকে পূর্বে 'বীজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি) উৎপন্ন হইয়াছে। এক একটি মণ্ডলে এক একটি ভাবের প্রাধান্য থাকে বলিয়া এই পরমাণুকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভূলোকে যদিও সব পরমাণুই পার্থিব তথাপি একটি পৃথিবী পরমাণুর সহিত অপর একটি পৃথিবী-পরমাণুর বৈলক্ষণ্য আছে। যোগিগণ বিবেকজ্ঞান দ্বারা সে বৈষম্য গ্রহণ করিতে পারেন। যেমন পার্থিব পরমাণুর মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, সেই প্রকার অন্যান্য পরমাণুর মধ্যেও আছে।

স্থূলস্তরে আসিয়া প্রসারশক্তি প্রতিহত হয়। স্থূল-জগৎই বাহ্যজগৎ। বাহ্য-জগতে, স্থূলদেহে, কালচক্র আবর্তিত হইয়া থাকে। এই আবর্তনমার্গের একাংশ (বাম) ইড়া ও অপরাংশ (দক্ষিণ) পিঙ্গলা। এই উভয়মার্গের প্রত্যেকটি অসংখ্য শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট এবং মৎস্যজালের ন্যায় সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। প্রসারশক্তি স্থূলে আসিয়া প্রতিহত হয়—এ কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তখন জীবও স্থূল কোষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে—পূর্বস্মৃতি ভুলিয়া যায়, বৈষ্ণবী-মায়ায় বিমোহিত হইয়া ইড়া-পিঙ্গলামার্গে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে সঞ্চরণ করিতে থাকে। এই সঞ্চারকে সংসারগতি অথবা কালচক্রে পরিভ্রমণ বলা হয়। যে শক্তিপ্রবাহ প্রথমতঃ জ্যোতিরূপে ও পরে নাদরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই স্থূলস্তরে আসিয়া প্রাণরূপে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ু প্রভৃতি এই প্রাণশক্তিরই বিকাশ।

যখন প্রসারশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সঙ্কোচশক্তির ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই এই ব্যবস্থা। ব্রহ্মাণ্ডে এই সঙ্কোচশক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া সাম্যাবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে। পৃথক্ চেষ্টা না করিলে প্রতি ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের মুক্তির সঙ্গে মহাপ্রলয়ের সময় মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু পুরুষকার প্রয়োগ করিলে ব্রহ্মাণ্ডের মুক্তিকালের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না।

তিন

কুণ্ডলিনী চৈতন্যের সঙ্গে-সঙ্গে ইড়াপিঙ্গলায় প্রবহমান স্রোত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সুষুম্না পথে প্রবেশ করে, এবং সুষুম্না পথেও ঊর্ধ্বে উঠিতে-উঠিতে ক্রমশঃ আরও অধিকতর সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবশক্তি বজ্রা ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদ করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাড়ী অথবা আনন্দময় কোষে গমন করে। ইহাই ঐশ্বর্য অবস্থা। আনন্দময় কোষেও যখন আর লক্ষ্য থাকে না, তখনই গুণাতীত পরম সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে।

ঊর্ধ্বস্থ সত্ত্ববিন্দু এবং অধঃস্থ তমোবিন্দু পর্যন্ত রেখাকে মেরু (axis) বলা চলে। এই রেখার ঊর্ধ্ববিন্দু উত্তরমেরু এবং অধোবিন্দু দক্ষিণমেরু (North and South Poles)। উভয় বিন্দুর আকর্ষণশক্তি বিশিষ্ট। অধোবিন্দুর আকর্ষণের আকর্ষণশক্তি বিশিষ্ট। অধোবিন্দুর আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ—ইহা ভূমধ্য হইতে প্রসৃত। ঊর্ধ্ববিন্দুর আকর্ষণ সংকর্ষণ নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম কৃপা। ইহা ঊর্ধ্ববিন্দু অর্থাৎ আদিসূর্য কিংবা ঈশ্বরোপাধির কেন্দ্র হইতে চতুর্দিকে

প্রসারিত। আজ্ঞাস্থ বিশুদ্ধ জীব বা কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষ উভয় আকর্ষণের ঠিক মধ্যস্থলে তটস্থভাবে বর্তমান। তাঁহাদের উপাধি নির্মল বলিয়া তাঁহাদের প্রতি মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া হয় না—এইজন্য ব্রহ্মচিন্তাভ্যন্তরে তাঁহাদের স্থিতি নাই। ঊর্ধ্বদৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের প্রতি ভগবৎকৃপাশক্তিও ক্রিয়া করে না। ইহাদিগকে সাংখ্যজ্ঞানী বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে—ইঁহারা ঈশ্বরের শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ধামে স্থান লাভ করেন না। ইঁহারা মায়াতীত হইয়াও মহামায়ার অধীন। আগমে ইঁহাদের নাম বিজ্ঞানাকল দেওয়া হইয়াছে।

ইহার অবশ্য ক্রম আছে। যখন কোন অনির্বচনীয় কারণে এই তটস্থ বিন্দু ঊর্ধ্বমুখ হয় তখন অখণ্ড সত্ত্ববিন্দুর সহিত তাহার সান্মুখ্য হয়। ইহাকে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার বলে। তখন আর সে তটস্থ নহে, তখন সে সহস্রারে প্রবিষ্ট হইয়া আপন রেখা অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা ভাবের সাধনা—ইহাও স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। তমোবিন্দু যেমন পাঁচভাগে বিভক্ত, সেই প্রকার এই শুদ্ধসত্ত্বস্তরও পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এক এক স্তরে একটি ভাবের প্রাধান্য। শান্ত হইতে মাধুর্য পর্যন্ত এই পাঁচ স্তর প্রসারিত রহিয়াছে। মাধুর্যই শুদ্ধসত্ত্ববিন্দুর অন্তরতম অথবা ঊর্ধ্বতম ভাব। যখন ইহাও অতিক্রান্ত হয়, তখনই পূর্ণাবস্থা লাভ হয়, তৎপূর্বে নহে। তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ মণ্ডল অতিক্রান্ত হইলে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য পূর্ণ হইল বলা যায়।

কুণ্ডলিনীর পূর্ণ জাগরণে একমাত্র অদ্বিতীয় ও পূর্ণ বস্তুতেই স্থিতি হয়, সমগ্র জগৎ নিরাধার হইয়া ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়, আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক ব্রাহ্মস্থিতি, শাশ্বত পদে অবস্থান সুসিদ্ধ হয়।

মহেন্দ্রনাথ সরকার

তন্ত্র ও জীবন

বর্তমান জীবনে তন্ত্রের উপযোগিতা কি? এ দেশে বস্তুত অধ্যাত্ম মার্গের কোনও পথই আজকার দিনে তাহার প্রয়োজনীয়তা হারায় নি। যে পট-ভূমিকায় আজ জীবনকে দেখছি, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এসব সাধনার স্থান কোথায়ও নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীত হবে যে, মানুষের চিত্তে উর্দ্ধ ও অধোগতি আছে তার আকর্ষণ বিশ্বের দিকে ও বিশ্বাতীতের দিকে। বিষয়ের পরিবেষ্টনে মানুষ তার সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করতে পারে না এতে কিন্তু তার প্রাণ, মন তৃপ্ত হতে পারে না, যদিও বিষয় নিয়েই তার জীবন। মানুষের বিষয়ের প্রতি প্রীতি যেমন স্বাভাবিক তার প্রতি বিরক্তিও তেমনি স্বাভাবিক। কারণ মানুষের উদার সত্তা বিষয়াসক্ত হয়ে স্ফুরিত হয় না। প্রাণের বৃত্তি ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় সুখ পায় না। তাই সে প্রাণের সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনী হতে চায় মুক্তি।

কিন্তু এও সত্য যে, জীবনের বৃত্তি ভোগের চরিতার্থতা চায়। এই ভোগস্পৃহা সহসা দূরীভূত করা যায় না। জীবনে ভোগ স্বাভাবিক বৃত্তি, এতেই জীবনের স্ফূর্তি বৃদ্ধি ও অখণ্ড অনুবৃত্তি—এর বিকাশ সহসা নিরোধ করে এর উল্লাস নষ্ট করতে তন্ত্র চায় না। জীবনের সবখানিই তন্ত্র গ্রহণ করেছে—ভোগ ও মোক্ষ। জীবনবাদ ও মোক্ষবাদ, দুই-ই তন্ত্রে স্থান পেয়েছে। তন্ত্র দেখিয়েছে জীবন ও মুক্তির সমন্বয়—জীবন্মুক্তি।

ভোগের সব উপকরণ ও উপায়ের কথা তন্ত্রে আছে। তন্ত্রের সাধনা ভোগের প্রাচুর্য, পূর্ণতা ও স্বায়ত্তীকরণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেছে। স্থূল-ভোগ, প্রকৃতিবশ্যতা, সঙ্কল্পসিদ্ধি, তান্ত্রিক সাধক সবটাই আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ ভোগ শুধু ভোগের জন্যই নয়। ভোগমাত্রই কাম্য নয়। ভোগের ভিতর আছে যে বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞানই লভ্য। তত্ত্বের প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে পরিচিত হবার কৌশল এ বিজ্ঞান দেয়। এই বিজ্ঞানের বলেই তান্ত্রিক সব স্তরেই স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করেন। ভোগের ভিতর তিনি থাকেন উদাসীন। জীবনের সব বৃত্তিগুলির সঙ্গে তান্ত্রিক সাধক পরিচিত বলে স্পষ্টত তার প্রতীতি হয় যে, এ-বৃত্তি পঞ্চভূতের দ্বারা নিয়মিত—এরা পঞ্চভূতেরই বিকাশ। ভূতের সূক্ষ্মতায় বৃত্তির সূক্ষ্মতা। ভূতের শুদ্ধিতে বৃত্তির শুদ্ধি। বৃত্তি বিশ্লেষণ (**Psycho analysis**) আজ মনোবিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই বিশ্লেষণ অধিমানস বৃত্তির দ্বারা। এ-

তত্ত্বগুলি অধিকৃত হলেই বৃত্তির উপর পূর্ণ আধিপত্য জন্মে এবং মানুষের স্বভাব একেবারে বদলে যায়।

যে-সব ভোগবৃত্তি মানব জীবনকে এত চঞ্চল করে সেগুলি তন্ত্র একেবারে উচ্ছেদ করতে চায় না, বৃত্তিগুলি জীবনে এমনভাবে অনুস্যূত যে, তাদের বিনাশে জীবনেরই বিনাশ, তন্ত্রের অধিকারের দ্বারা তন্ত্র তাদের নিয়মণ, সংস্করণ ও সূক্ষ্ম স্ফূর্তি করতে চেয়েছে। স্থূল বৃত্তিগুলিকে সূক্ষ্মে পরিণত করাই এ-সাধনার প্রথম স্তর। মহাশক্তিকে আকর্ষণ করে জীবনের বৃত্তিগুলিকে সজীব ও সুতীক্ষ্ণ করা ও তাদের পূর্ণ বিকাশ করাই তন্ত্রের লক্ষ্য। শক্তিহীনতা নয়—শক্তির পূর্ণতাই তার কাম্য।

তন্ত্রের বীরমার্গ প্রকৃতিকে নিয়মিত করে ভোগের বৃত্তিগুলিকে অধিকৃত করতে চেয়েছে, কিন্তু বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ এতে হয় না। বীরমার্গে নিম্নপ্রকৃতি বশীভূত হয় বটে, পরন্তু পূর্ণরূপে দিব্য হয়ে ওঠে না। বৃত্তির উপাদানে তখনও থাকে অনমনীয়তা, বাধা। বীরমার্গে প্রকৃতি তার বশ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে, যদিও তাকে দমন করে বীরসাধক প্রকৃতির হাত হতে মুক্তি পায়, তবুও সেখানে প্রকৃতির দ্রোহিতার সম্ভাবনা থেকে যায়। বীরমার্গেই সাধকের জীবনে শক্তি উল্লসিত, প্রাচুর্য ভোগ ও সূক্ষ্ম শক্তি বাড়ে। সাধক অতিমানব (**Superman**) হয়, তার ইচ্ছা হয় অপ্রতিহত, ক্রিয়াশক্তি অদমিত, জ্ঞানের আবরণ সূক্ষ্মলোক হতে হয় উন্মোচিত।

দিব্যমার্গে যেখানে রূপান্তর হয় পূর্ণ সেখানে প্রবৃত্তির কোন জড়তা, রুক্ষতা বা বাধা থাকে না। সাধকের সবটাই হয় দিব্যশক্তিতে বিভূষিত ও পূর্ণ। সত্তার কোথায়ও এতটুকু আবরণ থাকে না। সবটাই হয় স্বচ্ছ, তেজোময়, অন্তর দিব্যশক্তিতে চালিত হয়, বুদ্ধিসত্ত্বা এত শুদ্ধ হয় যে বিশ্বদর্পণের কাজ করে। উর্দ্ধলোক, অধঃলোক হয় প্রকাশিত, প্রাণ বিশ্বপ্রাণে, বিজ্ঞান বিশ্ববিজ্ঞানে হয় উদ্ভাসিত। দিব্যমার্গের সিদ্ধ-সাধক ঈশ্বরবৎ বিচরণ করেন, বিশ্ব কেন্দ্রীভূত হয়, তিনি হন বিশ্বাত্মা। এত বড় সম্ভাবনা এ-ক্ষেত্রে বর্তমান ; দিব্যজ্ঞান, দিব্যশক্তি, দিব্যসম্পদের হন তিনি অধিকারী।

অভিব্যক্তির শেষ সীমায় দিব্যভাবের অধিকারী হয়ে তাঁরা হন স্বরূপস্থিত, সাধারণ অভিব্যক্তি বাদে এত বড় অভিব্যক্তির কল্পনাও করা যায় না। এ শুধু অতিমানবের (**Superman**) কল্পনা নয়। তাতে শক্তির দিব্য দ্যোতনা নেই—কারণ তার ভিতর থাকে না বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি বা নিয়ন্ত্রণ ইচ্ছা।

বর্তমানে জীবনের এরূপ অভিব্যক্তির কথা কেহ ভাবে না, কল্পনাও করে

না; কিন্তু জীবনের শক্তি সম্ভাব্যে এটা যে অনুস্যূত তাতেও সন্দেহ নেই। এরূপ জীবনই সকল সংঘর্ষ, সকল বিরোধ হতে মুক্ত। এরূপ জীবনে পৃথিবীর সব স্পর্শ থাকে, দিব্যভাবের অভিব্যক্তির দ্বারা তারা পার্থিব জীবনকে সুন্দর, মধুর ও কল্যাণময় করে তোলেন। এই তো মানবতার চরম বিকাশ! তন্ত্রের মতে এরূপ বিকাশের সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে আছে—ইচ্ছা (will) নিয়ন্ত্রণমূলক সাধনার দ্বারা এরূপ বিকাশের পথ উন্মুক্ত করাই অভ্যুদয়ের পথ। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে যে-দ্বন্দ্ব, তার কারণ বিকাশের পথে মলিন কামনা ও অশোভনীয় সত্তার উপস্থিতি। এই দ্বন্দ্ব ও মলিন সত্তাকে পরিচ্ছন্ন করে ব্যক্তির ও সমাজের উচ্চতর বিকাশ সাধনই তন্ত্রের উদ্দেশ্য। দিব্য জীবনের সুষমায় পূর্ণ করে মানুষকে সুন্দর ও মহিমান্বিত করতে চেয়েছে তন্ত্র। জীবনকে দিব্যভাবে পূর্ণ করে দিব্যসঙ্ঘ রচনা করতেও তন্ত্র চেষ্টা পেয়েছে। জীবনের মূল থেকে দ্বন্দ্ব উৎপাটিত করে জীবনের সুষ্ঠুতর পরিণতি তন্ত্র শুধু আকাঙ্ক্ষা করে নি, পূর্ণ করেছে, আর দিয়েছে তার সাধনার ইঙ্গিত।

এখানেই তন্ত্রের নূতন সমাজ বিধান। চেতনার পূর্ণ সঞ্চারে যা কালিমাযুক্ত তাকে অপসারিত করে দিব্য দ্যোতনায় পূর্ণ ব্যক্তি নবীন সমাজতন্ত্রের উদ্বোধন করে। এরূপ সমাজতন্ত্র ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করে না —চেতনা ও প্রাণের শুদ্ধি হেতু এমনভাবে সাধক জাগ্রত হয় যে, সমষ্টির সত্তায় যে উদ্বোধিত হয়, সমষ্টি প্রাণে একপ্রাণতা অনুভব করে, একইভাবে ভাবান্বিত হয়, একই বিজ্ঞানে পরিচালিত হয়। এটা শুধু একটা দার্শনিক দৃষ্টি নয়— বিজ্ঞানলোককে প্রাণকেন্দ্রে নামিয়ে এনে প্রাণের পরিশুদ্ধির দ্বারা প্রাণকে স্বচ্ছ করে সমষ্টির ভিতর একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠা করা। বিজ্ঞান ও প্রাণের অশুদ্ধিতার জন্যই এত সংঘর্ষ এবং একে বাইরের মতবাদ বা চেষ্টার দ্বারা কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। সাধক তাই বুঝে দিব্যসঙ্ঘ রচনা করেন। অনন্ত প্রসারিত দৃষ্টি সাধককে দেয় সত্যের পরিচয়, তাই তারা মানবসমাজে দিব্য প্রেরণা-সঞ্চার করে উজ্জ্বলতার ও মধুরতার সাক্ষাৎকার করতে চেয়েছেন।

এই বিজ্ঞানালোকই প্রাণের ছন্দ—প্রতিষ্ঠ পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের উপর নূতন আলোক সম্পাত করে। নারী—নারী, বিশ্বশক্তির মহাধার, তাই তন্ত্রে নারী উপাস্য—মহাশক্তির চিন্ময় বিগ্রহ। নারীর ভিতর শক্তির জাগরণ সহজ ও স্বাভাবিক, নারীর আধারে জাগ্রত শক্তি পুরুষকে কল্যাণের পথে করে উদ্বোধিত, নারীকে অধ্যাত্মজীবনে সাধারণত দূরে রাখা হয়েছে; তন্ত্র কিন্তু তাকে আহ্বান ক'রে সিদ্ধির পরম সহায়রূপে গ্রহণ করেছে, নারীসত্তার সবটুকুই

পবিত্র, নারী শক্তির প্রতীক, এই নারী প্রতীকে মহাশক্তির উদ্বোধন সহজ, তাই জীবন্ত স্ত্রী-প্রতীকে শক্তির জাগরণ তান্ত্রিকের পরম কাম্য, আধারের প্রতিটি কেন্দ্রের বাধাবিঘ্ন ও অশুদ্ধি অপসারিত করে নারী ও পুরুষ উভয়েই হয় পুঞ্জীভূত শক্তি বিকাশের কেন্দ্র। নারী দিব্যশক্তির বিভূতিতে হয় পূর্ণ ও বিভূষিত। এরূপে পুরুষ নারীতে এবং নারী পুরুষে শক্তির সঞ্চারে তাদের ভিতর ব্যবধান দূরীভূত করে পারস্পরিক জীবন-ছন্দে অলৌকিক সমতা ও এক-প্রাণতা প্রতিষ্ঠা করে এবং উভয়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তন্ত্রের ভাষায় "সাম্যরথ" বিধানে পরম শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়।

এ-বিষয়ে তন্ত্রের মত প্রচলিত স্মার্ত মত হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্মার্ত মতে বিরুদ্ধ শক্তি হতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃরূপে বিবেচিত হয়েছে। তন্ত্র কিন্তু এই বিরোধী শক্তি নিয়েই যোগ-সাধনা করেছে এবং শক্তি-বিজ্ঞানে দক্ষ হয়ে বিরোধের স্থানে অপূর্ব সমতা প্রতিষ্ঠা করে শক্তির সাহায্যে জীবনের ও সাধনার পথ সুগম, সুন্দর ও সহজ করেছে। স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ যদি নিম্নাভিমুখী না হয়, তবে এই আকর্ষণই চিত্তের গভীর ছন্দোবৃত্তি জাগিয়ে তোলে —যাতে হয় সত্তার জাগরণ, সাধনায় নারী-পুরুষ পরস্পর সহায়ক হয়। একজন ঊর্দ্ধ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হলে আর একজন সেই ছন্দের আকর্ষণে সত্তার গভীর সংবেদন ও আন্দোলন উপস্থিত হয়, আর যেখানে পরস্পরের প্রেম-প্রীতির আকর্ষণ খুব বেশি এবং সমস্ত স্বার্থ-বিদ্বেষ হতে মুক্ত, সেখানে কুণ্ডলিনীর জাগরণ অবশ্যম্ভাবী, তন্ত্র এভাবে জীবনের স্বাভাবিক লৌকিক সম্বন্ধকে ছন্দানুবৃত্তি লাভে উদ্বুদ্ধ করে সত্তার বিভিন্ন কেন্দ্রস্থানগুলিতে চেতনার ও প্রাণের তীব্র সঞ্চার করার ইঙ্গিত দিয়েছে। তন্ত্র-সাধক ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ প্রাণ সঞ্চার করে বিরাট ব্যাপ্ত চেতনায় নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণমূলক সমুন্নয়নে। সত্তার এই অপূর্ব জাগরণ তখনই সম্ভব যখন উভয়েরই লক্ষ্য এক পরম কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে থাকে।

তন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে, সব ব্যবহারে সঙ্কীর্ণ ভাব ও গতিকে প্রসারীভূত ভাব ও গতিতে পরিণত করে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা করা, এ সম্ভব হয় শক্তির গভীর প্রেরণা, যাতে বিরাটের অভ্যুদয়, জীবনের প্রতি সঞ্চারে আছে যে বিরাটের ছন্দ, তাকে ধরেই এই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার ইঙ্গিত তন্ত্রে যেমন সুস্পষ্ট এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। আমাদের আধুনিক জীবন ও পরিবেশের সর্বক্ষেত্রে যেরূপ ছন্দোহীন বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ ও স্বার্থ ভিন্ন তুচ্ছ দ্বেষ-বিদ্বেষে ভরে উঠেছে তাতে এই তন্ত্র সাধনার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধিই পেয়েছে। তন্ত্রের অনুশাসন আমাদের সাধন ও সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে

নিত্তনৈমিত্তিক অনুষ্ঠিত হলেও, তন্ত্রের গভীর মর্ম এবং জীবনে তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ, সিদ্ধি ও বিকাশের বিষয় আমরা তেমন অবহিত নই। অপর পক্ষে তন্ত্রের রহস্য বিদীর্ণ করতে না পেরে বরং বিরূপ মনোভাবই লক্ষ্যে পড়ে। অথচ জীবন-বিকাশের এমন পরিপূর্ণ ইঙ্গিত আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

তন্ত্রের আলো (সংক্ষেপিত)

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র

বুদ্ধের নিজের ধর্মমত পরবর্তীকালে নানা সম্প্রদায়ের হাতে বিভিন্নরূপে নিয়েছিল। যে-কোন শক্তিশালী ধর্মমতের ক্রমবিকাশে কেউ বাধা দিতে পারে না। বুদ্ধের ধর্মমত সংকীর্ণ ছিল না, সেইজন্যই বহু শতাব্দী ধরে সে ধর্মমত প্রসার লাভ করেছিল। প্রতিভাবান বৌদ্ধ আচার্যদের যুক্তিতর্কপূর্ণ ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে সে ধর্মমত নিত্য নূতন ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়েছিল। পরবর্তী-কালের এই পল্লবিত বৌদ্ধধর্ম বিচার করবার পূর্বে আমরা বুদ্ধের নিজের ধর্মমতের আভাস দেবার চেষ্টা করব।

বুদ্ধ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড মানতেন না সত্য কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম নষ্ট করাই যে তাঁর ধর্মের একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল এমন কথা বলা চলে না। কেউ-কেউ বুদ্ধকে সোশ্যালিস্ট আখ্যা দিয়েছেন, কেউ বা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে বুদ্ধ বর্ণবিভাগ ভেঙে দিয়ে ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব করেছিলেন। আবার অনেকে দেখিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন পতিতপাবন, কারণ তার শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই নীচ-জাতীয়। এ-সকল মতের কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ সোশ্যালিস্ট বা পতিতপাবন কিছুই ছিলেন না। কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধান তার ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির পথ খুঁজে বের করবার জন্যই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দীর্ঘ সাধনায় সে-পথের সন্ধান পেয়ে দশজনকে সেই পথে চালিত করবার চেষ্টাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছিল। এই মুক্তিমার্গ হচ্ছে গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ, কোন বিশিষ্ট বর্ণের নিজস্ব নয়। বস্তুত এই মার্গ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বানপ্রস্থ ও যতিরই রূপান্তর। এই বানপ্রস্থকেই বুদ্ধ সার্বজনীন করতে চেষ্টা করেছিলেন। বানপ্রস্থধর্মে জাতি বা বর্ণ বিচার নেই, বুদ্ধের ধর্মেও তা নেই।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, এমন কথাও ঠিক নয়। বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থে ব্রাহ্মণের প্রশংসাই রয়েছে। অবশ্য এ-ব্রাহ্মণ সত্যকার ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেই ব্রাহ্মণ হয় না। উপনিষদের ব্রহ্মদ্রষ্টা ব্রাহ্মণই এই ব্রাহ্মণ। ধর্মপদে বুদ্ধ বলেছেন :

'সূর্য যেরূপ দিনে, চন্দ্র রাত্রে ও রাজা সেনানী পরিবেষ্টিত হয়ে প্রদীপ্ত হন, ব্রাহ্মণ সেইরূপ ধ্যানবলে প্রদীপ্ত হন। যিনি পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যাঁর অন্তর ও বাইরের ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ দমিত, যার আত্ম-পর জ্ঞান নষ্ট হয়ে সমদৃষ্টি উৎপন্ন, যিনি

মানসিক ক্লেশ, সংযোগ বা আসক্তি শূন্য তিনিই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণকে প্রহার করা, বা তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারকে বুদ্ধ গর্হিত কাজ মনে করতেন।

বুদ্ধ যে ভিক্ষুসংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাকে কতকগুলি নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হতো। পরিধেয় বস্ত্র, পানভোজন, ভিক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি বাইরের ব্যাপারে ভিক্ষুর নিজের স্বাধীনতা ছিল না। বুদ্ধপ্রদর্শিত বিনয়-ব্যবহারের দ্বারাই এগুলি নিয়ন্ত্রিত হতো। এই বিনয়-ব্যবহারকে বিধিবদ্ধ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে বৌদ্ধ-সাহিত্যে বিপুল বিনয়পিটকের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই বিনয়ের মূলসূত্রগুলি বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধের নিজস্ব মনে করা অসংগত হবে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের বিধিগুলির উপরেই বৌদ্ধ বিনয়-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য পালন করা, সত্য কথা বলা, অহিংসা, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি ব্রত গ্রহণ করা উভয় ধর্মেরই মূলসূত্র। নির্দিষ্ট সময়ে লব্ধ ভিক্ষায় দেহপোষণ করা, সকল প্রাণীর উপর সমদৃষ্টি, অধ্যয়ন ও ধ্যান-ধারণায় সময় অতিবাহিত করে মুক্তিকামনা, বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক উভয়েরই লক্ষ্য। সুতরাং বাইরের আচার-ব্যবহারের দিক দিয়ে যে-বুদ্ধের ধর্মের একটা বিশিষ্টতা ছিল এ-কথা মনে করবার কারণ নেই। অনেকে এইসব ভ্রান্ত মতকেই পল্লবিত করে বলতে চেয়েছেন যে, বুদ্ধের সময়ে উত্তরভারতে যেসব (কল্পিত?) গণতন্ত্র বা রিপাবলিক ছিল বুদ্ধ তারই আদর্শে নিজের সংঘকে তৈরি করেছিলেন, অর্থাৎ বুদ্ধের স্থাপিত বৌদ্ধসংঘ ছিল ক্ষুদ্র গণতন্ত্র। এ-কথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভিক্ষু হচ্ছে মুক্তিকামী বা মুক্ত। নিজের গুরু ব্যতীত আর কোন ব্যক্তির আদেশ তাকে মানতে হয় না। বুদ্ধের জীবদ্দশায় এই গুরু ছিলেন বুদ্ধ, পরবর্তীকালে সংঘনায়কেরা। বুদ্ধ নিজে কারও নির্বাচনের অপেক্ষা করেন নি। সংঘনায়কেরা নির্বাচিত হতেন ভোটে নয়, অধ্যাত্মসাধনায় যে-উৎকর্ষলাভ করতেন তারই বলে।

তাহলে প্রশ্ন উঠবে, বুদ্ধের ধর্মে বৈশিষ্ট্য কোথায়। এ-বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হবে বুদ্ধের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বা দর্শনে। গল্পের কথায় বলতে গেলে বুদ্ধ মানুষের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দেখেই প্রথম দুঃখে অভিভূত হন; সেই সার্বজনীন দুঃখের কারণ ও উপশমের উপায় নির্ধারণ করবার জন্য গৃহত্যাগ করেন। দ্বাদশ বৎসর সাধনার পর তিনি যে-বোধিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলেন, তাতেই জগতের সকল রহস্য তাঁর সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হলো ও তিনি দুঃখের কারণ ও তার উপশমের উপায় নির্ধারণ করতে সমর্থ হলেন। এই দুঃখবাদ আলোচনা করার পূর্বে জগতের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধ কি ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন দেখা যাক।

উপনিষদের শিক্ষার সারমর্ম হচ্ছে, ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা। প্রকৃতি বা দৃশ্যমান জগৎ ও জীবের পিছনে কোন আত্যন্তিক সত্য নেই—জীব ও প্রকৃতি শুধু প্রতিভাস মাত্র, কল্পলোকের সৃষ্টি। আত্যন্তিক সত্য হচ্ছে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মেই জীবাত্মার একমাত্র অস্তিত্ব। বুদ্ধ এই অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রথমটা মানলেন, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটা বর্জন করলেন। বুদ্ধের দর্শনেও জীব ও প্রকৃতি বা জগৎ প্রতিভাস মাত্র।—কল্পলোকের অনিত্য বা অস্থায়ী রচনা। বুদ্ধের ভাষায়—জীব ও জগৎ কতকগুলি 'ধর্ম' ও 'সংস্কারের' প্রবাহমাত্র। এখানে ধর্ম ও সংস্কার বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। ধর্মের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে, যা ধারণ করে; আর সংস্কারের অর্থ হচ্ছে, যাদের এক সঙ্গে (সমীকৃত) করা যায়।

তাই ধর্মের অনুবাদ করা হয়েছে **formation** বা **presentation** এবং সংস্কারের অনুবাদ হয়েছে **mental aggregate** বা **Coefficient**। মানুষের পাচ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্জগতের যে সতত সংযোগ, তাতেই বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই এই সংযোগ বাদ দিলে বহির্জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। সংযোগ নিত্য নয়, প্রতিমুহূর্তে সেই সংযোগেরও পরিবর্তন হচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে ইন্দ্রিয়ের এই গ্রহণ করবার ব্যাপারকেই ধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এই ধর্ম·অনিত্য ও বিনাশশীল। প্রথম মুহূর্তে যে-ধর্ম উৎপন্ন হচ্ছে। তার বিনাশ হয়ে পরবর্তী অন্য ধর্মের উৎপত্তি হচ্ছে। নানা মুহূর্তের ধর্মের সমীকরণ করে যে-কল্পলোক সৃষ্ট হচ্ছে তাই হলো সংস্কার। সুতরাং এই নিয়তপরিবর্তনশীল ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহেই বহির্জগতের অস্তিত্ব। অন্য সত্তা তার নেই। তাই বুদ্ধ বললেন—

সবম্ অনিত্যম্ সর্বম্ শূন্যম্
"সমস্তই অনিত্য ও শূন্য অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা।"

উপনিষদের শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধের মতের ঐক্য এই পর্যন্ত—জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এ-সবের অস্তিত্ব বুদ্ধ মানেন নি। জীবাত্মাই যদি না থাকল তবে 'আমি' কোথায়, কে এই মিথ্যা জগতের রচনা করছে?

এই কথাই দু-হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক রাজা **Menander** (মিলিন্দ) বৌদ্ধাচার্য নাগসেনকে·জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মিলিন্দ নাগসেনের নাম জিজ্ঞাসা করতে নাগসেন তার উত্তরে বললেন, লোকে তাকে নাগসেন বলে। বস্তুত সেটা ব্যবহারিক সংজ্ঞা মাত্র, তাতে কোন 'পুদ্গল' বা জীবাত্মা বুঝায় না। তাতে মিলিন্দ বললেন, 'এ-কথা যদি সত্য হয় তাহলে কে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে তার পাত্র চীবর শয়নাসন

ও ভিক্ষা দিচ্ছে—কেউ বা সংঘের নিয়ম প্রতিপালন করে সাধনায় রত হচ্ছে ও নির্বাণলাভ করেছে। এ-কথা সত্য হলে পাপ-পুণ্য থাকে না—পুণ্য কাজও করে না, লোককে পীড়নও কেউ করে না। নাগসেন যখন সংজ্ঞামাত্র তখন সত্যকার নাগসেন কে? লোম, নখ, মাংস প্রভৃতি নাগসেন নয়, রূপ নাগসেন নয়, বেদনা নাগসেন নয়, সংজ্ঞা-বিজ্ঞান-সংস্কার প্রভৃতিও নাগসেন নয়—তাহলে নাগসেন নেই।' তার উত্তরে নাগসেন বললেন, 'মহারাজ, আপনি রথে চড়ে এসেছেন, রথ কি? চক্রকে রথ বলবেন কি? যুপকাষ্ঠকে রথ বলবেন কি? বা দণ্ড রশ্মি প্রতোলী প্রভৃতিকে রথ বলবেন কি? এগুলি যখন রথ নয় তখন রথ নেই—আপনি রথে চড়ে এসেছেন এ-কথা মিথ্যা কথা।

উভয়ে শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, চক্র, দণ্ড, রশ্মি প্রভৃতি অবলম্বন করে যাকে 'রথ' এই ব্যবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাকেই রথ বলা হয়। সেইরূপ লোম-নখ-মাংস প্রভৃতি ও রূপ-বেদনা-সংস্কার-সংজ্ঞা বিজ্ঞান প্রভৃতি অবলম্বন করে নাগসেন এই ব্যবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—ইহা নাম মাত্র। পারমার্থিক হিসাবে দেখলে নাগসেন বলে কোন পুদ্গল বা জীবাত্মা নেই। আছে শুধু নিয়ত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান বা চিৎশক্তির প্রবাহ। এই বিজ্ঞান-সন্তান বা বিজ্ঞান-প্রবাহেই জীবের বৈশিষ্ট্য বা আমিত্ব নিবদ্ধ। এই বৈশিষ্ট্য যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ ধর্ম ও সংস্কারের উৎপত্তি ও লয় অর্থাৎ মিথ্যা জগতের রচনা চলছে, ততক্ষণই দুঃখের অনুভূতি হচ্ছে।

জগতের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্বন্ধে বুদ্ধ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বলেই তিনি প্রথমে তাঁর দুঃখবাদ প্রচার করেন। এই দুঃখবাদকে বৌদ্ধধর্মের ভাষায় আর্যসত্য (চত্বারি আর্যসত্যানি) বলা হয়। এই চারটি সত্য হচ্ছে দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়। এই সত্যই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের মূলসূত্র। সাধনায় বুদ্ধ যে-জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করলেন তাতে তিনি দেখতে পেলেন যে, জগৎ দুঃখময়, এই দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তির হেতু নির্ধারণ করে সেইসব হেতুকে নষ্ট করবার উপায়ও তাঁকে বের করতে হলো। সত্য কথা বলতে গেলে এই বিশ্লেষণ বুদ্ধের নিজের নয়। এ-হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্রের চিরন্তন প্রথা—যোগশাস্ত্রেও এই প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলসূত্র হচ্ছে রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য। চিকিৎসক রোগ দেখে প্রথমে তাঁর হেতু নির্ধারণ করেন, আরোগ্যের আবশ্যকতা অনুভব করেন ও আরোগ্যের একমাত্র উপায় ভৈষজ্য প্রয়োগ করেন। যোগশাস্ত্রেরও মূলসূত্র হচ্ছে সংসার, সংসার হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। জীব দুঃখবহুল সংসারে পতিত, তার কারণ হচ্ছে

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ, সেই সংযোগের নিবৃত্তিতেই মোক্ষ, মোক্ষের উপায় হচ্ছে সম্যক অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভ করা। বুদ্ধও তাই দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখনিরোধ ও নিরোধোপায় স্থির করাই তাই নূতন ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করলেন। যথা—

'চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহম্—রোগো রোগহেতুরারোগ্যম্ ভেষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রম্ চতুর্ব্যূহমেব, তদ্যথা সংসারঃ সংসারহেতুর্মোক্ষো মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ প্রধান পুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ সাযোগম্যাত্যন্তিক নিবৃত্তির্হানম হানোপায়ঃ সম্যগদর্শনম্।'

তাঁর মতে জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ আট-প্রকারের: জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ প্রিয়-বিপ্রয়োগ, অপ্রিয়-সম্প্রয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ ও পঞ্চ উপাদান বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু। জীবমাত্রেই এই আটপ্রকারের দুঃখে অভিভূত, প্রত্যেকেরই জন্ম ব্যাধি জরা মরণ আছে, প্রত্যেককেই প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ভোগ করতে ও অপ্রিয়জনের সংস্পর্শেও আসতে হয়। নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সব সময় সে পায় না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তুও সব দুঃখজনক।

এই দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তি কোথায়? দুঃখের উৎপত্তি আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধ কতকগুলি কার্য-কারণের পরম্পরা নির্ধারণ করেছেন। তাকে বৌদ্ধ ধর্মের ভাষায় বলা হয় 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'। এর ধাতুগত অর্থ হচ্ছে একের অবলম্বনে অন্যের উৎপত্তি। সেইজন্যে প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুবাদ হয়েছে **Chain of dependent causation**। প্রাচীন বৌদ্ধ-শাস্ত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

অস্মিন্ সতীদং ভবতি, অস্যোৎপাদাৎ ইদমুৎপদ্যতে অর্থাৎ একটি কারণ ঘটলে অন্যটি ঘটে, একের উৎপত্তি হলে অন্যের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধ দুঃখসমুদয়ের কারণ দেখিয়েছেন বারোটি: অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ।

অবিদ্যা হচ্ছে, অন্তরের ও বাইরের অ-জ্ঞান। জগৎ দুঃখময়, সে-দুঃখের কারণ, দুঃখোৎপত্তির কারণকে বন্ধ করার আবশ্যকতা ও তার উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই হচ্ছে অবিদ্যা। কার্যকারণের পারম্পর্য ও বহির্জগতের সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যে-সমস্ত ধর্মের (**formation**) উৎপত্তি হচ্ছে তা না জানাও অবিদ্যা।

এই অবিদ্যার থেকেই সংস্কারের উৎপত্তি হচ্ছে। বহির্জগতের সঙ্গে দেহ বাক্য ও মনের যে প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয় তাতেই সংস্কারের উৎপত্তি। এই

সংস্কারের উৎপত্তির সঙ্গেই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের কার্য আরম্ভ হয় ও বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। যখনই প্রকৃতির সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ও মনের সম্পূর্ণ যোগ স্থাপিত হয় তখনই নামরূপের উৎপত্তি হয়। বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমষ্টিকেই 'নাম', ও চারটি মহাভূত (ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ) ও চতুর্মহাভূতাত্মক বস্তুকেই 'রূপ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই উভয়ের উৎপত্তিতেই পুদ্গল বা ব্যক্তিত্বের উদ্ভব। এই নামরূপ উৎপন্ন হলেই জীবের ষড়ায়তন বা চক্ষু কর্ণ শোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা কায় ও মন প্রভৃতি ষড়েন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক শক্তির বিকাশ হয়। যখন ইন্দ্রিয়গুলির এই আভ্যন্তরিক শক্তির বিকাশ হয় তখনই প্রথম বহির্জগতের সঙ্গে তাদের স্পর্শ বা সংযোগ সাধিত হয়। এই সংস্পর্শেই নানারূপ দুঃখ অ-দুঃখ অর্থাৎ সুখময় বেদনা বা অনুভূতির উৎপত্তি। সেই বেদনা বা অনুভূতিই হলো তৃষ্ণার কারণ। তৃষ্ণা তিন প্রকারের : কামতৃষ্ণা (**Sexsual**), রূপতৃষ্ণা (**formal**) ও অরূপ তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণা থেকেই উপাদান বা গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা আসে। উপাদানই হচ্ছে 'ভব' বা জন্মগ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষার কারণ। এই কারণ ঘটলেই জীব 'জাতি' বা জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করে ও জরামরণ প্রভৃতিতে অভিভূত হয়। সুতরাং জীবের এই দুঃখময় সংসার (**transmigration**) বা আসা-যাওয়ার মূলে রয়েছে এই কার্যকারণের শৃঙ্খল। এইসব কারণের নিরোধ বা নিবৃত্তিতেই সকল দুঃখের অবসান।

দুঃখের এই হেতু নিরোধের উপায় হচ্ছে নির্বাণ। এই নির্বাণই বৌদ্ধ সাধকের প্রধান কাম্য। তাই নির্বাণের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়েই যত তর্ক-বিতর্কের অবতারণা ও নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিতর গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাণের ধাতুগত অর্থ সম্পূর্ণ নিবৃত্তি। নির্বাণের এই অর্থ গ্রহণ করেই অনেকে বৌদ্ধধর্মকে দুঃখবাদ মনে করেছেন। সংসার যখন দুঃখময়, ইহজগতে বা পরজগতে যখন এমন কিছুই নেই যাকে অবলম্বন করে মানুষ চিরস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করতে পারে তখন এই দুঃখময় সংসার থেকে অব্যাহতি লাভ করবার একমাত্র উপায় দেহের বিনাশ বা নির্বাপণ। কিন্তু নির্বাণ যে তা নয় সে-কথা সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। নির্বাণ দেহের বিনাশে নয়, প্রবৃত্তির বিনাশে। তাই ধর্মপদে বুদ্ধ বলেছেন—

'সারথি যেরূপ অশ্বকে দমন করে সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়কে শান্ত করেছেন, যিনি নিরভিমান ও কলুষহীন, দেবতারাও তাকে ঈর্ষ্যা করেন।'

'যিনি সম্যক্ ব্রতধারী, শত্রুমিত্রে ও শুভাশুভে সমভাবাপন্ন, অনুরাগ ও

বিরাগশূন্য তিনি পঙ্কহীন হ্রদের মতো নির্মল ও শান্ত। তার সংসার বা আসা-যাওয়া নেই।'

এই সমভাব ও শান্তির অবস্থাই হচ্ছে নির্বাণ। এ-অবস্থা আনন্দের, নিরানন্দের নয়, তাই ধর্মপদে নিবৃত বুদ্ধ বলেছেন—

সুসুখং বত জীবান বেরিনেসু অবেরিনো।
বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো॥
সুসুখং বত জীবান আতুরেসু অনাতুরা।
আতুরেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনাতুরা॥
সুসুখং বত জীবান উস্সুকেসু অনুস্সুকা।
উস্সুকেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনুস্সুকা॥
সসুখং বত জীবান যেসং নো নত্থি কিঞ্চন।
পীতিভক্খা ভবিস্সাম দেবা আভস্সরা যথা

'বৈরিগণের মধ্যে আমরা বৈরহীন হয়ে সুখে জীবনযাপন করব, বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বেষশূন্য হয়ে বিচরণ করব। আতুরগণের মধ্যে আমরা ক্লেশরহিত হয়ে সুখে জীবনযাপন ও বিচরণ করব। আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হয়ে সুখে জীবনযাপন ও বিচরণ করব। আমাদের মধ্যে যাদের কোন আসক্তি নেই তারা ভাস্বর দেবগণের ন্যায় প্রীতি-ভিক্ষা বা আনন্দভাজ হয়ে সুখে জীবনযাপন করবে।

সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স সন্তচিত্তস্স ভিক্খুনো।
অমানুসী রতী হোতি সম্মাধম্মং বিপস্সতো॥

'যিনি শূন্যাগারে প্রবিষ্ট বা আসক্তিশূন্য হয়েছেন, যিনি শান্তচিত্ত ও ধর্মের প্রকৃত রূপ দেখতে পেয়েছেন সেই ভিক্ষু অমানুষী রতি বা দিব্য আনন্দ লাভ করে থাকেন।'

নির্বাণ যে আনন্দময় সে-সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। দু-হাজার বৎসর পূর্বে রাজা মিলিন্দও এই সন্দেহ করেছিলেন। রাজা মিলিন্দ ছিলেন গ্রীক, তার মনও সম্পূর্ণ গ্রীসীয় মন। তাই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনকে বললেন, 'নাগসেন, আপনি যে বললেন নির্বাণ সর্বতোভাবে সুখময় তা আমার মনে হয় না। নির্বাণ নিশ্চয়ই দুঃখমিশ্রিত। তার কারণ আপনিই বলেছেন যে যাঁরা নির্বাণলাভ করেন তাঁরা দেহ ও চিত্ত ক্লেশময় উপলব্ধি করেন, বাসস্থান শয়ন আহার প্রভৃতি বর্জন করেন, আয়তন বা ষড়েন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক শক্তির বিনাশ

করেন এবং ধনধান্য ও প্রিয়তম জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করেন। তাই যদি নির্বাণের অবস্থা হয়, তাহলে আর নির্বাণে আনন্দ কোথায়। জগতে সুখই যাঁদের কাম্য ও যাঁরা সত্যই সুখী তাঁরা আয়তনকে অবলম্বন করেই সুখভোগ করেন।

রূপময় সৌন্দর্যকে চক্ষুদ্বারা শব্দময়, গীতিবাদ্যকে শ্রবণের দ্বারা, ফুল ফল প্রভৃতি গন্ধময় দ্রব্যকে ঘ্রাণের দ্বারা, খাদ্য ভোজ্য প্রভৃতি লেহনপেয় সুমধুর দ্রব্যকে স্পর্শের দ্বারা ও শুভাশুভ বিতর্ক মনসিকারের দ্বারা উপভোগ করেন। আর আপনারা চক্ষু শ্রবণ ঘ্রাণ জিহ্বা কায় ও মন প্রভৃতিকে হনন করে, ছেদন করে ও রোধ করে সুখ ভোগ করতে চান—এতে দেহ ও চিত্তই শুধু পীড়িত হয়, আনন্দলাভ হয় না। তাই আপনাদের নির্বাণ যে দুঃখমিশ্রিত তাতে আর সন্দেহ কি?'

এর উত্তরে নাগসেন বললেন, 'এ-কথা ঠিক নয়, মহারাজ, নির্বাণ সর্বতোভাবেই আনন্দময়। আপনি যাকে নির্বাণ মনে করছেন সে শুধু নির্বাণের পূবভাগ, সেই অবস্থাতেই ভিক্ষু দেহ ও চিত্তকে ক্লেশময় উপলব্ধি করেন, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও আয়তনের বিনাশ সাধন করেন, কিন্তু ঠিক নির্বাণের অবস্থা তা নয়। আপনি যে-রাজ্যসুখ উপভোগ করেন, সে-সুখকে দুঃখমিশ্রিত বলা ভুল হবে! এ-কথা সত্য, আপনাকে প্রত্যন্ত রাজাদের দমন করতে হয়, মন্ত্রী-আমাত্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রবাস যাপন করতে হয়, ও রাজাপালনের জন্য আরও বহুবিধ ক্লেশভোগ করতে হয়, কিন্তু এসব হচ্ছে রাজ্যসুখের পূর্বাংশ মাত্র। এ-সমস্ত কষ্ট ভোগ করবার পর আপনি রাজ্যসুখ উপভোগ করেন। সে-সুখ তখন আর দুঃখমিশ্রিত নয়। নির্বাণের অবস্থাও তেমনি দুঃখমিশ্রিত নয়, সর্বতোভাবে আনন্দময়।

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, ১৩৫৯, মাঘ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নির্বাণ

বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝিতে হয়; এবং সেই সকল কথা বুঝিয়া উঠাও অতি কঠিন। মোটামুটি ধরিতে গেলে নির্বাণ শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়, তেমনি মানুষ নিবিয়া গেল। প্রদীপ নিবিয়া গেলে কিছু থাকে না; মানুষ নিবিয়া গেলেও কিছুই থাকে না। এ-কথাটা, শুনিতে যত সোজা, ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে তত সোজা নয়। প্রদীপ নিবিয়া গেল, আর কিছুই নাই, একেবারে শেষ হইয়া গেল, কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায়? একেবারে 'নিহিল' হইয়া যায়? একেবারে 'এনিহিলেসন' হইয়া যায়? একেবারে 'নাস্তি' হইয়া যায়? এইখানেই গোল বাধিল। আমি একেবারে থাকিব না, এবং সেইটিই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে? আমি তপ জপ, ধ্যান ধারণা করিব, শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি বিলোপ করিবার জন্য? এ ত বড শক্ত কথা।

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন। এইজন্য অনেক পাদরী সাহেবরা বলেন বৌদ্ধেরা নিহিলবাদী বা বিনাশবাদী। বুদ্ধ নিজে কি বলিয়াছেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নির্বাণের পাঁচ শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার বক্তৃতার যেরূপ রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহাও, আবার তিনি ঠিক যেভাষায় বলিয়াছিলেন, সে-ভাষায় কিছুই পাওয়া যায় না। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল, সেই রিপোর্ট মাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও ঐরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার সহিতই নির্বাণের তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নির্বাণের পর কি থাকে। সুতরাং নির্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহার শিষ্যরা সেটা ভাবিতেও যেন ভয় পাইত। বুদ্ধদেব সেকথার কি জবাব দিলেন, আমরা পরে তাহা বিবেচনা করিব।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্ততঃ পাঁচ-ছয় শত বৎসর পর, কণিষ্ক রাজার গুরু অশ্বঘোষ সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিবার জন্য একখানি কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যেমন তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কবিরাজেরা মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়ায়, সেইরূপ আমি এই কঠিন বৌদ্ধধর্মের মতগুলি কাব্যের আকারে লিখিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছি।

তিনি নির্বাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার রিপোর্ট নহে, তাঁহার নিজেরই কথা। তিনি বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান প্রচারক, প্রধান গুরু এবং

প্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁহার কথা আমাদের মন দিয়া শুনা উচিত। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
এবং কৃতী নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম।
দিশং ন কাঞ্চিদ্বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

"প্রদীপ যেমন নির্বাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও যায় না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যায় না, তৈলেরও শেষ, প্রদীপটিরও শেষ; সাধকও তেমনিভাবে, নির্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান না, আকাশেও যান না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যান না। তাঁহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহারও সব ফুরাইয়া গেল, সব শান্ত হইল।"

এখানে কথা হইতেছে "উপৈতি শান্তিম্"—সব শেষ হইয়া গেল—ইহার অর্থ কি নিহিল? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? অশ্বঘোষও নির্বাণের পর আর কিছু থাকিল কি না, কিছুই বলিলেন না।

তিনি নির্বাণশব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে নির্বাণের পর আর কোনরূপ পরিবর্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না।

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে নির্বাণের পর কি থাকিবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কি উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক্। "নির্বাণের পর কিছু থাকিবে কি? বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "থাকিবে না কি?" উত্তর হইল "না"। "থাকা না থাকার মাঝামাঝি কোন অবস্থা হইবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "কিছু থাকা না থাকা এ-দুয়েরই বাহিরে কোন বিশেষ অবস্থা হইবে কি?" আবার উত্তর হইল "না"।

তবে দাঁড়াইল কি? এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে-অবস্থায় "অস্তি"ও বলিতে পারি না, "নাস্তি"ও বলিতে পারি না। এ-দুয়ে জড়াইয়া কোন অবস্থা নয়, এ-দুয়ের অতিরিক্ত কোন অবস্থাও নয়। ইহাতে পাওয়া গেল কোন অনির্বচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে।

এই অবস্থাকেই মহাযানে "শূন্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। "শূন্য" বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাই বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বলেন আমরা করি কি? আমরা যে-ভাষায় শব্দ পাই না। নির্বাণের পর যে-অবস্থা হয়, তাহা যে বাক্যের অতীত। ঠিক কথাটি পাই না বলিয়াই আমরা উহাকে "শূন্য" বলি। কিন্তু"শূন্য" শব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা অস্তিনাস্তি প্রভৃতি চারিপ্রকার অবস্থার অতীত। 'অস্তিনাস্তিতদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্'।

শঙ্করাচার্য তাঁহার তর্কবাদে শূন্যবাদীদের নানারকমে ঠাট্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যাহাদের মতে সবই শূন্য, তাহাদের সঙ্গে আর বিচার কি করিব?" তিনি বৌদ্ধদের "বিনাশবাদী" বলেন। তাঁহার মতে নৈয়ায়িকেরা "অর্দ্ধবিনশন" অর্থাৎ আধখানা বিনাশবাদী। কেন-না নৈয়ায়িকেরাও বলেন, "অত্যন্ত সুখ-দুঃখ নিবৃত্তি"র নামই "অপবর্গ"। সুখ-দুঃখ যদি একেবারেই না রহিল, তবে আত্মা ত পাথর হইয়া গেল।

সাধারণ লোকে বলিবে পাথর হওয়াও বরং ভাল। কেন-না, কিছু আছে দেখিতে পাইব। শূন্য হইলে ত কিছুই থাকিবে না।

যাহা হোউক অশ্বঘোষ যে নির্বাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষার পুস্তকে উহার যে-অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে নির্বাণ একটি অনির্বচনীয় অবস্থা। স্থধু বাক্যের অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কাণ্ট 'ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল' বলিয়া গিয়াছেন? কেন-না ইহা মানুষের বুদ্ধি ছাড়াইয়া যায়, মানুষে ইহা ধারণা করিতে পারে না।

এরূপ অবস্থাকে অনির্বচনীয় না বলিয়া, অশ্বঘোষের মতে যে চরম ও অচ্যুত পদ আছে, তাহাকে অস্তি বলিয়া স্বীকার কর না কেন? কিন্তু বলিলে একটা বিষম দোষ হয়। যতক্ষণ আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ "অহং" এই বুদ্ধিটি থাকিবে। অহংজ্ঞান থাকিলেই অহঙ্কার হইল। অহঙ্কার থাকিলেই সকল অনর্থের যা মুল তা রহিয়া গেল। সুতরাং সে যে আবার জন্মিবে তাহার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। আরো কথা, আত্মা যখন রহিলই, তখন তাহার ত গুণাগুণও রহিল। অগ্নি কিছু রূপ ও উষ্ণতা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আত্মা থাকিলে তাহার একত্ব-সংখ্যা থাকিবে। একত্ব-সংখ্যাও ত একটি গুণ। সে-আত্মার জ্ঞান থাকিবে? না, থাকিবে না? যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থও থাকিবে, জ্ঞেয় পদার্থ থাকিলেও আত্মার মুক্তি হইল না। আর, আত্মার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে-আত্মা আত্মাই নয়। সেইজন্যই অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বুদ্ধদেব বলিতেছেন,

"আত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মুক্তি হইবে না।" তাঁহার প্রথম গুরু অরাঢ় কালামের সহিত বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে উহারা বলে আত্মা দেহ-নির্মুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ দেহ-নির্মুক্ত হইলেই মুক্ত হয়, তখন সে-মুক্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আত্মাতে "চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত" তবে তৃপ্ত হইলেন।

তাঁহার শিষ্যেরা, আত্মাকে শূন্যরূপ, অনির্বচনীয়রূপ, চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তরূপ, মনে করিলেও ক্রমে তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার নির্বাণকে অভাব বলিয়া মনে করিতেন; তাহাদের মতে সংসার হইল ভাব পদার্থ এবং নির্বাণ অভাব। ভাবাভাব বলিতে তাহারা ভব ও নির্বাণ বুঝিতেন। তাহারও পরে আবার যখন তাহারা দেখিলেন যে প্রকৃতপক্ষে ভব বা সংসার সেও বাস্তবিক নাই, আমরা ব্যবহারতঃ তাহাদিগকে "অস্তি' বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবিক সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধর্ম অতি সহজ হইয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল—

অপণে রচিরচি ভব নির্ব্বাণা।
মিছা লোক বন্ধাবএ অপণা॥

অর্থাৎ ভবও শূন্যরূপ, নির্বাণও শূন্যরূপ। ভব ও নির্বাণে কিছুই ভেদ নাই। মানুষে আপন মনে ভব রচনা করে, নির্বাণও রচনা করে। এইরূপে তাহারা আপনাদের বদ্ধ করে। কিন্তু পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয়। সবই শূন্যময়।

তাহা হইলে ত বেশ হইল। ভবও শূন্য, ভাবও শূন্য, আত্মাও শূন্য সুতরাং আত্মা সর্বদাই মুক্ত, স্বভাবতই মুক্ত, "শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ।' তবে আর ধর্মেই কাজ কি? যোগেই কাজ কি? কঠোরেই বা কাজ কি? ধ্যানেই বা কাজ কি? সমাধিতেই বা কাজ কি? ধর্ম-অধর্মেই বা কাজ কি? যার যা খুসি কর। তোমরা স্বভাবতই মুক্ত, কিছুতেই তোমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। পরম যোগীও যেমন মুক্ত, অতি পাপিষ্ঠও তেমনই মুক্ত।

এই জায়গায় সহজিয়া বৌদ্ধ বলিল যে মূঢ় লোক ও পণ্ডিত লোকের মধ্যে একটি ভেদ আছে। সকলেই স্বভাবত মুক্ত বটে, কিন্তু মূঢ় লোকে পঞ্চ কামোপভোগাদি দ্বারা আপনাদের বদ্ধ করিয়া ফেলে, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহার পর পঞ্চকামোপভোগ করিলে, কিছুতেই বদ্ধ হয় না।

"যেনৈব বধ্যতে বালো বুধস্তেনৈব মুচ্যতে।" যে পঞ্চ কামোপভোগাদি দ্বারা বালজাতীয় অর্থাৎ মূর্খ লোকে বদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহাতেই মুক্ত হয়।

আর এক উপায়ে নির্বাণ ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের

তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হয় তখন তাহাকে বোধিচিত্ত বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সৎপথে বা ধর্মপথে বা সদ্ধর্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে যেমন তাহার পুনঃপুনঃ জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হইতে অধিক উচ্চ উচ্চ লোকে উঠিতে লাগিল। যদি তাহার উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তবে সে এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। কাহারো-কাহারও মতে সে এই জন্মেই বোধিলাভ করিতে পারে। বৌদ্ধদের বিহারে যে-সকল স্তূপ দেখা যায়, সেই স্তূপগুলিতে এই উন্নতির পথ মানুষের চোখের উপর ধরিয়া দিয়াছে।

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধিচিত্ত আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। এবার তিনি রূপলোক ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন, রূপলোক ছাড়াইয়া অরূপ লোকে উঠিয়াছেন। তখন তিনি আপনাকে সমস্ত বস্তু, এমনকি নিরেট জিনিষটি পর্য্যন্ত তিনি আকাশ মাত্র দেখেন, অর্থাৎ সকলই তাঁহার নিকট অনন্ত ও উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর আত্মচিন্তা করিতে-করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় যে কিছুই কিছু নয়। এই যে অনন্ত দেখিতেছি, ইহা কিছুই নয়। ইহারও উপর বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলে তখন তাহার চিন্তা হইল এই যে কিছুই নয়, ইহার কোন সংজ্ঞা আছে কি-না। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞীও আছে। কিন্তু সংজ্ঞা ত নাই, সে ত অকিঞ্চন। সুতরাং সংজ্ঞাও নাই সংজ্ঞীও নাই। তাঁহার চারি দিকে অনন্ত শূন্য, আর তাঁহার উঠিবার জায়গা নাই। তিনি সেইখান হইতে অনন্তশূন্যে ঝাঁপ দিলেন। যেমন নুনের কণা জলে মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না সেইরূপ বোধিচিত্তও আপনাকে হারাইয়া অনন্ত শূন্যে মিশিয়া গেলেন। যেমন সমুদ্রের জলে একটু লোনা আস্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্ত শূন্যে বুদ্ধের একটু প্রভাব রহিয়া গেল। তাহার প্রণীত ধর্ম ও বিনয় অনন্ত কালের জন্য ত্রৈধাতুক লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নির্বাণ বলিতে 'নাই' 'নাই'ই বুঝায়। প্রথম-প্রথম বৌদ্ধেরা এই 'নাই' 'নাই' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। নির্বাণ হইয়া গেলে, একটা অনির্বচনীয় অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই বৌদ্ধেরা প্রথম-প্রথম সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল শূন্য হওয়াই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উহার সঙ্গে আর একটা জিনিস আনিয়া ফেলিলেন, উহার নাম 'করুণা'। ইহা যেমন-তেমন করুণা নয়, সর্ব জীবে করুণা, সর্বভূতে করুণা। রূপ ধাতু ত্যাগ করিয়া অরূপধাতুতে আসিয়া যেমন সকল পদার্থকেই আকাশের ন্যায় অনন্ত দেখিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ করুণাকেও অনন্ত দেখিতে লাগিলেন। শুদ্ধ 'শূন্যতা' লইয়া যে নির্বাণ, প্রাণশূন্য,

নিশ্চল, নিস্পন্দ, কতকটা পাথরের মতো, কতকটা শুকনা কাঠের মতো, হইয়াছিল, করুণার স্পর্শে তাহাতে যেন জীবন সঞ্চার হইল, নির্জীবে জীবন আসিল, উদ্দেশ্য শূন্যে উদ্দেশ্য আসিল, সত্য সত্যই শুষ্কতরু যেন মুঞ্জরিয়া উঠিল। যাঁহারা তহ্ৎ হওয়াই, অর্থাৎ কোনরূপে আপনাদের মুক্ত করাই, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া ছিলেন, সমস্ত জগৎ যাহাদের চক্ষে থাকিলেও হইত, না থাকিলেও হইত। জগতের পক্ষে যাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধরা এখন হইতে আপনার উদ্ধারটা আর তত বড় বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, জগৎ উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। আমার আমিত্বটুকু লোপ করিব, আমি মুক্ত হইব, আর আমার চারিদিকে কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি জীব বদ্ধ থাকিবে, একি আমার সহ্য হয়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সংসারের সকল গণ্ডী পার হইয়া ধ্যান-ধারণাদি বোধিসত্ত্বের যা কিছু কাজ, সব সাঙ্গ করিয়া, এমনকি ধর্মস্তূপের আগায় উঠিয়া শূন্যতা ও করুণা সাগরে ঝাঁপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারি দিকে কোলাহল শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার আমিত্ব চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার আয়তন আকাশের মতো অনন্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণাও আকাশের মতো অনন্ত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব দুঃখে আর্তনাদ করিতেছে; জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিসের কোলাহল'। তাহারা উত্তর করিল 'আপনি করুণার অবতার আপনি যদি নির্বাণ লাভ করেন তবে আমাদের কে উদ্ধার করিবে?' তখন অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যতক্ষণ জগতের একটি মাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্বাণ লইব না।'

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতে বৌদ্ধরা এই মত লইয়াই চলিত। ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বলিত। তাহারা মনে করিত এত বড় মত আর হইতে পারে না। যখন বোধিসত্ত্বেরা করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন তাহারা জীবের উদ্ধারের জন্য পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বুদ্ধদেব যে পঞ্চশীল দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্যদেব 'চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণে' বলিয়া গিয়াছেন 'যে জগৎ উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, তাহার যদি কোন দোষ হয়, সে দোষ একেবারে ধর্তব্যই নয়'।

এই বৌদ্ধ ধর্মের চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন যেমন গভীর, ধর্মমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর কোন ধর্মে দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করিয়া এই মতের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষে তখন বড় বড় রাজ্য ছিল, নানা রূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার ছিল, বিস্তার যথেষ্ট

আদর ছিল। তাই এত লোকে এত শত বৎসর ধরিয়া একই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

চাণক্য-শ্লোকে বলে 'ধন উপায় করা বড় সহজ, কিন্তু ধন রাখা বড় কঠিন।' জ্ঞানেরও তাই, জ্ঞান উপার্জন সহজ, কিন্তু জ্ঞানটি রক্ষা করা বড় কঠিন। মহাযানের'ও এই জ্ঞান বেশি দিন রক্ষা হয় নাই। দেশ ক্রমে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে-সঙ্গে বাণিজ্য লোপ হইয়া আসিল, লোকেও দেখিল যে বহুকাল চিন্তা করিয়া বহুকাল যোগ সাধন করিয়া মহাযান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, সুতরাং একটা সহজ মত বাহির করিতে হইবে। বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা রাজার দত্ত বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া যজমান দিগের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের আর চিন্তা করিবার সময়ও রহিল না।

কিন্তু নির্বাণের কথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক বাহিরের কথা বলিয়া ফেলিলাম। বোধহয় এগুলি না বলিলেই হইত না। মহাযানের নির্বাণ 'শূন্যতা' ও করুণায় মিশামিশি এ-নির্বাণের এক দিকে 'করুণা' আর একদিকে 'শূন্যতা', করুণা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু যে-সকল যজমানের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেশি নির্ভর করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে শূন্যতা বুঝান বড়ই কঠিন। তাঁহারা শূন্যতার বদলে আর একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন—সেটি "নিরাত্মা।" নিরাত্মা শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধা যায় না, কিন্তু এ-সময় বৌদ্ধেরা সংস্কৃত গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যজমামদিগকে বুঝাইলেন যে বোধিসত্ত্ব যখন স্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাঁহারা চারিদিকে অনন্ত শূন্য দেখিতেছেন। এই শূন্যকে তাঁহারা বলিলেন 'নিরাত্মা', শুধু নিরাত্মা বলিয়াই তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন "নিরাত্মাদেবী" অর্থাৎ নিরাত্মা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বোধিসত্ত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সে-কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল ; কেন-না সেটা বুঝিতে কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না। এখন নির্বাণের অর্থ কি দাঁড়াইল, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর ঠিক ঐ সময়ই যজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের মন কত নরম হয়, কত করুণায় অভিভূত হয়। সে কথাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইল না। সুতরাং নির্বাণ যে শূন্যতা ও করুণার মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল। এ-নির্বাণেও সেই অনির্বচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত।

'বৌদ্ধধর্ম' থেকে সঙ্কলিত

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংস

এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল! চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্যাম, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, সিংহল, ব্রহ্মা, তিব্বত, নেপাল, বক্‌ত্রিয়া, ইত্যাদি সমগ্র দেশেই বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্মমত মহাসমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল। যে কাবুল, কান্দাহার, তুর্কিস্থান প্রভৃতি জনপদে অধুনা মুসলমান ধর্মের প্রবল প্রতাপ পরিলক্ষিত হয় ঐ সকল জনপদই এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লীলাভূমি ছিল। মধ্য-এশিয়ার সুদূর বিস্তীর্ণ ভূভাগ ইদানীং জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এক সময়ে সাহারা ও গোবি মরুভূমির সন্নিহিত প্রদেশই বৌদ্ধ প্রচারকগণের গতায়াতের প্রধান স্থান ছিল। আজ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন মাত্রও নাই, কিন্তু এক সময়ে হিমালয় পর্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশেই অহিংসা ধর্ম বিরাজিত ছিল।

ভারতীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধ্বংসের প্রধানত তিনটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমত মুসলমান বিজেতৃগণের অত্যাচার; দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের অত্যুদারতা ও অনুদারতা, এবং তৃতীয়ত তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ভীষণ দুরাচার।

(১) মুসলমান বিজেতৃগণের অত্যাচার

কেহ-কেহ অনুমান করেন মুসলমান ধর্মের আবির্ভাবই ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের একমাত্র কারণ। পূর্বে কাবুল ও কান্দাহার যথাক্রমে উদ্যান্ ও গান্ধার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই উভয় স্থানেই বৌদ্ধগণ বহু সংখ্যক বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। গান্ধারের তক্ষশীলা নামক স্থানে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল উহার গৌরব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও বিলুপ্ত হয় নাই। চীন-দেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হুয়েন্ সাঙ যথাক্রমে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত পর্যটন করিতে আসিয়া উদ্যান ও গান্ধারে অসংখ্য বৌদ্ধ-বিহার অবলোকন করিয়া ছিলেন! কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর হইতেই উক্ত দুই স্থানে মুসলমান ধর্মের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মহম্মদ কাশিম ভারত আক্রমণ করেন। তাহার পর হইতেই উদ্যান ও গান্ধার মহম্মদীয় মসজিদ দ্বারা সমাকীর্ণ হয়। তত্রত্য প্রাচীন বৌদ্ধ-বিহার-সমূহ কিরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ অবগত হওয়া যায় নাই। অধুনা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অনেক বৌদ্ধ কীর্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহম্মদ অব গরাণী সপ্তদশবার ভারত আক্রমণ করিয়া অনেক বৌদ্ধ-মন্দিরের বিলোপ সাধন করেন। তিব্বতীয় গ্রন্থে লিখিত আছে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি বিক্রমশিলা প্রভৃতি বৌদ্ধ-বিহার-সমূহের বিনাশ সাধন করেন।

বিক্রমশিলা গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল। তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থপণেতা স্বপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধতার্কিক কমলশীল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বিক্রমশিল বিহারের ধর্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। নয়পালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর অন্তিম সময়ে গৌড় দেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরে স্ববিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশের জন্ম হয়।

নয়পালের অনুরোধক্রমে তিনি কয়েক বৎসর বিক্রমশিলার ধর্মাধ্যক্ষতার কার্য করিয়াছিলেন। বিক্রমশিলা যোগাচার বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি এই বিক্রমশিলা বিহারের ধ্বংস বিধান করিয়া যোগাচার বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নিঃশেষ বিলোপ বিধান করিয়াছিলেন। ওদনন্তপুরী বিহারও এই সময়ে বিনষ্ট হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে নালন্দা বিহার ভস্মীভূত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলাউদ্দিন অনেক বৌদ্ধ কীর্তির বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন।

মুসলমান বিজেতৃগণ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিহার, চৈত্য ইত্যাদির ধ্বংস সাধন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। কথিত আছে তাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে বলপূর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতও করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আজ যে লক্ষ-লক্ষ মুসলমান দৃষ্ট হইতেছে উহাদের সকলেরই পূর্বপুরুষগণ কিছু আরব দেশ হইতে আগমন করে নাই, এবং প্রাচীনকালে এতদ্দেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোক বাস করিত তাহাদের বংশধরগণ সকলেই কিছু ভারতভূমি পরিত্যাগ করে নাই; প্রকৃত কথা এই ধর্ম-বিপ্লবের সময়ে নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধগণ মুসলমান ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিজেতৃগণের মনস্তুষ্টি করিয়াছিল।

(২) ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের অত্যুদারতা ও অনুদারতা

আবার কাহারও কাহারও ধারণা এই যে ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধ্বংসের মূলীভূত কারণ। তাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করেন নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের

পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ লিপিবদ্ধ হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ন্যায়বার্ত্তিকপ্রণেতা উদ্যোতকরাচার্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিঙ্‌নাগাদি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে আক্রমণ করেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কুমারিলভট্ট দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধধর্মের নিরাকরণ ও বৈদিকধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মীমাংসাবার্ত্তিকগ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় তিনি কিরূপ অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করেন।

তিনি বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থসমূহকে অশাস্ত্র বলিয়া অবধারণ করেন। মাধবাচার্যকৃত সংক্ষেপশঙ্করজয় গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে কুমার (কার্ত্তিকেয়) যেরূপ অসুরকুল নির্মূল করিয়াছিলেন সেইরূপ বৈদিক কর্ম-পরাঙ্মুখ বৌদ্ধগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত" তিনিই আবার কুমারিল ভট্ট রূপে অবতীর্ণ হন। বৌদ্ধগণ জগৎ আক্রমণ করিলে বৈদিকধর্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। বেদমার্গের রক্ষা ও বৌদ্ধগণের পরাজয় সাধন করিবার নিমিত্ত যে-সকল পণ্ডিত অগ্রসর হন তন্মধ্যে কুমারিলভট্ট সর্বপ্রথম। বৌদ্ধগণ তদানীন্তন নৃপতি সমূহকে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! আপনারা আমাদের শাস্ত্র গ্রহণ করুণ বৈদিকমার্গের আশ্রয় লইবেন না।" কুমারিলভট্ট প্রথমত বৌদ্ধশাস্ত্র জানিতেন না, সুতরাং বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি বৌদ্ধদিগের পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে তিনি বৌদ্ধগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য দক্ষিণাপথে অবতীর্ণ হইয়া অসাধারণ কৌশলের বলে বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করেন। তিনি স্বীয় বেদান্তভাষ্যের ১।২।৩২ স্থলে লিখিয়াছেন একমাত্র বুদ্ধদেব বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অথচ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহ্যার্থবাদ ও শূন্যবাদ এই তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধ মত দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই অসংবদ্ধ প্রলাপী ছিলেন অথবা মানব-জাতির প্রতি তাঁহার ঘোর বিদ্বেষ ছিল। মনুষ্যদিগকে বিমূঢ় করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতের উদ্ভাবন করেন।

শঙ্করাচার্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি মঠ সংস্থাপন করিয়া বৈদিক ও স্মার্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুন্নতি বিধান করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আনন্দ গিরির স্বীয় বেদান্তটীকার ২।২।৩ স্থলে লিখিয়াছেন ইতিহাস-পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ংই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে শঙ্কর কেন

তাঁহাকে অসংবদ্ধ প্রলাপী বলিলেন? বস্তুত বুদ্ধ অসংবদ্ধ প্রলাপী ছিলেন না। যে-সকল লোক বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করে তাহারা পশু। সেই পশুদিগের প্রতি বিদ্বেষ বলতে এবং তাহাদিগকে বিমূঢ় করিবার জন্য ভগবান্ বাসুদেব বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি করেন। এইরূপ অর্থ প্রকাশ করাই শঙ্করের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্রন্যায় কর্ত্তিক তাৎপর্যটীকার ২।১।৬৮ স্থলে লিখিয়াছেন সর্বজ্ঞ জগৎকর্তা পরমেশ্বর কর্তৃক বেদ বিরচিত হইয়াছে এবং মনু প্রভৃতি ঋষিগণ উহার মত অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং বেদকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। বৌদ্ধগণ স্বয়ংই বলিয়া থাকেন তাঁহাদের শাস্ত্র বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত, বুদ্ধ কিছু সর্বজ্ঞ ছিলেন না এবং তিনি পৃথিবীর কর্তাও নহেন। কতকগুলি পশুপ্রায় লোক তাঁহাদের শাস্ত্রের মত গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধ শাস্ত্রকে কোনপ্রকারেই আপ্তবাক্য বলিতে পারা যায় না।

দ্বাদশ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য মিথিলা প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া ন্যায় কর্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকা—পরিশুদ্ধি, কুসুমাঞ্জলি ও আত্মতত্ত্ববিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আত্মতত্ত্ববিবেকের অপর নাম বৌদ্ধাধিকার। কেহ-কেহ ইহাকে বৌদ্ধধিক্কারও বলিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে উদয়ন সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জরন্নৈয়ায়িক এই উপনামধারী জয়ন্তস্বামী* স্বীয় ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :—

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন কোন নিত্য আত্মা নাই অথচ তাঁহারা মরণানন্তর স্বর্গ লাভ হইবে, এই আশা করিয়া চৈত্য পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক অথচ যুগান্তস্থায়ী বিহার-সমূহ নির্মাণ করেন। তাঁহারা বলেন সমস্তই শূন্য অথচ গুরুকে ধন দান করিবার উপদেশ প্রদান করেন। বৌদ্ধগণের চরিত্রের বিষয় আর কি বলিব, তাহারা কেবল দম্ভের আধার। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে আর একজন দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রামানুজ। তিনি বেদান্তসূত্রের যে-ভাষ্য প্রণয়ন করেন উহার নাম শ্রীভার্ষ্য রামানুজই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। রামানুজ বৈষ্ণব ধর্মের সৃষ্টি করিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই সময় হইতে ভূরি ভূরি বৌদ্ধ স্বধর্ম ত্যাগ করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে মাধবাচার্য নামে একজন দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়া বেদান্ত সূত্রের অপর একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। মাধবাচার্যও একটি

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রচার খর্ব করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহ, জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তর, কাল নির্ণয়, পরাশর স্মৃতি ব্যাখ্যা ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য মহীশূরে যে শৃঙ্গেরি মঠ সংস্থাপিত করেন, চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য সেই মঠের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি স্মার্ত ও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া বৌদ্ধগণকে সম্পূর্ণ নির্মূল করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদান্তের অনু ভাষ্য প্রণেতা বল্লভাচার্য চম্পারণ্যে অর্থাৎ বর্তমান ভাগলপুর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বারাণসীতে অবস্থান করেন। তিনিও একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। তিনি বেদান্ত সূত্রের ২।২।২৬ ব্যাখ্যার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন:—"অভাব পদার্থ হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয়, এই মত খণ্ডন করিয়া ভগবান ব্যাস বেদ সমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপন করেন।"

ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ বৌদ্ধমতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই তাঁহারা অত্যুদারতা প্রকাশ পূর্বক বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিনকেই সুসংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। পৌরাণিকগণ বুদ্ধকে ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার মধ্যে পরিগণিত করেন। শঙ্করাচার্য বুদ্ধের মায়াবাদকে অদ্বৈতবাদ নাম দিয়া সর্বত্র প্রচারিত করেন। বুদ্ধের প্রবর্তিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের অনুকরণে রামানুজ মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বৈরাগী ও বৈরাগিণী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।

যখন বুদ্ধদেব বিষ্ণু হইলেন, শূন্যবাদ ব্রহ্মবাদে পরিণত হইল এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ স্বীয় উপাধি ত্যাগ করিলেন, তখন বৌদ্ধ ধর্মের কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। ক্রমে বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব ও শৈব হইলেন।

ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়া বৌদ্ধধর্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবার উপায় আরও সহজ করিলেন। বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পুনরাগমন[৮] করিতে লাগিলেন। সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম কালক্রমে তান্ত্রিক ধর্মে পরিণত হইল, এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ পরিশেষে হিন্দু হইলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এতদুভয়ের সমবায়ে বর্তমান হিন্দুধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুগণ বৌদ্ধ ধর্মের সারমর্ম স্বীয় ধর্মে গ্রহণ করিয়া যে অত্যুদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে ভারত হইতে "বৌদ্ধ" এই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে।

(৩) তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের দুরাচার

আমাদের বোধহয় তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ভীষণ দুরাচারই তাঁহাদের ধ্বংসের একমাত্র কারণ। সার্দ্ধ দ্বি-সহস্রবর্ষ পূর্বে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর অনেক ধর্মের উত্থান ও পতন হইয়াছে এবং মানব-জাতির জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী ধর্মের সৃষ্টি হয় নাই। এই বিংশ শতাব্দীতে যদি কেহ পৃথিবীর সমগ্র সভ্য জনপদ হইতে প্রতিনিধি আহ্বান পূর্বক একটি ধর্মমহা-মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়া সমস্ত মানব-সমাজের নিমিত্ত কোন আদর্শ ধর্মের উদ্ভাবন করেন তাহা হইলে উহাও বোধহয় বৌদ্ধ ধর্মকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বৌদ্ধ দর্শনের জড়বাদ, বিজ্ঞানবাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি মত জগতের বিদ্বন্মণ্ডলীর মস্তক এখনও আলোড়িত করিতেছে, এবং বোধিসত্ত্বগণ বৌদ্ধ দর্শনের উচ্চভাব সমূহ প্রকাশ করিবার জন্য বৌদ্ধ সংস্কৃত নামে এক স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কোন্‌গুলি সৎ কর্ম, কোন্‌গুলি অসৎ কর্ম, এবং দৈনিক জীবনে কোন্ কোন্ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ইত্যাদি বোঝাইবার জন্য তাঁহারা বিনয়-পিটক বিরচন করিয়াছিলেন। কালসহকারে বুদ্ধদেবের ধর্ম বিলুপ্ত হয় এবং তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ উহার স্থান অধিকার করে। এই তান্ত্রিক ব্যাপারসমূহ অতীব ভীষণ। কেহ-কেহ বলেন ঐ ক্রিয়া সমূহের আধ্যাত্মিক অর্থ অতীব উচ্চ। উহাদের আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য যতই মহৎ হউক না কেন, উহাদের বাহ্যভাবসমূহ নিতান্ত নিন্দনীয়। তন্ত্র শাস্ত্রের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল সে রহস্য এপর্যন্ত কেহ উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচলন আছে, কিন্তু কোন্ সম্প্রদায় উহার প্রথম প্রবর্তণ করেন তাহা এপর্যন্ত জানা যায় নাই। বৈদিক ধর্মের সহ তান্ত্রিক ধর্মের যেরূপ প্রভেদ, বৌদ্ধ ধর্মের সহ তান্ত্রিক ধর্মের তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রভেদ দৃষ্ট হয়। পালি ভাষায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নাই। যে দিন তান্ত্রিক মতের উদ্ভব হইয়াছে সেই দিনই প্রকৃত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিলোপ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ অথবা মুসলমান বিজেতৃগণ ইহাদের কেহই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উন্মূলন করেন নাই। যিনি তন্ত্র শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনিই প্রথমত বৌদ্ধ ধর্মের মূলোচ্ছেদ করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে ভারতবর্ষের পার্বত্য অসভ্য জাতি-সমূহ এবং ভারতের বহিঃপ্রদেশস্থিত অশিক্ষিত লোকসকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের

অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যে-ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল উহাই তান্ত্রিক ধর্ম। উহারা দেবতার তুষ্টির নিমিত্ত জীব বধ করিত এবং মদ্য ও মাংস উপহার দিত। রক্ত-বর্ণ, শ্বেতবর্ণ ও শুষ্ক এই ত্রিবিধ মাংসই দেবগণের রুচিজনক। উহাদের মধ্যে বিবাহের প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল না এবং উহারা শুদ্ধি ও অশুদ্ধির প্রভেদ বুঝিত না। সেইজন্য উহারা অনেক বীভৎস ব্যাপারের সংঘটন করিত। বৌদ্ধধর্মের নেতৃগণ অসভ্য লোকসমূহকে স্বীয় ধর্মের অন্তর্ভুক্ত রাখিবার জন্য ঐ সমস্ত ঘৃণিত ব্যবহারের প্রশ্রয় দিতেন। অসভ্য লোকসমূহকে সভ্যতার সোপানে আনয়ন করিবার প্রয়াস অবশ্য প্রশংসনীয়।

কিন্তু তাহাদের পাশব অনুষ্ঠান সমূহকে ধর্মের অঙ্গীভূত করা অত্যন্ত গর্হিত। যাঁহারা ধর্মানুষ্ঠানের ব্যপদেশে মদ্যপান, মাংসভক্ষণ, পাশবাচার ইত্যাদির প্রশ্রয় দেন তাঁহারা আপনাদিগকে ধর্মযাজক বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু যথার্থত তাঁহারা মানব সমাজের মহা শত্রু।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিক ধর্মের প্রথম সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাবের অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব যোগাচার্য ভূমিশাস্ত্র নামে যে-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন উহাই বৌদ্ধতন্ত্র শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ।

আমাদের বোধহয় বৌদ্ধতন্ত্র খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে বিরচিত হয়। অসঙ্গের ভ্রাতার নাম বসুবন্ধু। কুমারজীব নামক পণ্ডিত ৪০১ খৃঃ অব্দে বসুবন্ধুর জীবন-চরিত চীন ভাষায় অনুবাদিত করেন। সুতরাং বসুবন্ধু ও অসঙ্গ উভয়েই খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। এই সকল কারণে আমাদের বোধহয় অন্তত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্র পঞ্জাব প্রদেশে প্রথমত আবির্ভূত হয়। সুপ্রসিদ্ধ চাইনীজ পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ ৬৪৬ খৃঃ অব্দে যোগাচার্য-ভূমিশাস্ত্র গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদিত করেন। অনন্তর তথাগতগুহ্যক প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ সমূহের সৃষ্টি হয়। তদনন্তর বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থ বিরচন করেন। নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান ইত্যাদি প্রদেশে অধুনা যে-সকল পুস্তক আবিষ্কৃত হইতেছে উহার অধিকাংশই তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ; এবং পৃথিবীতে ইদানীং যে-সকল বৌদ্ধ বাস করিতেছেন তাঁহাদের অধিকাংশই তান্ত্রিক।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মের সহিত তান্ত্রিক মতের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। যেদিন তান্ত্রিকগণ বৌদ্ধধর্ম রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন সেইদিন অবধিই প্রকৃত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিলোপ আরম্ভ হইয়াছে। যতদিন ভারতে যথার্থ বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত ছিল ততদিন মহম্মদও জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই এবং

ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণও লেখনী ধারণ করিতে পারেন নাই। তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের দুরাচার যতই ভীষণ হইতে লাগিল "বৌদ্ধ" এই নাম ততই লোকের বিদ্বেষের বিষয় হইয়া পড়িল। পরিশেষে মুসলমানগণ নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধগণকে স্বীয় ধর্মে গ্রহণ করিলেন। অপেক্ষাকৃত উন্নত বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রবেশ করিলেন। আজিও পঞ্জাব, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে কয়েক কয়েক সহস্র বৌদ্ধ বিদ্যমান আছেন কিন্তু মনুষ্য গণনায় বোধহয় তাঁহারা হিন্দুজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩০৮
(সংক্ষেপিত)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস

জৈন সম্প্রদায়

জৈনদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার ব্যবহারের আলোচনা করিলে, ইহাদিগকে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যপথবর্তী বলিয়া বিবেচনা হয়। কিন্তু অনেক জৈন তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে তাঁহাদের ধর্ম বৌদ্ধ আর্যধর্ম অপেক্ষাও প্রাচীন এবং হিন্দুরা ধর্মসম্বন্ধে অনেক বিষয়ে তাঁহাদের নিকট ঋণী। হিন্দুদের সহিত জৈনদের যে বহুকাল ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড বিবাদ চলিয়াছিল, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন।' তাঁহারা আরও বলেন যে, কালক্রমে সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইলে, উভয় সম্প্রদায়ই উভয়ের নিকট অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া, বর্তমান সামাজিক অবস্থা উপনীত হইয়াছেন।

এই মতে কোনও ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে কিনা, তাহা বলা যায় না। তবে মহাত্মা কর্নেল টডের মত এই যে, জৈন-ধর্ম মধ্য-এশিয়া হইতে আনীত হইয়া ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, জৈনদের ধর্মশাস্ত্র সকল শঙ্কুশীর্ষাকারের একপ্রকার বর্ণমালায় লিখিত। সৌরাষ্ট্র, যশল্মীর এবং রাজস্থানের যে-যে প্রদেশে বৌদ্ধ ও জৈনগণ পূর্বে বাস করিতেন, টড সাহেব সেই সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের ধর্মসংক্রান্ত অনেক শিলালিপি ও তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, জৈনদের মধ্যে চারিজন বুধ (বুদ্ধ বা তীর্থঙ্কর) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠাতা প্রথম বুধ অনুমান খৃঃ পূঃ ২৫৫০ অব্দে, দ্বিতীয় বুধ নেমিনাথ খৃঃ পূঃ ১১২০ অব্দে, তৃতীয় বুধ পার্শ্বনাথ খৃঃ পূঃ ৬৫০ অব্দে, চতুর্থ বুধ মহাবীর (বর্দ্ধমান) খৃঃ পূঃ ৫৩৩ অব্দে অবতীর্ণ হয়েন। জৈনেরা চারিজন বুধ বা তীর্থঙ্কর ব্যতীত আরও কুড়িটি তীর্থঙ্করের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, ইহাদের তীর্থঙ্করেরা মনুষ্যই ছিলেন। কেবল তাঁহারা তপস্যাদ্বারা নির্বাণ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র। যে-যে স্থানে তপস্যা করিয়া ইঁহারা মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, সেই-সেই স্থান জৈনগণের প্রধান-প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। অনুমান হয়, এই কারণেই মুক্ত বুধগণ তাঁহাদের মধ্যে "তীর্থঙ্কর" নামে পরিচিত।

প্রথম তীর্থঙ্করের আবির্ভাব-কাল যদি টড্ সাহেবের সিদ্ধান্তানুসারেই যথার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে জৈনধর্ম যে অতীব প্রাচীন ধর্ম, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। তবে এই ধর্ম যে মধ্য-এশিয়া হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। আদি বুধ বা বুদ্ধকে আমরা চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠাতা রূপে দেখিতে পাইতেছি। ইহা হইতেই সম্ভবত জৈন ধর্ম পরিপুষ্ট, প্রচারিত ও

প্রণালীবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং এই সমস্ত কার্য যে ভারতবর্ষেই সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তবে মধ্য-এশিয়া এই ধর্মের জন্ম হইলেও হইতে পারে। যে শঙ্কুশীর্ষাকার বর্ণমালায় জৈনদের ধর্মসম্বন্ধীয় শিলালিপি ও তাম্রশাসন সকল লিখিত হইয়াছিল, সে-প্রকার বর্ণমালা যে ভারতবর্ষের নহে, তাহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

হিন্দু আর্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিবার বহুকাল পরে, মধ্য এশিয়া হইতে জৈন ধর্ম আনীত হইয়া থাকিবে। জৈন ধর্ম তৎকালিক বৈদিক ধর্মানুমোদিত যাগ-যজ্ঞ ও যজ্ঞে পশুহননাদি কার্যের একান্ত বিরোধী ছিল। এই কারণে,হিন্দু আর্যগণ এই বৈদেশিক ধর্মের প্রতি খড়্গাহস্ত হইয়া জৈনদিগের সহিত কলহ ও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। এই সংগ্রাম বহুকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। এই সংগ্রাম কেবল বাক্‌বিতণ্ডা বা ভগবান্ শঙ্করাচার্যের রক্তপাতশূন্য দিগ্বিজয়ের ন্যায় ছিল না। এই সংগ্রাম অস্ত্রের ঝঞ্ঝাশব্দে মুখরিত ও মানবশোণিতে কলঙ্কিত হইয়াছিল। আর্যগণ জৈনদিগকে "নাস্তিক" "দৈত্য" "দানব" প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া তাঁহাদের সমূল সমুচ্ছেদের নিমিত্ত অগ্নিকুলোদ্ভব, অনলসঙ্কাশ, যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, জৈন ধর্ম বিধ্বংসের নিমিত্ত, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞদ্বারা অনলকুণ্ড হইতে চারিটি বীর ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম (১) প্রমার, (২) পরীহর, (৩) চৌলক বা শোলঙ্কী এবং (৪) চৌহান। রাজস্থানের মধ্যে প্রসিদ্ধ আবু বা আর্বুধ পর্বতেই এই সৃষ্টিকার্য সমাধা হয়। ব্রাহ্মণেরা এই চারিটি আগ্নবীরকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়া জৈনদিগের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ধর্মবিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন।

এই মহান্ সংগ্রামে জৈনেরা যে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ ধর্ম জৈনধর্মকে কিয়ৎকালের জন্য পরাস্ত করিয়া বিজয়ী হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু কালক্রমে আবার ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হয়। অর্থাৎ যে প্রমারাদি বীরগণ জৈনধর্মাবিধ্বংসের নিমিত্ত গ্রন্থে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই বংশধরগণের অধিকাংশ আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা কালেরই বিচিত্র গতির একটি নিদর্শন মাত্র।

সুতরাং বর্তমান কালে যে-সমস্ত জৈন আছেন, তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা যে হিন্দু আর্য ও হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে, পূর্বানুবর্তিত ধর্মের ক্রিয়া-কলাপ ও সামাজিক আচার-ব্যবহারাদি যে সমস্তই একেবারে পরিত্যক্ত

হয়, তাহা নহে। মানব নূতন পথে ধাবমান হইতে ব্যাকুল হইলেও সে তাহার পূর্বসংস্কারগুলি অনায়াসে বিসর্জন করিতে সমর্থ হয় না। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অতএব, জৈনধর্মাবলম্বী হিন্দুগণও যে নূতন ধর্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পূর্বানুবর্তিত ধর্মের ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক রীতিনীতি সকল একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁহারা আপনাদের হিন্দুত্ব অধিকাংশ রক্ষা করিয়া ধর্মমতে, বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়াছিলেন মাত্র। আধুনিক জৈনগণের ধর্মসম্বন্ধীয় বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করিলে, তাহাদিগকে হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন জাতি বলিয়া বিবেচনা হয় না। মন্দিরে দেবতার পূজা করিবার জন্য তাঁহাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছেন। তাঁহাদের দান গ্রহণ করিবার জন্যও ব্রাহ্মণ আছেন। এই ব্রাহ্মণেরা সচরাচর "ভোজক" নামে অভিহিত হয়েন। শুভপরিণয় কার্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। বিবাহের সময় হোমাদি হইয়া থাকে। ইঁহাদের ধর্মগ্রন্থ সকল প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং ইহারা সংস্কৃতশিক্ষার জন্যও অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। হিন্দুদের ন্যায় ইহারা তীর্থপর্যটন করিয়া থাকেন, তবে ইঁহাদের তীর্থ স্থান ও দেবতা সকল স্বতন্ত্র। হিন্দুদের ন্যায় ইঁহারা বালকদের চূড়াকরণ (জুড়ন বা মুণ্ডন) সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকেন, মৃতকে অগ্নিসাৎ করেন; দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করেন; শ্রাদ্ধ করেন এবং সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধও মহাড়ম্বরে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, হিন্দুদের ন্যায় অশৌচান্তে ইঁহারা মস্তক মুণ্ডনাদি করেন না বটে, কিন্তু শোকের চিহ্নস্বরূপ শোকবস্ত্র ধারণ করেন। হিন্দুদের কতকগুলি দেবদেবীও ইঁহারা অমান্য করেন না। গঙ্গাদেবী, কালিকাদেবী, গণেশজী প্রভৃতি ইঁহাদের পূজ্য। সুতরাং হিন্দুদের সহিত ইঁহাদের পার্থক্য সহজে বোধগম্য হয় না।

হিন্দু আর্যগণ ধর্মবিশ্বাসে ইহাদিগকে "নাস্তিক" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। বৌদ্ধদের ন্যায়, ইঁহারা নির্গুণ ও নির্লিপ্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু সে পরমেশ্বরের সহিত মানুষের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, মানুষের স্তুতিবাদে তিনি প্রীত হয়েন না; নিন্দাবাদেও অপ্রীত হয়েন না। তাঁহার সহিত মানুষের উপাস্য উপাসকের কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং তাঁহাকে উপাসনা করা বৃথা। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়। এই জগৎকে তিনি সৃষ্টি করেন নাই; মানুষকেও করেন নাই। জগৎ চিরকালই আছে এবং থাকিবে, তিনিও চিরকাল আছেন এবং থাকিবেন। জগৎ অনাদি তিনিও অনাদি; এই জগৎ ব্যতীত আর একটি অনাদি আছে, তাহা কর্ম।

মানুষ কর্মবশেই জন্মগ্রহণ করে আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। কর্মবশেই মানুষ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং দুঃখের জন্য পরমেশ্বরের নিন্দাবাদ করা বা সুখের জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া অন্যায়। একমাত্র কর্মই মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও সুখ-দুঃখের কারণ। সুতরাং কর্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে, মানুষের নির্বাণ বা মোক্ষলাভ হয় না। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? সৎকর্ম কর, পবিত্র থাক, সর্বজীবে দয়া কর, কাহাকেও অকারণ পীড়া বা কষ্ট দিও না এবং মুক্তির জন্য ভগবান তীর্থঙ্করগণের নিকট প্রার্থনা কর এবং তাঁহাদিগকে পূজা কর। এই কারণেই জৈনদের মন্দিরে-মন্দিরে এক-একটি তীর্থঙ্করের প্রস্তরময়ী মূর্তি, এই কারণেই সেই তীর্থঙ্করগণের পূজা আরাধনা ও মহোৎসব এবং এই কারণেই জৈনদের তীর্থপর্যটন। অতএব দেখা যাইতেছে যে জৈনেরা মন্দিরে যে পূজা আরাধনা বা উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের তীর্থঙ্করগণেরই উদ্দেশ্যে, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে নহে। তীর্থঙ্করেরা যে-উপায়ে নির্বাণ লাভ করিয়া সুখ-দুঃখ ও জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছেন, সেই উপায় লাভের নিমিত্তই ইঁহাদের নিকট প্রার্থনা করেন।

হিন্দুরাও যে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত পরমেশ্বরের কল্পনা করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা এক ঐশী মায়ার কল্পনা করিয়া তাহাকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিন কার্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই মায়া কচ্ছপের মুণ্ড-পাদাদির ন্যায়, কখনও সঙ্কুচিত এবং কখনও প্রসারিত হইতেছে। সঙ্কোচের সময় ব্রাহ্মাণ্ডের লয় ঘটে এবং প্রসারণের সময় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। মানুষ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের অতীত হইতে না পারিলে, কখনও জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইতে বা পরব্রহ্মে লীন হইতে সমর্থ হয় না। মোটামুটি, হিন্দুদের এই ধর্মবিশ্বাস। এই ধর্মবিশ্বাসের সহিত জৈনদের ধর্মবিশ্বাসের তুলনা করিয়া তাহারা "নাস্তিক" নামের যোগ্য কি-না, তাহার বিচার করা লেখকের সাধ্য নহে।

জৈন ধর্মের বিশেষত্ব সর্বজীবে দয়া বা "অহিংসা পরমো ধর্মঃ"। ইঁহারা একটি সামান্য পিপীলিকা মাড়াইয়া যেরূপ মনঃকষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহা কেহ চক্ষে না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না। শত-শত কুক্কুরকে পালন করিয়া ইঁহারা তাহাদিগকে নিত্য রুটী কচুরী খাওয়াইয়া থাকিবেন। অকর্মণ্য গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতিকে না খাটাইয়া ইঁহারা তাহাদিগকে পশু চিকিৎসাশালা বা "পিঞ্জরা পোলে" পাঠাইয়া থাকেন। বৃক্ষ-লতাদিকেও ইঁহারা জীব বলিয়া জ্ঞান করেন। ইঁহারা অকারণ বৃক্ষচ্ছেদন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। একবার

লেখক একটি সুন্দরী জৈন বালিকার সম্মুখে একটি পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছিল ; ক্ষুদ্র বালিকা তাহা দেখিয়া যেরূপ ব্যগ্রভাবে তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হস্ত রোধ করিয়াছিল, তাহা সে এ-জন্মেও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তাহার সেই ব্যাকুলতা, পুষ্পবৃক্ষটি কষ্ট পাইবে বলিয়া তাহার সেই কাতরতা, এবং লেখক যাহাতে পুষ্প চয়ন না করেন, তজ্জন্য তাহার সেই সুমিষ্ট বচন বিন্যস্ত অনুরোধ লেখকের স্মৃতিপটে চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকিবে। বলিতে কি হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষে আমি তাহাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিয়াছিলাম। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে "কুসুমকোমল প্রাণা" বঙ্গললনার করকমলে বঁটির দ্বারা ছিন্নার্ধমুণ্ড ধড়ফড়ায়মান রোহিতের দেহ ও হত্যানন্দোৎফুল্ল সম্মুখবর্তী "সুকুমার" বালক-বালিকাদের মুখারবিন্দও মনে করিয়াছিলাম।

জীবের প্রতি দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও, একটি বিষয়ে জৈনদের বড়ই সঙ্কীর্ণতা দেখিতে পাই। তাহা মানুষ সম্বন্ধে। মানুষের প্রতি জৈনেরা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় ইঁহারা মানুষকে যেন জীবের মধ্যেই গণনা করেন না। কি কারণে হৃদয়ের এইরূপ বিকার উপস্থিত হইল, তাহা আমি ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। মানুষ কষ্ট পাইলে কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন, "এ ব্যক্তি আপনার কর্মদোষে কষ্ট পাইতেছে ; ইহাকে সাহায্য করিয়া ফল কি ?" তবে ইঁহাদের মধ্যে যে উদার হৃদয় মহৎ লোক বিরল, তাহাও নহে।

সুনীতি এবং পবিত্রতা সম্বন্ধেও জৈনদের আচরণ অনেকস্থলে অনুকরণীয় নহে। ফলত আধুনিক জৈনেরা যে তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়, অর্থই এখন অনেকের নিকট পরমার্থ এবং বিলাসই প্রায় সকল অঙ্গের ভূষণ। নির্বাণ, কর্ম, সুখ-দুঃখ, ও জন্ম-মৃত্যুর তত্ত্ব শুনিতে ভাল বটে কিন্তু কার্যে প্রকৃত ধর্মের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না, বর্তমান হিন্দুরাও জৈনদের সহিত সমবস্থ।

[ভারতী, ভাদ্র, ১৩০৬]

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

বৈদিক চিন্তায় ভিন্ন সুর

(এক)

যাহাদের ধারণা ভারতবর্ষ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান, এই দেশের সহিত তাঁহাদের পরিচয় অসম্পূর্ণ। বর্তমান পৃথিবীতে বস্তুবাদ যেমন প্রবল ও সর্বাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে, একদা ভারতভূমিতেও এই চিন্তাধারা সমভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। ভারতের চিন্তারাজ্যে যদিও আধ্যাত্মিকতার প্রভুত্ব অব্যাহত ছিল, তথাপি ইহাও স্মরণীয় যে, এই সনাতন ভূমিতে এমন সব চিন্তা-নায়কের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল যাঁহাদের মতামত ছিল প্রচলিত বিশ্বাস ও দর্শনাদির বিপরীতধর্মা। এইভাবে এক পৃথক ধারার চিন্তাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়, যাহা সাধারণভাবে চার্বাক দর্শন বলিয়া অভিহিত।

চার্বাক সম্প্রদায়ের মূল পুঁথিগুলি আজ আমাদের কাছে লুপ্তপ্রায়। তাঁহাদের মতামত বা উক্তি বিশেষের ভগ্নাংশ হিন্দু বৌদ্ধ বা জৈন শাস্ত্রাদির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। বলিতে গেলে এই অবিন্যস্ত উদ্ধৃতিগুলিই বর্তমানে চার্বাক দর্শনের পরিচয় সম্বল।

বৃহস্পতি লৌক্য বা ঋগ্বেদের ব্রহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরম সত্য বলিয়া ঘোষণা করেন। ভাবিলে ভুল হইবে না যে, ভারতীয় বস্তুবাদ প্রাথমিক স্তরে সংশয়বাদ ও নেতিবাদের সহিত মিশ্র অবস্থায় ছিল। ইহার সুস্পষ্ট আকার দেন বৃহস্পতি ঋগ্বেদে। বৃহস্পতি 'গণপতি' বলিয়া অভিহিত—এক সাংগীতিক গোষ্ঠীর অধিনায়ক—কবীনাং কবিঃ। চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী। এই কারণে তাহাদিগকে বার্হস্পত্য বা লোকায়তিক বিশেষণে উল্লেখ করা হয়। বৃহস্পতি আজ বিস্মৃতির নেপথ্যে অদৃশ্য। চার্বাকরা কিন্তু এখনও আলোচনার বিষয়।

ভারতের ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চার্বাক মতবাদের প্রতিভূদের সন্ধান পাওয়া যায়। রামায়ণের জাবালি মুনি ছিলেন বস্তুবাদের আচার্য বিশেষ। রামের উদ্দেশে তাঁহার উপদেশাবলী চার্বাক মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। মর্ত্যভূমির অধীশ্বর অপেক্ষা উর্দ্ধতন কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই—ভাষান্তরে ইহা চার্বাকের উক্তি। হরিবংশের রাজা বেণ এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি ছিলেন বেদ-বিরোধী। ব্যাস তাঁহাকে বিধর্মী আখ্যা দিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রের মতে অজিত কেশ কম্বলী ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তাঁহার উপদেশাত্মক উক্তিগুলির সহিত চার্বাক সম্প্রদায়ের মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। অজিতের অনুবর্তী পায়াসি গুরুর মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে জানা যায় যে, ভাগুরি ছিলেন চার্বাক মতের একজন প্রখ্যাত উদ্গাতা। শান্ত রক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহে উল্লিখিত পুরন্দর ছিলেন সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভুক্ত। প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্য বলিয়া তিনি অনুমানকে সত্যজ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে আংশিকভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। হরিভদ্রসূরি প্রণীত ষড়দর্শন সমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্ন বলেন, কোন-কোন চার্বাক আকাশকেও ভূত হিসাবে স্বীকার করিয়া থাকেন, সদানন্দ তাঁহার অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও সর্বশেষে মনশ্চৈতন্যবাদের প্রবর্তন করেন চার্বাক সম্প্রদায়ের উত্তরসূরীরা। প্রাচীন নাস্তিক্যবাদের প্রবল শত্রু বুদ্ধোত্তর যুগের ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলে এই সকল নূতন মতবাদ প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। 'কামসূত্রে'র লেখক বাৎস্যায়নও সম্ভবত এই যুগেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। যদিও তিনি নিজে বস্তুবাদী ছিলেন না, তথাপি ইন্দ্রিয়োপভোগের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার মতামত সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়ের উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জ্ঞানতত্ত্ব ঃ চার্বাকদের দার্শনিক চিন্তা তাঁহাদের বিশিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ ব্যতীত সত্যজ্ঞান লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই সত্য, যাহা কিছু প্রত্যক্ষের অতীত তাহাই সংশয়িত, ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ বলিয়া অনুমানকে তাঁহারা সত্যজ্ঞানের মাধ্যম বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। কারণ, ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে কোন এক বিশেষ 'ক' কোন এক বিশেষ 'খ'-এর সাথে সম্পর্কিত। তাহা হইতে অপ্রত্যক্ষে উপনীত হইয়া কেমন করিয়া এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে সব 'ক'-এর সঙ্গে সব 'খ' সম্পর্কিত? এই ধরনের জ্ঞান এই কারণে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার্য নহে।

আপ্তবাক্যও নির্ভরযোগ্য নয়। কেন-না আপ্তবাক্যের যাথার্থ্যে অনুমানের সাহায্যে নিরূপিত হয়। পরন্তু প্রায়শই দেখা যায় যে, এই ধরনের আপ্তবাক্য-যুক্তিবিবর্জিত ও স্বকপোলকল্পিত এমনকি বেদাদিও নির্ভরযোগ্য নয়। বেদগুলি ব্যর্থক, অবাস্তব ও পরস্পর বিরোধী উক্তিতে পরিপূর্ণ। একটি বিধিবাক্যে যে-ক্রিয়া পদ্ধতি বিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট, অপর বিধিবাক্যে তাহাই নিন্দার্হ বলিয়া বর্ণিত। বৈদিক গ্রন্থগুলিতে যে-সকল ফলশ্রুতির আশ্বাস দেওয়া আছে তাহা কস্মিন্‌কালেও সার্থক হয় না।

কিন্তু অনুমানকে সর্বতোভাবে বর্জন করিলে প্রাত্যহিক জীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই কারণে সুশিক্ষিত চার্বাকরা অনুমানকে জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনুমানকে দ্বিবিধভাগে ভাগ করিয়াছেন—অতীত সম্পর্কিত ও ভবিষ্যৎ নির্দেশক। তাঁহারা প্রথমোক্ত অনুমান স্বীকার করিয়া দ্বিতীয়োক্ত অনুমান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাহা কোনকালে প্রত্যক্ষ গোচর নয়, তাঁহারা এমন অনুমানকে বর্জন করিয়াছেন। কাহারও-কাহারও মতে লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য 'সম্ভাব্যজ্ঞান' স্বীকার করিয়া লইলেই যথেষ্ট। ধূম হইতে আমরা বহ্নির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি, সুনিশ্চিত হইতে পারি না। দৈনন্দিন জীবনে এই সম্ভাবনাই যথেষ্ট কার্যকরী।

কার্যকারণ সম্বন্ধঃ চার্বাকপন্থীরা ঘটনা বিশেষের অবশ্যম্ভাবী কার্য-কারণিক সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহেন। দুইটি বিষয়ের প্রত্যক্ষগোচরতা হইতে তাহাদের মধ্যে কার্যকারণিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমরা দুইটি বিষয় দেখিতেছিঃ বহ্নি ও ধূম। কি করিয়া বলা যায় বহ্নি ধূমের কারণ—ইহা কিরূপে নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে আমাদের জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরেও ধূম থাকিলেই বহ্নির অস্তিত্ব নিরূপাধিত ও অনিবার্যরূপে বর্তমান ছিল ও থাকিবে? ব্যাপারটি অনুমানের বিষয়; সুতরাং অনিশ্চয়তা দোষে গ্রহণযোগ্য নহে।

ঘটনাবিশেষের হেতু সম্পর্কে চার্বাকরা বলিয়া থাকেন যে সকল ঘটনাই স্বতঃস্ফূর্ত বা আকস্মিক। কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, পশু-পক্ষীর প্রকৃতি বৈচিত্র্য, ইক্ষুর মধুরতা, নিম্বের তিক্ততা—সকলই আকস্মিক পরিণাম বা স্বতই সম্ভব হইয়াছে ইহা ঈশ্বর নামক কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার সৃষ্টি কৌশল নয়। এই বিপুল পৃথ্বী আকস্মিকভাবেই সৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুর মৌলিক উপাদানগুলির আকস্মিক সম্মেলনের ফলে ইহা উৎসারিত হইয়াছে। এই ধরনের ব্যাখ্যাকে বলা হইয়া থাকে যদৃচ্ছাবাদ। মধ্যপন্থী চার্বাকরা স্বভাবকে পরিদৃশ্যমান বিষয়কালের নিয়ামক বলিয়া মনে করেন, অতিপ্রাকৃত চেতন কোন সত্তাকে সবকিছুর নিয়ন্তা বলিয়া ধারণা করা এইজন্য অবান্তর। এই ধারণা পদ্ধতিকে স্বাভাববাদ বলা হয়।

জড়ঃ চার্বাকরা চারটি উপাদানকে প্রাথমিক ও শাশ্বত বলিয়া স্বীকার করেন, যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। প্রশ্নোপনিষদের ঋষি কবন্ধী ক্যাতায়ন অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। ব্যোম প্রত্যক্ষগোচর নহে বলিয়া প্রাচীন চার্বাকরা ইহাকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জড় ও জীব সকল সত্তাই এই ভূতচতুষ্টয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অসতঃ সদজায়ত—বৃহস্পতির এই

উক্তির নিহিতার্থ হইতেছে যে বস্তুই চরম সত্য ; ঋগ্বেদের পরমেষ্ঠীর সংশয়াত্মক মতবাদ সম্ভবত এই উক্তির ভিত্তিমূলে বর্তমান।

চৈতন্য ঃ চৈতন্য মানবদেহের গুণবিশেষ, চৈতন্য সেই সকল জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত যাহাদের আকস্মিক মিশ্রণে মানুষের শরীরযন্ত্র গঠিত। চার্বাকরা মনোগঠন প্রক্রিয়াকে সুরার উপমা দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুরা এমন কতকগুলি উপাদানের সংমিশ্রণে তৈয়ারি হয় পৃথকভাবে যাহাদের নিজস্ব কোন মাদকতা শক্তি নাই। মনোজগতের বিচিত্র অনুভূতির মাধ্যম আত্মা বলিয়া কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নাই। দেহই আত্মা, 'আমি কৃশ' বা 'আমি স্থূল' প্রভৃতি অভিব্যক্তির 'আমি' বলিতে নিশ্চয় দেহ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে বুঝায় না। দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয়, সঙ্গে-সঙ্গে সাংগঠনিক উপাদানগুলি নিজ-নিজ বিভাগীয় ভূতে মিশ্রিত হয়। সুতরাং কর্মফল ভোগ, আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। জড় পদার্থ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি—এই মতবাদ বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পাওয়া যায়। দেহাত্মবাদের অনুকূলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যানে।

চৈতন্যের কারণ অনুসন্ধানে এই সম্প্রদায়ের পরবর্তী শিষ্যে বা আরো তিনটি মতের প্রবর্তন করেন ঃ ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। যদিও প্রাণ এবং মনকে দেহ হইতে পৃথক সত্তা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে তথাপি তাহাদের দেহ-নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

ধর্ম ঃ চার্বাকের জ্ঞানতত্ত্ব নূতন বিশ্বাসের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে অনুমানসাপেক্ষ অতিপ্রাকৃত সত্তার উপর নির্ভর করিয়া। অনুমান অসিদ্ধ বলিয়া অতিপ্রাকৃত সত্তাও অসিদ্ধ। জগতের বিষয়-বৈচিত্র্য বস্তু-নিচয়ের স্বভাবের তাড়নায় সংঘটিত হইতেছে, ঈশ্বর বলিয়া অতিপ্রাকৃত কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নাই, সর্বশক্তিমান। সর্বজ্ঞ ও দয়াময় ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন তিনি জ্ঞানার্থীদের সকল সংশয় দূর করিয়া নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন না কেন ? ঈশ্বরকে আমাদের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির বিচারকও বলা যায় না, তাহা হইলে তিনি পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়েন। আমাদের পাপের জন্য যদি ঈশ্বর আমাদের শাস্তি বিধান করেন তবে তিনি আমাদের শত্রু বিশেষ। সুতরাং নিষ্ঠুর ঈশ্বর থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। বস্তুত বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা বা শাসনকর্তারূপে ঈশ্বর বলিয়া কাহারও অস্তিত্ব নাই। রাজাই পরমেশ্বর—রাজ্যের একমাত্র শাসক, সামাজিক হিতাহিতের নিয়ন্ত্রণকারী ও চূড়ান্ত বিচারক।

মোক্ষ ঃ সনাতনপন্থীরা মোক্ষ অর্থে সর্ববিধ জাগতিক সম্পর্ক হইতে আত্মার বন্ধনমুক্তি অথবা দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ এমন এক মানসিক অবস্থা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু চার্বাকরা বাস্তববাদী বলিয়া দেহাতীত আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। মানুষ সুখ-দুঃখের অতীতাবস্থা আয়ত্ত করিতে পারে বলিয়াও তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। মোক্ষ বলিতে তাঁহারা বুঝেন স্বাধীনতা, অপ্রতিহত শক্তি অথবা দেহের বিলয়। তাঁহারা মনে করেন যে, যাহারা জনসাধারণের মনে অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস জন্মাইয়া নিজেদের জীবিকা সংস্থানের সুযোগ করিয়া থাকে স্বর্গ-নরক তাহাদেরই কল্পনামাত্র। জাগতিক সীমার বাইরে স্বর্গ-নরক বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব নাই। সুখই স্বর্গ, দুঃখ-ভোগই নরকধাম। স্বর্গলাভের প্রত্যাশায় ধর্মীয় ব্রত্যাদি অনুষ্ঠান, দেবতাদের প্রসন্ন করার প্রয়াস, তাঁহাদের সন্তোষবিধানের জন্য প্রার্থনা বা উপচারের আয়োজন—সকলই অর্থহীন। মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সুখভোগ।

জীবনের লক্ষ্য ঃ ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তানায়কদের এই অর্থে দুঃখ-বাদী বলা যায় যে, তাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষের পশ্চাতে ধাবমান এবং পার্থিব জীবনের দুঃখ-দুর্দশা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু জড়বাদীরা সর্বদাই আশাবাদী। তাঁহারা জগৎকে দুঃখময় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে ইহজগতের সুখই একমাত্র বস্তু যাহা সত্য এবং কাম্য বুদ্ধিমান মানুষের একমাত্র পুরুষার্থ হইতেছে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা অর্থাৎ সুখভোগ—'কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ'। ইহা সত্য যে দুর্ভোগমুক্ত অবিমিশ্র সুখ সম্ভব নয়। রাজার সুরম্য প্রাসাদে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সর্বত্রই দুঃখ আছে। তথাপি আমাদের এই সাধের জগৎ দুঃখের দ্বারা আকীর্ণ নয়। সুখের ভোগ দুঃখ অপেক্ষা অধিক, তাহা যদি না হইত তবে মানুষ এমন ঐকান্তিকভাবে বাঁচিতে চাহিত না। মৃত্যুর নামমাত্র শুনিয়া সশঙ্ক হইয়া উঠিত না। বুদ্ধিমানের কাজ হইতেছে, যতটা পারা যায় সুখভোগ করিয়া লওয়া এবং অনিবার্য দুঃখ যথাসম্ভব বরণ করিয়া লওয়া। দুঃখের ভয়ে সুখভোগের সুযোগ অবহেলা করা মূর্খতা। পঙ্ক ও কণ্টকের আশঙ্কায় কি আমরা মৎস্যগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব, কণ্টকের ভয়ে কমল সংগ্রহে নিবৃত্ত হইব, তুষাদির জন্য পুষ্টিকর তণ্ডুল গ্রহণ করিব না? দুঃখে অশ্রুপাত করিব, এই জগতে যেমন অভিভূত হইবার মতো মৃত্যু শোক বা রোগভোগ, তেমনি সুখ-সহোদর শিশুপুত্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখ আছে, হ্লাদিনী কন্যার লাবণ্যচ্ছটা আছে। মনোরমা ভার্যার আসঙ্গ যদি মর্ত্যকে নন্দনলোকে পরিণত করিতে পারে তবে তাহার বিচ্ছেদ যে গভীর

দুঃখের কারণ হইবে, তাহাও জানা কথা। এই জগতে যদি কোনওরূপ স্নেহের বন্ধন নাও থাকে তবুও দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই, ইহজগতে যাহার আপনার জন বলিতে কেহ নাই তাহার হৃদয় নিরন্তর বেদনাময় ও মরুভূমির মতো বিশুষ্ক।

আবার ইহাও ভাবিবার বিষয় যে সুখভোগ তখনই চরমে উঠে যখন দুঃখের বৈপরীত্যে তাহার অনুভব ঘটে। এই কারণে দুঃখভোগ সর্বদা মন্দ নয়। খাদ্য গ্রহণের আনন্দ ভালোভাবে আস্বাদ করিতে হইলে ক্ষুধাজনিত কষ্টভোগ করা দরকার। তৃষ্ণার আর্তি যতই তীব্র হইবে শীতল জলপানের আনন্দ ততই বৃদ্ধি পাইবে। যখন সুদীর্ঘ বিরহভোগের অবসানে প্রণয়িযুগল মিলিত হয় তাই একই ব্যাপার ঘটে। বিরাম বিহীন সুখভোগ বিরক্তিকর। আজ যাহা রমণীয় বলিয়া প্রতীত লইতেে· মুহুর্মুহুঃ আস্বাদনে তাহাই বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে। প্রতিদিনের ব্যবহারে সুস্বাদু খাদ্যও অপ্রীতির কারণ। সুতরাং অবিরাম সুখের জন্য কাতর হওয়া মূর্খতা। এই জীবনে বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা আছে। যতদিন আয়ু আছে সুখভোগের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা সমীচীন। এমনকি ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ', কেননা 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' ?

মনে হয় এই সম্প্রদায়ের মতবাদগুলি নিন্দুক ও বিরোধী পক্ষের হস্তে পড়িয়া কিছুটা বিকৃত হইয়াছে। কখন কখনও কতকগুলি অশোভন মতামত বৃহস্পতির স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। অস্বাভাবিক মনে হয় এইজন্য যে, যে-ব্যক্তি সমাজে গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত তিনি কি করিয়া অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ দান করেন। বৃহস্পতির সুশিক্ষিত শিষ্যেরা বলাৎকারের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন। সামাজিক শৃঙ্খলার আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁহারা সর্বদাই ছিলেন সতর্ক। বৃহস্পতিকে গণপতি আখ্যাদান, এই চিন্তাধারাকে লোকায়িত নামকরণ এবং 'লোকসিদ্ধো ভবেৎ রাজার' মতো অনুশাসন বাক্যে এই ধারণার অনুকূলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

চার্বাকেরা মানসিক সাম্যের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল নির্বিশেষে সকলের ধমনীতে যখন একই লোহিত রক্ত প্রবাহিত তখন তাঁহাদের মতে জীবনের পরমলোভ্য সুখভোগের সুযোগে সকলেরই সমানাধিকার।

এপিকিউরাস অ্যারিষ্টিপ্রাসের তুলনা : লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এপিকিউরীয় দর্শনের সহিত চার্বাক চিন্তা পদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান, উভয় দর্শনেই দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন সত্তা বলিয়া মনে করে। এপিকিউরাসের মতে আত্মা হইতেছে একপ্রকার শারীরবস্তু—চারিটি মূল পদার্থের পরমাণু

সংমিশ্রণে গঠিত হইয়া সমগ্র দেহ-সংস্থায় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তবে হৃদয়ের অংশে ইহা অধিকতর ঘনীভূত। চার্বাকরা প্রায় একই বলিয়া থাকেন ক্ষিতি,অপ তেজ ও মরুৎ এই ভূতচতুষ্টয়েব পরমাণুর সংমিশ্রণে মনুষ্যশরীর গঠিত এবং তাহা হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয় অথবা তাহারই চৈতন্যে পরিণত হয়। এপিকিউ-রায় সম্প্রদায় চার্বাকদের সহিত সমস্বরে বলিয়া থাকেন যে, সর্ববিধ মানসিক সুখ শারীরিক ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্পর্কিত ও তাহা হইতে উৎসারিত। জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে দুইটি সম্প্রদায়ের বহুলাংশের ঐকমত্য লক্ষণীয়। এপিকিউরাসের মতে আমাদের ক্রিয়া-কর্মের মূলীভূত উদ্দেশ্য সুখলাভ ও দুঃখ পরিহার। দুঃখকে পরিহরি করিতে হইবে, সুখকে অন্বেষণ করিতে হইবে—অগ্নি যেমন উষ্ণ ও বরফ যেমন ইহাও শীতল। সেইরূপ সহজ সত্য। প্রত্যেক জীবই স্বভাবত বা প্রকৃতির প্রেরণায় সুখের অনুসন্ধান করিতে ও যন্ত্রণা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে, যদি এইভাবে আমাদের সকল উৎসাহ, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সুখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় তাহা হইলে আমরা সুখকেই পরমলভ্য ও দুঃখকে চরম ত্যাজ্য বলিতে পারি। এই বিষয়ে চার্বাকরা একই কথা বলিয়া থাকেন—সুখই পরম পুরুষার্থ, তাহার বিপরীতই নরকবাস।

সাইরেনের অ্যারিষ্টিপ্পাসের সহিত চার্বাক দর্শনের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অ্যারিষ্টিপ্পাসের মতে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তিগত সুখাস্বাদন। ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বর্তমানের সুযোগ কখনই অবহেলা করা উচিৎ নয়। কেন-না ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত। বর্তমান আমাদের আয়ত্তে বলিয়া ইহার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করা উচিত। 'খাও দাও নৃত্য করো মনের আনন্দে, আগামী কাল আমাদের অস্তিত্ব নাও থাকিতে পারে।'—চার্বাকেরা একই মত পোষণ করেন, 'আজকের কপোত আগামী কালের ময়ূর অপেক্ষা মূল্যবান।' "বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ"। "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" চার্বাক মতের সহিত সমভাবাপন্ন ওমর-খৈয়ামের একটি চরণও এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"ঢালো সুরা ভরি' পাত্র, সদানন্দ অহোরাত্র, যতকাল আছে এই দেহ;
কেননা এ প্রাণ পাখী, উড়ে গেলে সব ফাঁকি, ফিরে হেথা আসে নাকো কেহ।
(ফিটজেরোল্ড অনুসরণে)

উপসংহার ঃ—স্বাধীন চিন্তার স্রোতকে নিরুদ্ধ করিয়া যুগ-যুগ ধরিয়া যে কু-সংস্কারের আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, ঈশ্বর-চিন্তা বা স্বর্গ-নরকের কল্পনার দ্বারা ব্যাহত না হইয়া এই চিন্তাধারা জীবনের মাধুর্যকে নিঃশেষে আস্বাদন

করিবার আহ্বান জানাইয়াছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে চার্বাকদের বৈতণ্ডিক কথা বা তত্ত্বোপপ্লবাদ অন্য সম্প্রদায়ের চিন্তাশীলদের সমস্যার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী অধিকতর সংযত সতর্ক ও যুক্তিযুক্ত হইবার সুযোগ পায়। ভারতের প্রত্যেক দার্শনিককে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে তত্ত্বোপপ্লববাদী চার্বাক সম্প্রদায়ের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করিতে হইয়াছিল। কারণ উক্ত সম্প্রদায় প্রচলিত সকল তত্ত্ব প্রমাণেরই প্রামাণ্য খণ্ডনে প্রয়াস করিয়াছিল। এইভাবে দেখা যায় ভারতীয় দর্শনের উন্নয়নে এই সম্প্রদায়ের অবদান সত্যিই মহৎ।

["স্মৃতি, আচার ও ধর্ম"]

চার্বাক সম্প্রদায়

(দুই)

চার্বাকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এক সম্প্রদায় কেবল বিতণ্ডাই করিতেন। পরমত দূষণ বা খণ্ডনই ইহাদিগের একমাত্র কর্তব্য ছিল। ইহাদিগের স্বতন্ত্র কোনও আগম বা উপদেশ ছিল না। ইহারা কোনও তত্ত্বকেই 'তত্ত্ব' বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এমন কি চার্বাক মতের আদি প্রবর্তক আচার্য বৃহস্পতির উপদেশকেও ইহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ঈশ্বর, পরলোক, বেদ, আপ্ত প্রভৃতি ত দূরের কথা, সর্বজন স্বীকৃত প্রত্যক্ষকেও ইহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এই সম্প্রদায়ের চার্বাকগণই নাস্তিক, বৈতাণ্ডিক, হৈতুক, লোকায়ত, তত্ত্বোপপ্লববাদী প্রভৃতি নামে পরিচিত। সর্বত্র সন্দেহ উৎপাদনেই এই মতের চরিতার্থতা। অনেকের মতে ইহারাই আদি চার্বাক।

ইহার পর ধূর্ত চার্বাকগণ; এই সম্প্রদায় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। অনুমানাদি কোন প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না। ইহাদিগের মতে—দেহই আত্মা; পরিদৃশ্যমান জগৎ আকস্মিক ও চাতুর্ভৌতিক, অচেতন ভূতচতুষ্টয়ের মিলনে চৈতন্যের উৎপত্তি; স্থূল ইন্দ্রিয়োপ-ভোগ জন্য সুখই পুরুষার্থ; ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই; পরলোক, পুনর্জন্ম, বা জন্মান্তর বলিয়া'ও কিছু নাই। কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং কর্মফলও স্বীকৃত হইতে পারে না। ঐহিক, দৈহিক ও ক্ষণিক সুখই স্বর্গ, কন্টকাদি ব্যথাজনিত দুঃখই নরক,

দেহচ্ছেদই মুক্তি। ইহাদিগকে উচ্ছেদবাদী, দেহাত্মবাদী, এবং ধূর্ত চার্বাকও বলা হইয়া থাকে। ইহারাই সর্বজন পরিচিত ও বহুনিন্দিত চার্বাক সম্প্রদায়।

ইহার পর সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য যেরূপ অনুমান অবশ্যস্বীকার্য এবং যেই পরিমাণ কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে লোক যাত্রা নির্বাহ হয় না, সেই পরিমাণ কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রামাণ্য স্বীকার করেন কিন্তু যেরূপ অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর, পরলোক, পুনর্জন্ম, কর্ম-ফল, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি প্রতিপন্ন হয় সেইরূপ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এই সুশিক্ষিত চার্বাকগণ অর্থ এবং কাম এই উভয়কেই পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অথর্ববেদ এবং গান্ধর্ববেদকেও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা স্বভাবকে পরিদৃশ্যমান জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। পশুসুলভ ঐহিক, দৈহিক, আত্মকেন্দ্রিক, স্থূল, ক্ষণিক সুখের পরিবর্তে মনুষ্যোচিত পবিত্রতর সূক্ষ্মতর মানসিক সুখকে ইহারা পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এই সুশিক্ষিত চার্বাকগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। কেহ বা দেহকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়কে, কেহ বা ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া মনকে, কেহ বা মনকে অতিক্রম করিয়া প্রাণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। ইহারাই ইন্দ্রিয়াত্মবাদী, মনাত্মবাদী এবং প্রাণাত্মবাদী চার্বাক। আর এক শ্রেণীর চার্বাক আকাশকেও পঞ্চম মহাভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহারা ক্রমে অধ্যাত্ম-বাদের দিকেই অগ্রসর হইয়াছেন।

বৃহস্পতিকে চার্বাক মতের আদি প্রবর্তক বলা হয়। কিন্তু কে এই বৃহস্পতি? পণ্ডিতগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতের ঐক্য নাই। তাঁহারা বিভ্রান্ত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের লৌক্যবৃহস্পতি তাঁহার সূক্তে—'অসৎ' হইতে 'সৎ' উৎপন্ন হইয়াছে—এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ-কেহ 'অসৎ' শব্দে 'জড়' এবং 'সৎ' শব্দে 'চৈতন্য' কে বুঝিয়াছেন। এই অর্থ গ্রহণ করিলে, লৌক্যবৃহস্পতির উক্তির, 'জড়' হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়াছে এই অর্থ স্বীকার করিতে হয়, 'জড় স্বভাব ভূতচতুষ্টয় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি' ইহা চার্বাকেরই মত, সুতরাং উক্ত লৌক্যবৃহস্পতিকেই চার্বাক মতের আদি প্রবর্তক বলা যাইতে পারে।

'চার্বাক' শব্দটির নির্বাচনেও পণ্ডিতগণ নানা কথা বলিয়াছেন। অভিধানে 'চারু' শব্দটির একটি অর্থ 'বৃহস্পতি'। চারুর অর্থাৎ বৃহস্পতির বাক্ অর্থাৎ

বাক্য বা উপদেশ যাহারা অনুসরণ করে তাহাদিগকে চার্বাক বলা যায় কি না নির্বাচনপটু পণ্ডিতগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

ন্যায় কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য এবং কুসুমাঞ্জলির প্রকাশটীকাকার বধমান বুদ্ধকে চার্বাকের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণের মধ্যে আরও কেহ কেহ বুদ্ধকে চার্বাক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ-কেহ বা বৌদ্ধমত ও চাবাক মতের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 'বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা' নামে একখানি পুস্তকে চার্বাক ও বৌদ্ধ মতের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান তাহা দেখাইয়াছেন। আপাত দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায়ই অসদ্বাদী এবং বেদ-বিরোধী, সুতরাং নাস্তিক। এইজন্যই বোধহয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ-কেহ উভয় সম্প্রদায়কে অভিন্নরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

মৈত্রায়ণী উপনিষদে কাপালিকগণকে লৌকায়তিক গণের সহিত সমপর্যায়ে উল্লেখ করিয়া উভয়কেই অস্বর্গ্য, তস্কর এবং সাধু সমাজের বর্জনীয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দার্শনিক গুণরত্ন তর্করহস্য দীপিকায় ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া কাপালিকগণকে নাস্তিক, চার্বাক এবং লোকায়ত প্রভৃতি নামে অভিহিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাপালিক একটি ধর্মসম্প্রদায়; চাবাক কোনও ধর্মই স্বীকার করে না। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ই, আপাতদৃষ্টিতে, অবৈদিক বা বেদবিরোধী এবং উভয় সম্প্রদায়েরই পুরুষার্থ 'কাম'। এইজন্যই বোধহয় কেহ-কেহ এই উভয় সম্প্রদায়কে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

চার্বাক মতের সকল বিশিষ্ট অবয়বগুলিরই মূল বৈদিক সাহিত্যে। পর্য্যানুযোগ বিতণ্ডা বা পরমত দূষণ হইতেই তার্কিকতা, হেতুবাদ এবং নাস্তিকতার উৎপত্তি। ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগেই এই নাস্তিকতার বীজ দেখিতে পাওয়া যায়, কোন-কোন ঋষি ইন্দ্রাদি দেবতার অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। কৌৎস ত বেদের প্রামাণ্যই অস্বীকার করিলেন মুণ্ডকাদি উপনিষদে ও বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতি অধিক্ষেপ করা হইয়াছে। কঠোপনিষদে নাস্তিক নামটিরও মূল পাওয়া যায়। লৌক্যবৃহস্পতির 'অসতঃ সদজায়ত' এই উক্তিতে বস্তুবাদ বা জড়বাদের বীজ নিহিত। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে স্বভাববাদ ও যদৃচ্ছাবাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ, মনশ্চৈতন্যবাদ, প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদ প্রভৃতির এবং গীতায় অনীশ্বর আসুর ধর্মের মূল দেখিতে পাওয়া যায়।

চার্বাক দর্শন

(তিন)

চার্বাকে ভোগবাদের মূল বৈদিক যুগে হইলেও তাহার পূর্ণবিকাশ অর্বাচীন কালে ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয় 'চার্বাক' নামটি বৈদিক সাহিত্যে দুর্লভ। এই নামটি মহাভারতেই সুপরিচিত। মহাভারতেই চার্বাকের কঠোর তপঃ সাধনা, ব্রহ্মাকর্তৃক বর-প্রদান এবং ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করাতে তাহাদিগের হস্তে প্রাণ বিসর্জন প্রভৃতির উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। চার্বাক ব্রাহ্মণদ্বেষী, বৈদিকধর্ম বিরোধী, অহিংসা, অদ্রোহ প্রভৃতি বৌদ্ধনীতি প্রচারক, ধূর্ত এবং ছলনাপটু, ব্রাহ্মণবেশী—রাক্ষস, ব্রহ্মরাক্ষস বা অসুরবিশেষ-রূপেই মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে ইহাকেই বোধহয় ধূর্ত চার্বাক বলা হইয়াছে।

লোকায়ত মতে—কাম বা সুখভোগই একমাত্র পুরুষার্থ, এই সুখ দুই প্রকারের হইতে পারে—ইন্দ্রিয়োপভোগজন্য, পশুসুলভ আপাত সুখানুভূতি এবং নির্মল অতীন্দ্রিয় সুখানুভূতি। ধূর্ত চার্বাকগণ ইহাদিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সুখকেই পুরুষার্থ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত চার্বাকগণ বাৎস্যায়নের কামসূত্রে বর্ণিত নির্মল সুখকেই আদর্শ মনে করিয়া উপরিউক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর সুখকেই পুরুষার্থ বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের সুখবাদই সুশিক্ষিত চার্বাকগণের সুখবাদ, সুশিক্ষিত চার্বাকগণ বাৎস্যায়নের কামসূত্রে উল্লিখিত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা নির্মল সুখের আস্বাদেও তৃপ্ত হইত। একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক, স্থূল বিষয়োপভোগ জন্য সুখই কাম্য হইলে লোকযাত্রা বা সমাজ-ব্যবস্থা ব্যাহত হয়, নিজের সুখের অংশবিশেষও উৎসর্গ করিয়া অন্যকে দিতে না পারিলে সামাজিক জীবন যাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুশিক্ষিত চার্বাকগণ রাজাকে পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও তাহাদিগের সামাজিকতার জ্ঞানেরই পরিচায়ক, 'দণ্ডনীতি রেব বিদ্যা' 'অত্রৈব বার্তাস্তর্ভবতি' এই বলিয়া তাঁহারা দণ্ডনীতি ও বার্তাশাস্ত্রকেও চার্বাক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বাৎস্যায়নের মতে –'ধর্মার্থ কামাঃ সমক্ষে,ঃ সেব্যাঃ'। সুশিক্ষিত চার্বাকের মতে—'অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ'। বাৎস্যায়ন ধর্ম ও অর্থকে কামের সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এই কামোপভোগের জন্য ব্রহ্মচর্য, ধর্ম ও নাগরিক বৃত্তির অভ্যাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই তিনটি অতিক্রম করিয়া সুখভোগ করিতে গেলে

তাহা পশুসুলভ সুখভোগই হইয়া পড়ে, সেই সুখের কোনও মর্যাদা বা আভিজাত্য থাকে না। তাহা অত্যন্ত লঘু ও সঙ্কীর্ণ বলিয়াই বিবেচিত হয়। অবশ্য শরীর স্থিতির জন্য, আহার-নিদ্রাদির ন্যায়, ঐরূপ স্থূল সুখও উপেক্ষণীয় নহে। ইন্দ্রিয়গণের যথাযথ তৃপ্তি না ঘটিলে মানুষ উন্মাদ হইয়া যাইতে পারে। তাই বলিয়া ঐরূপ সুখ কখনও সুসভ্য মানুষের আদর্শ পদবাচ্য হইতেপারে না। ঐরূপ সুখ একান্তই পশুধর্মী। ইন্দ্রিয় সেবাজন্য সুখভোগ করিতে গেলে ও ইন্দ্রিয়গণকে সুনিয়ন্ত্রিত, মার্জিত ও সুশিক্ষিত করা আবশ্যক। অন্যথা তাহারা বন্য জন্তুর ইন্দ্রিয়গ্রামের ন্যায় উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে, বাৎস্যায়নের মতে ইহাতে সুখেরই আত্মঘাত ঘটিয়া যায়। ভবিষ্যতে অধিকতর ও উৎকৃষ্টতর সুখের একান্ত সম্ভাবনা থাকিলে ও বর্তমানকালমাত্র লভ্য সুখের বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবে না বা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিত লভ্য তাদৃশ সুখপ্রাপ্তির জন্য কোনও যত্ন বা ক্লেশ স্বীকার করিব না, মনুষ্য সমাজে এইরূপ অসহিষ্ণু ও অলস মনোভাব বিপজ্জনক। কারণ এই শ্রেণীর সুখবাদী ভবিষ্যতে প্রচুর শস্য সম্পদলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও বর্তমানে বিশ্রাম জন্য ক্ষুদ্র সুখকে বিসর্জন দিয়া ভূমিকর্ষণ বা বীজবপনের ক্লেশ স্বীকার করিবে না। ইহারা বলিবে —'বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ'—আগামী কল্য ময়ূরটি পাইব সেই আশায় অদ্য যে কপোতটি পাইতেছি তাহা ত্যাগ করিতে পারিব না, ইহারাই হইলেন ধূর্ত চার্বাক, সুশিক্ষিত চার্বাকগণের মতে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাকে সুসংযত করিতে না পারিলে সুখভোগই অসম্ভব হইয়া যায়। পশুসুলভ অনিয়ন্ত্রিত সুখ সুখপদবাচ্য নহে। বাৎস্যায়ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং পরলোক স্বীকার করেন। তিনি নাস্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। কিন্তু তিনি কাম বা সুখের যে উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা ধূর্ত চার্বাকগণের মনোমত না হইলেও সুশিক্ষিত চার্বাকগণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা আরও দেখিয়াছি, চার্বাকগণ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত কোনও প্রমাণই স্বীকার করেন না—'প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণম্'। কিন্তু ইহাতে লোকযাত্রা নির্বাহ হওয়াই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই সুশিক্ষিত চার্বাকগণ আংশিকভাবে লোকযাত্রা নির্বাহনপ্রবণ অনুমানকেও নিজেদের মত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ধূর্ত চার্বাকগণ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত কোনও প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও সুশিক্ষিত চার্বাকগণ প্রথমে সম্ভাবনা ও ক্রমে ক্রমে লোক প্রসিদ্ধ, ধূমাদি দর্শনে অগ্ন্যাদির অনুমানকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কেবল, যেইরূপ অনুমানের সাহায্যে আত্মা, ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, পরলোক প্রভৃতি

অলৌকিক বিষয় স্থাপিত হয় সেইরূপ অলৌকিক অনুমানকেই স্বীকার করেন নাই।

পুরন্দর প্রমুখ সুশিক্ষিত চার্বাকগণ লোকযাত্রা নির্বাহনপ্রবণ অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্র এবং লোকায়ত শাস্ত্রের প্রামাণ্যও স্বীকার করিয়া লইলেন। ধূর্ত চার্বাকগণ নির্বোধ, তাহারা ক্রমে ক্রমে নিন্দিত ও উপহসিত হইয়া বিলুপ্তির পথে চলিয়া গেলেন। সুশিক্ষিত চার্বাকগণ বুদ্ধিমান ও সামাজিক, তাহারা সময়ের সহিত পদক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিলেন।

আমরা আরও দেখিয়াছি, এক সম্প্রদায়ের চার্বাকগণ কেবল বিতণ্ডাই করিতেন। পরমত দূষণই তাহাদিগের একমাত্র কর্তব্য ছিল। পালি-সাহিত্যে এই সম্প্রদায়ের চার্বাকগণকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে 'বিতণ্ডসল্লাপং লোকায়তিকবাদং,' ন্যায় মঞ্জরীকার জয়ন্তও ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—'নহি লোকায়তে কিঞ্চিৎ কর্তব্যমুপদিশ্যতে। বৈতাণ্ডিক কথৈ বাসৌ ন পুনঃ কশ্চিদাগমঃ।।' অভয় দেবস্থরিও ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—'সর্বত্র পর্যনুযোগ পরান্যেব সূত্রাণি বৃহস্পতেঃ।'

এই সম্প্রদায়ের চার্বাকগণ 'সর্বপ্রমাণা প্রামাণ্যবাদী।' ইহারা প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। আচার্য বৃহস্পতির মতকেও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে না।

চার্বাক মতের মূল গ্রন্থ সকল লুপ্তপ্রায়। সৌভাগ্যক্রমে এই সম্প্রদায়ের একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম 'তত্ত্বোপপ্লব সিংহ'। গ্রন্থকারের নাম জয়রাশি ভট্ট, গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

সংশয়বাদ ও বিতণ্ডাবাদ নেতিমূলক। নেতিমূলক কথায় কোনও মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাই অসদ্‌বাদী ধূর্তচার্বাকগণের আবির্ভাব। ধূর্তচার্বাকগণের মত যথাযথ অনুসরণ করিলে লোকযাত্রা নির্বাহ হওয়া কঠিন হয় তাই সুশিক্ষিত চার্বাকগণের আবির্ভাব।

মন্ত্রযুগের ঋষি বৃহস্পতি এই মত প্রবর্তন করিলেন। অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার সহযোগিতা করিলেন। ফলে সুগঠিত একটি নাস্তিক দার্শনিক মতের উদ্ভব হইল। এই বৃহস্পতি প্রবর্তিত দর্শনমত দার্শনিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে যতই স্থুল বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, ইহার স্থান যতই নিম্নে হউক না কেন, ইহাই ভারতের 'আদি দর্শন'। এই দর্শন মতই ভারতে স্বাধীন চিন্তার পথিকৃৎ। ইহার পর সূত্রযুগের বৃহস্পতি বার্হস্পত্য দর্শনের সূত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইহাকে

একটি সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত দর্শন প্রস্থানে পরিণত করিলেন। কালক্রমে সেই শাস্ত্রগুরু শিষ্য পরম্পরা ক্রমে চার্বাক সম্প্রদায়ের হস্তে অর্পিত হইল। চার্বাকগণ আবার শিষ্য উপশিষ্যের সাহায্যে এই শাস্ত্রকে বহুলীকৃত করিয়া লোকায়ত অর্থাৎ লোক মধ্যে বিস্তৃত বা প্রচারিত করিলেন।

এই চার্বাক দর্শনের অবদান অসামান্য। ইহাকে পূর্ব-পক্ষরূপে পাইয়াই অন্যান্য দর্শন-শাস্ত্রগুলি সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইয়া শক্তিশালী হইয়াছে, পরবর্তীকালে আস্তিক, নাস্তিক ভেদে বিরুদ্ধবাদী শক্তিশালা দার্শনিকগণ কর্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া চার্বাকবাদিগণ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। একদলের নাম হইল অশিক্ষিত চার্বাক, অন্যদলের নাম হইল ধূর্ত চার্বাক। ধূর্ত চার্বাকগণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, লীন হইতে লীনতর হইয়া, অবশেষে আত্মহত্যা করিলেন ; সুশিক্ষিত চার্বাকগণ বাঁচিয়া রহিলেন। দুঃখের বিষয় ধূর্ত চার্বাকগণের সহিত চার্বাক মতের মূল গ্রন্থগুলিও লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল।

বৌদ্ধপূর্ব যুগে বৈদিক ঋষিগণের স্বাধীন চিন্তার ফল—সংশয়বাদ ; নাস্তিকতা ও বস্তুবাদে ইহার উৎপত্তি, বৌদ্ধ যুগের সুতীক্ষ্ণ ও সুদৃঢ় যুক্তিবাদে ইহার প্রসার এবং বৌদ্ধোত্তর যুগে ধূর্ত চার্বাকগণের পশুসুলভ স্থূল সুখবাদরূপ নির্বুদ্ধিতায় ইহার বিলুপ্তি!

চার্বাকপন্থী মৃত্যুকে ভয় করে না—'মরণমেবাপবর্গঃ'। ভারতকারের মতে তাহারা—'চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং'—পৃথিবীর সর্বত্রই বিচরণ করিতেছে। চার্বাকের দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য নাই, কর্মফল নাই, স্বর্গ-নরক নাই, পরলোক নাই, জন্মান্তর নাই, ধর্মাধর্ম নাই, ঋষি নাই, দেবতা নাই, প্রত্যক্ষের বাহিরে কিছুই নাই। ইহাই চার্বাক মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(পুরোগামী প্রকাশনী-সংক্ষেপিত)

উজ্জীবনের পথে

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিযোগী শক্তিরূপে একদিন জেগে উঠেছিল বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম—এসেছিল চার্বাকের 'নেতিবাদ'। কিন্তু লুপ্তপ্রায় বৈদিক সংস্কৃতির উজ্জীবনের জন্যই যেন সেই একই সময়ে হলো পুরাণের সৃষ্টি—বৈদিক সংস্কৃতি যার পটভূমি। আমাদের পুরাণ সম্পদ যেন অতীতের ঐশ্বর্যের দিকে এক ধরনের সিংহাবলোকন! শঙ্কর ও রামানুজ বলেছেন পুরাণগুলি বৈদিক সাহিত্যাশ্রয়ী—ভারতীয় ধর্ম ও জীবনের চিরন্তন উৎস পুরাণের মধ্যেই আর্যধর্ম পূর্ণ বিকশিত।

উজ্জীবনের পথে পুরাণের পরই ষড়দর্শন। এদেরও লক্ষ্য এক—তা হলো মুক্তি; কিন্তু যে-আলোকে পথ দেখিয়ে এরা চলেছেন, সেই আলোকও এক অর্থাৎ শ্রুতি বা আগম। এই দীপবর্তিকা ধারণ করেছিলেন গৌতম, কণাদ, ঈশ্বরকৃষ্ণ, পতঞ্জলি, জৈমিনি, শঙ্করাচার্য এবং আরো অনেকে।

বিনায়ক সান্যাল

পুরাণ-প্রসঙ্গ

পুরাণগুলি সত্যই নিতান্ত পুরানো—একেবারে জরাজীর্ণ। আধুনিক প্রগতি,—যুগের উর্দ্ধশ্বাস অভিযানের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলা কি তাহাদের কর্ম! কোন মান্ধাতার আমলের স্থবির ঋষিদের রচিত এসব কাহিনী কি আর এই মনোবিকলনের যুগে 'কলিকা' পায়! তাই আধুনিকদের কাছে ইহাদের কোনই মূল্য নাই। তাঁহাদের মতে এগুলি নিছক গাল-গল্প। সোমরসের মৌতাতে নিষ্কর্মা ঋষিদের প্রলাপের উচ্ছ্বাস।

এই যে মনোভাব, ইহার কারণ কি? ২৫/৩০ বৎসর পূর্বেও যে পুরাণ-কথা শুনিবার পিপাসা আমাদের দুর্নিবার ছিল, পুনঃপুনঃ শুনিয়াও মন তৃপ্তিলাভ করিত না, তাহার প্রতি সহসা এই তীব্র বিতৃষ্ণার উদ্ভব হইল কেমন করিয়া? আমরা স্বরাজ চাই, স্বাধীনতা চাই, ভারতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে চাই; অথচ অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল আমাদের নাই। বিদেশের ধার করা 'কালচার' লইয়া আমরা গড়িয়া তুলিব জাতীয়তার সৌধ-পরম্পরাগত ধ্যানধারণাকে তুলিয়া প্রতীচ্যের স্বপ্নাদর্শ দিয়া রচিব ভারতের স্বাধীন ভবিষ্যৎ। ইহা অপেক্ষা ব্যর্থ ও হাস্যকর প্রয়াস আর কি হইতে পারে! রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণগুলিকে অলীক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ইহারা ইতিহাস—শুধু রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে, সৃষ্টি-প্রকরণ অথবা রাজবংশাবলীর বিবরণমাত্র নহে, ভারতের সাধনা ও ধ্যানের ইতিহাস। ইহাদের সুবিশাল কলেবরের মধ্যে কত সহস্র বৎসরের কামনা ও বেদনা, সিদ্ধি ও সাধনা, রূপকথার রাজকন্যার মতোই, সুপ্তিঘোরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। সোনার কাঠির পরশ পাইলেই তাহারা জাগিয়া উঠে—সুদূর অতীতের রহস্যলোক হইতে স্বপ্ন-সঙ্গীতে প্রাণ ভরিয়া দেয়। সেই বিশাল মণিহর্ম্যে কত প্রকোষ্ঠ, কক্ষে কক্ষে কত চিত্র, কণ্ঠে-কণ্ঠে কত কাকলী! শৌর্য ও সৌন্দর্য, প্রেম ও ভক্তি, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সংযম ও সরলতার কি অপূর্ব সমন্বয়! ছায়া পটে সচল, সবাক ছবির মতো একটির পর একটি ফুটিয়া উঠে, নড়ে চড়ে, কথা বলে, আমাদের সহিত তাহাদের বিনা ভাষায় বাণী বিনিময় হইয়া যায়।

'পুরাণ' শব্দের মূলগত অর্থ পূর্বতন, সেইজন্য আদিযুগে পুরাণ বলিলে বিশেষ করিয়া প্রাচীন আখ্যায়িকাদিসম্বলিত গ্রন্থবিশেষ বুঝাইত। কিন্তু ইহা যে কত প্রাচীন, তাহা এখন নিঃসংশয়রূপে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে আমরা দেখিতে পাই, আর্য জাতির প্রাচীনতম শাস্ত্রসমূহেও পুরাণ প্রসঙ্গ আছে, আর্য-সমাজে

পুরাণকথা বেদের ন্যায় আদৃত হইত। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—"পুরাণ-বেদ; 'এই সেই বেদ' এই কথা বলিয়া অধ্বর্যু পুরাণ কীর্তন করিতে থাকেন।" বেদাদির উৎস হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে এই পুরাণগুলি। 'আর্দ্রকাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ করিলে যেমন একই কালে তাহা হইতে নানা বর্ণের ও আকারের ধূম নির্গত হইতে থাকে, সেইরূপ মহান্ ভূতের নিঃশ্বাস হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বেদসমূহ ও পুরাণ-গ্রন্থগুলি' 'মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ'। বৃহদারণ্যক মতে, বেদ যেমন আর্য ঋষিগণের হৃদয়াকাশে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, পুরাণও সেইরূপ বিনা-আয়াসে তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদ (৭।১২) বলেন, 'ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্'—ইতিহাস ও পুরাণ বেদসমূহের পঞ্চম বেদ। ফল কথা, বৈদিক, এমনকি, প্রাগ-বৈদিকযুগেও যে পুরাণের প্রচলন ছিল, তাহার যুক্তিসম্মত প্রমাণ আছে। তবে একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে অষ্টাদশ মূল পুরাণ ও অন্যান্য উপপুরাণ সবই এক সময়ের রচনা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মহাভারতের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, "সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের রচনা প্রাচীন বলিয়া বোধহয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাস রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু পুরাণ-সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন যে, উহারা এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এক-এক অংশ পাঠ করিলে এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর।"

আমার স্থির বিশ্বাস, প্রচলিত পুরাণ গ্রন্থগুলি কোনটিই কোন একজন লেখক কর্তৃক একটি বিশেষ সময়ে বিরচিত হয় নাই। আর্যসভ্যতার প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যুগে-যুগে যে-সকল আখ্যান ও উপাখ্যান সূতমুখে শ্রুত ও লোকায়ত হইয়াছিল, পরম্পরাগত সেই কাহিনীগুলি বিশেষ-বিশেষ যুগে বিভিন্ন লেখক সংকলিত হইয়াছিল মাত্র। বেদ-বিভাগকর্তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সর্বপ্রথম এইরূপে একখানি মাত্র সংকলন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—অবশ্য ইহার মধ্যে তাঁহার নিজের রচিত কোন কাহিনীই ছিল না, একথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। এই মূল গ্রন্থ হইতে লোমহর্ষণ শিষ্যত্রয় তিনখানি সংহিতা ক্রমশ প্রকাশ করেন। প্রথমে এই চারিখানি, এবং তাহা হইতে একে-একে ১৮ খানি মূল পুরাণ এবং বহু পরে বহুতর অর্বাচীন পুরাণ সংকলিত হয়।

এইরূপ মনে করিবার একটি সঙ্গত কারণও আছে। অনেক সময় দেখা যায় মহাভারতের এই আখ্যানগুলির সহিত ভারতীয়, এমনকি বিদেশীয়, অন্যান্য

গ্রন্থ-নিবদ্ধ অনেক কাহিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভগবান তথাগতের পূর্ব-জন্ম-বৃত্তান্ত নানা গল্পের আকারে লিপিবদ্ধ আছে 'জাতক' গ্রন্থে। এই গল্প-সংগ্রহের সকলগুলি তাঁহার নিজের রচিত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, মহাভারতাদি গ্রন্থের কাহিনীর সহিত ইহাদের কোন-কোনটার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধ-জন্মের কতকাল পূর্ব হইতে এ-জাতীয় গল্পের উদ্ভাবনা হইতেছিল এবং তাঁহার আবির্ভাব-কালে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) ইহাদের মধ্যে কতগুলি লোক-সমাজে সুপ্রচলিত ছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। সে যাহা হউক, এই সকল আখ্যায়িকার লোকপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব যে ইহাদের ধর্ম-দেশনার বাহন রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্মিলিত দুই পক্ষীর জাল-হরণের কাহিনী মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে, পঞ্চতন্ত্রে, হিতোপদেশে এবং জাতকে প্রায় একই আকারে পাওয়া যায়।—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, পালি ভাষার বচনগুলিই মৌলিক, এবং মূল শ্লোকগুলি ক্রমশ সংস্কৃতে অনুকৃত ও রূপান্তরিত হইয়াছে।

'কে আগে, কে পাছে' বহু শতাব্দী পরে সে-প্রশ্নের মীমাংসা আজ সহজ নহে; তবে একথা নিশ্চয় যে ভারতের বাতাসে এই কাহিনীগুলি বহুদিন হইতেই ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাই বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় গ্রন্থেই উহারা তুল্য সমাদরে আসন লাভ করিয়াছে। 'দশরথ'-জাতকে রাম-সীতার কথাই বর্ণিত আছে; কিন্তু সেখানে উঁহারা সহোদর সহোদরা, অথচ শেষ পর্যন্ত উঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। প্রচলিত বিশ্বাস, বাল্মীকি আদি কবি এবং রামায়ণ আদি কাব্য, তথাপি তাহাতে রাম-সীতার একনিষ্ঠ প্রেমের যে অনুপম আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় এই জাতক কথা কি বর্বর যুগের রচনা বলিয়া মনে হয় না? 'ঘট'-জাতকের সহিত ভাগবতের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট, কিন্তু এক্ষেত্রে ভাগবতের নিকট জাতকের ঋণ সহজে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না, কারণ,ইহা একপ্রকার নিঃসংশয় রূপেই নির্ণীত হইয়াছে যে, ভাগবতের রচনাকাল খৃষ্ট জন্মের পূর্বে নয়। রামানুজাচার্যের অভ্যুদয় হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে। প্রামাণিক ভক্তিশাস্ত্র হিসাবে তিনি বিষ্ণু-পুরাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ভাগবতের প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার জীবিত কালে ভাগবতের পর্যাপ্ত প্রচার ও প্রভাব থাকিলে এরূপ ঘটনা আদৌ সম্ভব হইত না। **Winternitz** এই গ্রন্থ দশম শতকে সংকলিত বলিয়া মনে করেন; যদিও তিনি বিশ্বাস করেন, ইহার মধ্যে এরূপ বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহা আরও পুরাতন।

অপর পক্ষে, জাতক-কথার সবগুলিই যে বুদ্ধের সমসাময়িক, একথাও দৃঢ়তার

সহিত বলা চলে না ; তবে ইহাদের গাথা বা পদ্যাংশগুলি যে অতিশয় প্রাচীন সে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। মোটকথা, আমার বক্তব্য—বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ, উপপুরাণাদি সকল গ্রন্থের রচয়িতাই পরম্পরা প্রাপ্ত লৌকিক কাহিনীর নিকট ঋণী।

ইহার পরেই বিচার্য, এই পুরাণগুলি কেবলই মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কল্পিত গল্প, না ইহাদের মধ্যে ইতিহাসের অংশও কিছু আছে? 'ইতি হ' এই অব্যয় শব্দটি হইতে 'ইতিহাসের' উৎপত্তি।—ইহার অর্থ পরম্পরা প্রাপ্ত কাহিনী ; এইরূপ কাহিনীর আসন বা অবস্থান যাহা তাহাই ইতিহাস। তাহা হইলে প্রাচীন নির্বচন অনুসারে পরম্পরাগত যে-কোন কাহিনীর নামই ইতিহাস। অমরকোষ এই অর্থ অঙ্গীকার করিয়াও স্থানান্তরে বলিয়াছেন, 'ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তম্' অর্থাৎ পুরাবৃত্ত অথবা পরম্পরাক্রমে আগত পুরাতন ঘটনার বিবরণকেও ইতিহাস নামে চিহ্নিত করা যায়। সায়ণাচার্য বেদভাষ্যে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণোপক্রমে) এবং শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক ভাষ্যে বলিয়াছেন, "বেদের অন্তর্গত যুদ্ধ-বর্ণনা অথবা উর্বশী-পুরুরবার কথোপকথনাদি বিষয়ক ব্রাহ্মণ ভাগের নাম ইতিহাস, এবং 'সর্ব প্রথমে একমাত্র অসৎ ছিল' ইত্যাদি সৃষ্টি প্রক্রিয়া ঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ।" বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ু পুরাণ মতে পুরাণের লক্ষণ পাঁচটি—

> সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ
> বংশানুচরিতং চৈব পঞ্চপুরাণ লক্ষণম্॥

সৃষ্টি ও প্রলয়ের (**destrcution and renovation**) বিবরণ, বিভিন্ন রাজবংশ ও সেই সকল বংশজাত ব্যক্তিগণের বিবরণ পুরাণে থাকিবেই, ইহা ছাড়া অন্যান্য অবান্তর প্রসঙ্গও প্রয়োজনমত পুরাণ মধ্যে আলোচিত হইবে।

সংস্কৃতজ্ঞ বিদেশীয়গণের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যথোচিত সমৃদ্ধ হইলেও আর্য ঋষিগণ পুরাবৃত্ত রচনা-বিষয়ে আদৌ মনোযোগী ছিলেন না, এবং সেই কারণেই অতীত ভারতের তথ্যমূলক ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। সামান্য যাহাকিছু ঐতিহাসিক তথ্য বিক্ষিপ্তভাবে পুরাণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাও আবার প্রক্ষিপ্ত ও অতিরঞ্জিত ; কাহিনীর সহিত এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে তাহাকে অসন্দিগ্ধ রূপে আবিষ্কার করা সুকঠিন।

কাজটি কঠিন সন্দেহ নাই, তবে একথা ঠিক নয় যে পুরাবৃত্তের উপাদান পুরাণে নিতান্তই যৎসামান্য। শাস্ত্রে 'ইতিহাস' এবং 'পুরাণ' শব্দ দুইটি সর্বত্র

একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং পরম্পরাগত কাহিনী অথবা উপাখ্যান যেমন তাহার একটি উপাদান, তেমনি আখ্যান অর্থাৎ স্বয়ং দেখিয়া যে-সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করা হইয়াছে, এবং পুরাবৃত্ত অর্থাৎ মাগধ (court historian) গণ-প্রদত্ত ও সূতবর্ণিত প্রাচীন ঘটনার বিবরণও তাহার একটি অবচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং পুরাণগুলি আখ্যান ও উপাখ্যানের, ঘটনা ও কাহিনীর অপূর্ব সমন্বয়। "যেহেতু পুরাকালে এইরূপে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেইহেতু ইহার নাম পুরাণ।"— কিন্তু ইহাদের মধ্যে যেগুলি বাস্তবিকই অতিলৌকিক, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করা কি এতই কঠিন! হনুমানের গন্ধমাদন-আনয়ন এবং বাহুমূলে ভানু-ধারণ ভযে নিতান্তই বাড়াবাড়ি, একথা বুঝিতে কি এতই বিলম্ব হয়? এইপ্রকার অত্যুক্তির উদাহরণ পুরাণের ভিতর ভূরি ভূরি পাওয়া যাইবে, এবং সেগুলিকে চিনিয়া লইতে আমাদের বিশেষ বুদ্ধি ব্যয়ও করিতে হইবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই—পুরাণ বা ইতিহাস গ্রন্থে ইহারা আসন লাভ করিল কিরূপে? ইহার উত্তর অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত; বক্তব্য বিষয়কে নগ্নরূপে প্রকাশ করা এদেশের চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধ। ইতিহাস হইলেও তাহা সাহিত্য। কাজেই রস দিয়া, রঙ্ চড়াইয়া বিবৃত করিতে হইয়াছে এই আখ্যানগুলি। অনেকস্থলে ধর্মদেশনার উদ্দেশ্যে রূপকচ্ছলে কাহিনীগুলি বলা হইয়াছে। কাটাছাঁটা নীরস নীতিকথা মনের বহিঃস্তর হইতেই পিছলাইয়া যায়, গভীরতর স্তরে কোন দাগ কাটে না। তাই আর্য ঋষিগণ নিরাবরণ নীতি-নিবন্ধ অপেক্ষা শ্রুতি-রসায়ন গল্পের মধ্য দিয়াই চেষ্টা করিয়াছেন ধর্ম প্রচারের। তথাগত বুদ্ধও সম্ভবত এই কারণেই জাতকের রূপক গল্পগুলির মাধ্যমে তাহার সদ্ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার পর, কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ও পণ্ডিত জনের জন্যই এগুলি কল্পিত হয় নাই—আবালবৃদ্ধ সকলকেই তুল্য রূপে তৃপ্ত করা ছিল ইহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই বালকচিত্ত-রঞ্জনের জন্য স্থানে-স্থানে অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কেহ-কেহ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ভূমিষ্ঠ হইবার বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণান্তর্গত প্রত্যেকটি অত্যুক্তির সমর্থনের প্রয়াসী, তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে চান না যে, ইহাদের মধ্যে অসম্ভাব্য বা অবিশ্বাস্য কিছু আছে; সুতরাং তর্কস্থলে প্রতিপক্ষের সম্মুখে অলৌকিকতম কাহিনীটিরও রূপক ব্যাখ্যা করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান। আমাদের দোষই এই যে, আমরা অবিশ্বাস ও অতিবিশ্বাসের মধ্যবর্তী একটি যুক্তিসম্মত শ্রদ্ধার পথ ধরিতে পারি না; আজকাল আমাদের চরিত্রে এই নিরপেক্ষ সত্য দৃষ্টির বড়ই অভাব। আমরা হয় অতি-আধুনিকের চোখে

অবাস্তব ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, নতুবা অতীতের জীর্ণখুঁটি আঁকড়াইয়া তাহারই চারিদিকে অকারণে ঘুরিয়া মরি। পুরাণের এই অতিপ্রাকৃত অংশগুলি বাদ দিলে যেটুকু বাকী থাকে, তাহা খাঁটি ইতিহাস অভ্রান্ত ও অবদাত—ইংরাজীতে যাহাকে বলে History। একথা সম্ভবত অনেকেই জানেন যে, ভিন্সেণ্টস্মিথ্ প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালের যে প্রামাণিক ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন, তাহার তথ্যাংশের জন্য শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি ব্যতীতও বহুলাংশে তাঁহাকে মহাবংশ ও অশোকাবদানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তকারগণের মধ্যে জর্জটার্ণার সর্বপ্রথম দ্বীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং অশোক-যুগের রহস্যময় অস্পষ্টতার উপর নূতন আলোকপাত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এইগুলি প্রাচীন কাহিনী-গ্রন্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং সেই হিসাবে ইহারা পুরাণেরই সগোত্র; পুরাণের মতোই ইহাদের মধ্যে অতিরঞ্জিত, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে; অথচ সিংহলীয় ও ভারতীয় এই দুইটি কাহিনীই অশোক চরিত্র চিত্রনে ঐতিহাসিকগণের সর্বপ্রধান অবলম্বন। অতএব পুরাণে ঐতিহাসিক উপাদান কিছুই নাই, একথা কেমন করিয়া বলি?

পুরাণের আর একটা বড় দিক—ইহার লোকশিক্ষা। মানুষের চরিত্রে যতগুলি রমণীয় চিত্তবৃত্তির কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাদের অপরূপ চিত্র দেখিতে পাই ইহার মধ্যে। পাতিব্রত্য, সৌভ্রাত্র, মাতা-পিতৃভক্তি, বিশ্বস্ততা, সরলতা, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি যে গুণগুলি মর্ত্যের মানুষকে দেবতার আসনে উন্নীত করে —যে-প্রীতির পরিমণ্ডল রচিত হইলে দুঃখ-বেদনার নির্মম অভিঘাতও মানুষের মনকে আলোড়িত করিতে পারে না পুরাণ শিল্পী সুকৌশলে আমাদের জন্য সেই চিরানন্দময় সৌন্দর্যলোক রচনা করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, কেবল বিদগ্ধ মণ্ডলীর জন্যই এগুলি সঙ্কলিত হয় নাই, আপামর সাধারণের ছিল ইহাতে অবাধ অধিকার। বহুশ্রুত ব্রাহ্মণের জন্য ছিল বেদ উপনিষদাদি, বেদ-বঞ্চিত শূদ্র ও নারীগণের জন্য ছিল এই মধুময় পুরাণ-কথা। ইহাদের ভিতরে গভীর তত্ত্বকথাও অনেক সময় গল্পচ্ছলে এমন মনোজ্ঞরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার প্রভাব গূঢ়রূপে সমাজ-জীবনের নিম্নতম স্তরেও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। কেনেডি-সাহেব বলিয়াছেন, "আমি তো ইহাদের মধ্যে উপদেশ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যই খুঁজিয়া পাই না। সৃষ্টি-প্রকরণ এবং রাজ-বংশাবলীর বিবরণ ইহাদের মধ্যে আছে সত্য, কিন্তু সেগুলি ইহাদের অন্তরঙ্গ বস্তু নহে, যেন কতকটা বাহিরের জিনিস; সকল পুরাণে ইহাদের উল্লেখও নাই, এবং কোন-কোনটিতে এই

সম্পর্কে বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত ; অপরপক্ষে, প্রত্যেক পুরাণেই হিন্দু-ধর্মের মুখ্য সূত্র, আচার ও অনুষ্ঠানগুলি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কখন গল্পচ্ছলে, কখন বা বিবিধ দেবতার্চনায় যে-সকল মন্ত্রাদির প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধে বিধান দিয়া।” এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অধ্যাত্ম পিপাসার উদ্রেক করাই ছিল ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। বেদে যে-সকল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সূক্ষ্ম সূত্রের আকারে গ্রথিত আছে, সেগুলির মর্ম গ্রহণ সাধারণ বুদ্ধির বহির্ভূত, তাই পুরাণকার গল্পচ্ছলে সেগুলিকে পল্লবিত করিয়া সাধারণের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। বেদের মধ্যে কেবল প্রকৃতি পূজা ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির অর্চনার কথাই পাওয়া যায়, এবং তাহার চরম লক্ষ্য হইল সকল দেবতার মধ্য দিয়া জগৎ-সবিতা ‘বিশ্বদেবতা’র অনুধ্যান—সকল বৈষম্যের মধ্যে পরম ঐক্যের উপলব্ধি। ইন্দ্র (আকাশ), অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য, সোম ইত্যাদি প্রকৃতি মূর্তি ও গ্রহগণ নররূপেই কল্পিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের তর্পণের জন্য মন্ত্রপাঠ,নামগান ও আহুতি প্রদানের বিধান আছে কিন্তু কোন নর নায়ক এ-পর্যন্ত দেবরূপে পরিকল্পিত ও পূজিত হন নাই ; ফলত, অবতারবাদের স্বীকৃতি সমগ্র বেদ-সংহিতার মধ্যে খুব অল্পই পাওয়া যায়। পুরাণের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশে এই বীরপূজা প্রথম প্রচলিত হয়। বেদ দেবতাকে মানুষ করিয়া স্তবে, স্তোমে তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন ; পুরাণ স্বর্গের দেবতাকে ধূলায় না টানিয়া মাটির মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ থাকিলেও তাহাদের ভূমিকা সেখানে নিতান্তই গৌণ ও অপ্রধান, মানুষই সেখানে নায়ক-নায়িকা, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বীর্যৈশ্বর্যের চিত্রই উহার একমাত্র উপজীব্য। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় আদি কবি বাল্মীকির মুখে বলিয়াছেন—

> “হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিত পিতামহ পায়ে
> স্বর্গ হ’তে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিও না ফিরায়ে।
> দেবতার স্তব-গীতে দেবেরে মানব করি’ আনে,
> তুলিব দেবতা করি’ মানুষেরে মোর ছন্দ-গানে।,”

যাহা হউক,আমার বক্তব্য—নানা মহচ্চরিত্র নর-দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া, তাঁহাদের কর্ম ও ধর্ম-জীবনের উদার আদর্শ লোকচক্ষুর সমুখে ধরিয়া পুরাণকৃৎ কবিগণ গণ-মনকে আত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই সংস্কৃত হইলেও ইহাদের ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল, তখনকার কালে—যখন ভাষার

বহুল প্রচলন ছিল ইতর সাধারণও সম্ভবত এই সহজ সংস্কৃত শুনিয়া মোটামুটি তাহার মর্মগ্রহণ করিতে পারিত। লোকশিক্ষার জন্য উদ্দিষ্ট ছিল বলিয়া ইহাদের ভাষা সুধীজনোচিত কঠিন নহে। তবে যে যে অংশে ধর্ম তত্ত্বাদি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত দুরূহ সন্দেহ নাই; সূতগণ (বর্তমান কালের কথক) সেই সেই অংশ ব্যাখ্যা করিয়া সরল প্রাকৃতে বুঝাইয়া দিতেন। পাছে সাধারণের বুঝিবার অসুবিধা হয়, এইজন্য বুদ্ধদেব তাহার উপদেশ ও নিবচনগুলি সহজ-বোধ্য পালিভাষায় বিবৃত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাই পুরাণকল্প বৌদ্ধজাতক-কথা পালি অথবা মাগধী প্রাকৃতে নিবদ্ধ। সহজ প্রাকৃতে প্রচারের ফলে ইহা অত্যল্পকালের মধ্যেই দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সমগ্র ভারত নির্বাণ 'ভাবনায়' উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

এ-পর্যন্ত আমরা কেবল সংস্কৃত-নিবদ্ধ প্রাচীন পুরাণ সম্পর্কেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এখন ভাষাপুরাণ বিশেষ করিয়া কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ ও কাশীদাস-কৃত মহাভারত সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ভাষা-পুরাণগুলি মূলের অবিকল অনুবাদ নহে। কৃত্তিবাস-কৃত রামায়ণের মধ্যে এমন অনেক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা আর্য রামায়ণে নাই; কোথায় সেখানে 'অঙ্গদরায়বীর' তরণী সেনের যুদ্ধ, অষ্টোত্তরশত-নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকাল বোধন, অশ্বমেধযজ্ঞে লব-কুশের সহিত রামচন্দ্রের যুদ্ধ! মূল কবি-কথার সহিত প্রচলিত কিংবদন্তী মিশ্রিতহইয়া ভাষা-রামায়ণকে এক সম্পূর্ণ নূতনরূপ দিয়াছে। পরম্পরাক্রমে রামায়ণী কথার যে-ধারা আমাদের দেশে বহমান ছিল, তাহাকেও কবি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, করিলে তাহা জনাদর হইতে বঞ্চিত হইত। আবার বাঙলা রামায়ণের সহিত তুলসীকৃত হিন্দি রামায়ণের তুলনা করিলে দেখিতে পাই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অতি সামান্য, এইরূপ প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা-রামায়ণের সহিত অন্য যে-কোন প্রাদেশিক রামায়ণের তুলনা করিলে দেখিতে পাইব, কোন প্রদেশই আপনার পরিমণ্ডলের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের রাম-সীতা তুলসীর রাম-সীতা হইতে স্বতন্ত্র; আখ্যায়িকার দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বড় কম নয়। মোট কথা, প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা কবিই চাহিয়াছেন, জাতীয়তার অনুকূল একটি বাতাবরণ সৃজন করিতে, যাহার ভিতর দিয়া তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাহাদের নিজস্ব সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারে। ভাষা-মহাভারত সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে।

বঙ্গ ভাষায় কত কবিই তো রামায়ণ, মহাভারত রচনা করিয়াছেন,

তাঁহাদের নাম কে জানে? এই চারণদলের রচনাসমূহের মধ্যে এই দুইখানি গ্রন্থই কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া আজিও বাঁচিয়া আছে। বাঁচিয়া আছে তাহার কারণ ইহারা প্রাণবন্ত, নিত্যকালের ভাব সৌরভে ভরপুর। যাত্রায়, কথকতায়, পাঁচালি ও ব্রতকথায় এই লোকসঙ্গীতের ধারা একদা সহস্র শাখা প্রসারিত করিয়া সমগ্র বঙ্গভূমিকে পরিপ্লাবিত করিয়াছিল। নিরাবিল আনন্দের মধ্য দিয়া যে লোকশিক্ষা ইহারা প্রচার করিয়াছিল, বাঙলার নিভৃততম পল্লীতেও তাহার বৈদ্যুত স্পন্দন সমাজকে নবজীবনে জাগ্রত করিয়াছিল। যদিও হয়তো আবশ্যক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন তখন ছিল না, তথাপি সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহারা এইরূপে লাভ করিয়াছিল, খতাইয়া দেখিলে, প্রাথমিক শিক্ষার অভাবজনিত ক্ষতি তাহাতে বহুগুণে পূরণ হইয়া গিয়াছে। এই অফুরান কাব্য-উৎস হইতে ভাবিকালের কত কবি অঞ্জলি-অঞ্জলি তীর্থবারি লইয়া পূর্ণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাব্য-কুম্ভ। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি অমর কবিকুল এই শাশ্বত রস উৎস হইতে বিন্দু বিন্দু অমৃত লইয়া রচিয়াছেন তাঁহাদের অক্ষয় মধুচক্র "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"।

মুদীর দোকান হইতে ধনীর প্রাসাদ অবধি এই পুরাণের অবাধ গতি; আবালবৃদ্ধ চিরদিন মুগ্ধ এই সুধা সঙ্গীতে। কালের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া এই সুধা তৃষিত নর-নারীর জন্য যাঁহারা আহরণ করিয়াছেন, লোক-শিক্ষক সেই ভক্ত কবিকুল আমাদের চিরনমস্য।

কত কালের কত কাব্য-কাকলী ইহাদের সহিত মিলিয়া গিয়াছে; বৈষ্ণব কবি দিয়াছে তাহার অকৈতব ভক্তির বাঙ্ময় অঞ্জলি, শাক্ত ভক্ত তাহার বীর্য ও পৌরুষ—সাহসে অটল, বিক্রমে দুর্বার, আত্মচেতনায় প্রদীপ্ত ও প্রাণবন্ত। অতীতের পটভূমিকায় একটি বিশেষ যুগের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইহাদের দেখা চলে না; ইহারা সেকালের, ইহারা চিরকালের! বিশ্বজনীন আবেদন বহন করিয়াও ইহারা বিশেষ করিয়া বাঙলার এই স্নিগ্ধ মাটির। ইহাদের মধ্যে আছে বাঙলার পল্লীবধূর সেই সলজ্জ কোমলতা, জননীর সেই আত্মবিস্মৃত ভালোবাসা, পুরুষের সেই ত্যাগসর্বস্ব জীবনাদর্শ।

[সাহিত্যসংগম]

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

পুরাণের দেশ ও কাল

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কতকগুলি পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রধান। যে-পুরাণই হউক, তাহার রচনার দেশ ও কাল না জানিলে দুর্গোৎসবের ইতিহাস সঙ্কলনের সাহায্য হয় না।

আমি এইখানে কয়েকটি পুরানের রচনার দেশ ও কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলা বাহুল্য, এই কর্ম অতিশয় কঠিন। যদি বা পুরাণ-রচনার দেশ অনুমান করিতে পারা যায়, পুরাণ-রচনার কাল অনুমান দুঃসাধ্য। কারণ পুরাণ পুরাবৃত্ত, ইহাতে স্বসময়ের বৃত্তান্ত থাকে না, পূর্বকালের বৃত্তান্ত থাকে। আর এক বিঘ্ন আছে। জনপ্রিয় গ্রন্থে নূতন-নূতন বিষয় যোজিত হয়। শ্লোক অধ্যায়, সন্দর্ভযোগ হেতু পুরাতনের সহিত নূতন মিশ্রিত হইয়া যায়।

পুরাণকর্তাকে কবি বলা যাউক। তিনি পুরাবৃত্ত রচনা করিলেও কদাপি স্বদেশ ভুলিতে পারেন না। দেখিতে হইবে, কবি কোন্ দেব বা দেবীর, কোন্ তীর্থের মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন, কোন্-কোন্ বৃক্ষ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। সকল বৃক্ষ সকল দেশে জন্মে না। কিন্তু দেখিতে হইবে, যে-যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সে-সে বৃক্ষ পুরাণের দেশের না কবির স্মৃতি। পুরাণ পুরাবৃত্ত বটে, কিন্তু কবি স্বসময়ের ও স্বদেশের আচার-ব্যবহার বর্জন করিতে পারেন না।

কাল-অনুমানের নিমিত্ত এরূপ সাহায্য অত্যল্প পাওয়া যায়। অমুক দেশে অমুক শতাব্দে এই আচার ছিল, কিম্বা পূর্বে ছিল না, পরেও ছিল না, একথা বলিতে পারা যায় না। এই পুরাণ জ্ঞাতকাল অমুক গ্রন্থের কিম্বা পুরুষের পূর্বে কিংবা পরে, এই সঙ্কেত ধরিতে হয়। বহু পুরাণ মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে তাহার কাল-অনুমানের প্রজ্ঞা জন্মে। ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ না হইলে পুরাণসকল কালানুসারে সাজাইতে পারা যাইত। মরাঠী ভাষায় শ্রীত্র্যম্বক-গুরুনাথ কালে "পুরাণ নিরীক্ষণ" লিখিয়াছেন। তিনি প্রায় অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও কয়েকখানি উপপুরাণের রচনার কাল অনুমান করিয়াছেন। আমি অতি অল্প পুরাণ দেখিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহাতে কালে মহাশয়ের মত গ্রাহ্য মনে হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পাইলাম না। দেবী ভাগবত বহু জনের আদৃত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ রঘুনন্দনের পূর্বে রাঢ়ে প্রণীত। এই দুই পুরাণেরও দেশ ও কাল চিন্তা করা যাইবে।

১। মৎস্যপুরাণ

মৎস্যপুরাণ মহাপুরাণ। মহাভারতে (বনপর্বে) বায়ু ও মৎস্যপুরাণের নাম আছে। মহাভারতের বর্তমান আকার খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরে কোথাও কিছু প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা নগণ্য। অতএব মৎস্যপুরাণ প্রাচীন বলিতে হইবে। কিন্তু মৎস্যপুরাণের বর্তমান আকার কোনও এক সময়ে আসে নাই। ইহাতে বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কোন বিষয় কবে যোজিত হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই।

মৎস্যপুরাণ মহাভারত হইতে অনেক উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতোক্ত উপাখ্যানে নূতন রূপ প্রদত্ত হইয়াছে। দুই-একটা উদাহরণ দিতেছি। মহাভারতে তারকাসুর-বধের নিমিত্ত কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ আছে, মৎস্যপুরাণে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। চৈত্র মাসের অমাবস্যায় পার্বতীর কুক্ষি ভেদ করিয়া কুমার ষড়ানন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাভারতের মতে কার্তিক অমাবস্যায় শরবনে কুমারের জন্ম হইয়াছিল। মৎস্য-পুরাণে কার্তিকেয় পার্বতীর পুত্র। মহাভারতে পার্বতী উমার নামও নাই। মৎস্যপুরাণ কুমারসম্ভব নামে কাব্য রচনা করিয়াছেন। কালিদাস তাহা অনুসরণ করিয়াছেন।

মৎস্যরূপী ভগবান্ মৎস্যপুরাণের বক্তা, বৈবস্বত মনু শ্রোতা। অতএব মৎস্যপুরাণ বৈষ্ণব পুরাণ হইবার কথা। কিন্তু বাস্তবিক ইহা শৈব পুরাণ। ইহাতে বিষ্ণুর পাঁচ দিব্য অবতার বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষ্ণুর প্রাধান্য ও আরাধনা নাই। প্রতিমা-লক্ষণে উমা-মহেশ্বরের প্রতিমা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুর হয় নাই। শুক্লা সপ্তমীতে বহুবিধ ব্রত করিতে বলা হইয়াছে। এই সকল ব্রতে দিবাকরের আরাধনা প্রথিত হইয়াছে। এই সকল ব্রত ও বহুবিধ দানের আড়ম্বর দেখিলে মনে হয়, কোন স্থানের পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজমানের অর্থ দোহন করিতে মৎস্যপুরাণে এই সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এইরূপ পুরাণের দেশ ও কাল অনুমান দুঃসাধ্য।

তথাপি মনে হয় মৎস্যপুরাণ দক্ষিণ-ভারতে প্রণীত হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণে লিখিত শ্রাদ্ধকল্প প্রাচীন। লিখিত আছে, শ্রাদ্ধে দ্রাবিড় ও কোকন ব্রাহ্মণ বর্জন করিবে (১৬)। কোকন কোঙ্কন, বোম্বাই নগর হইতে দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত পশ্চিম সাগরের উপকূল ভাগ। ইহার দক্ষিণে কেরল দেশ; বর্তমান নাম মালাবার। কেরল দেশের পশ্চিমে দ্রাবিড়। শ্রাদ্ধে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ও কোঙ্কন ব্রাহ্মণ বর্জনীয়

হইয়াছে। অতএব মনে হয় মৎস্যপুরাণ কেরল দেশে প্রণীত হইয়াছিল। কোচিন রাজ্যে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের বাস আছে। শুনিয়াছি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিম্বদন্তী এই, তাঁহাদের পূর্বপুরুষ বহুকাল পূর্বে উত্তর-ভারত হইতে সে দেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহে ও বর্ণে এখনও বৈদিকত্ব প্রমাণিত হইতেছে। শৈব ও শাক্তের বিরোধ নাই। তথাপি দ্রাবিড় দেশ শৈব দেশ, মহীশূর হইতে পশ্চিমসমুদ্র ও কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত শাক্ত দেশ বলা যাইতে পারে। কেরলে গ্রামে-গ্রামে কালীপূজা হইতেছে। নূতন হইতে পারে না। দ্রাবিড় পণ্ডিতেরা মনে করেন তাহাদের দেশ শিবপূজার আদিস্থান।

মৎস্যপুরাণে দুই-তিন স্থানে আছে, উমা বিশ্বের অরণি (জনক-জননী)। তিনি নীলোৎপলবর্ণা ছিলেন। তপস্যা করিয়া তিনি গৌরীত্ব লাভ করেন। কালিকাপুরাণ এই উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ ত্বক্ হইতে কৌশিকী মূর্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। কৌশিকী কালীমূর্তি। লিখিত আছে, এই কৌশিকী মূর্তি বিন্ধ্যাচলে প্রসিদ্ধ। বোধহয় এই কৌশিকী দেবী বিন্ধ্যাচলে বহু পুরাতন এবং ইনিই বিন্ধ্যবাসিনী। (বিন্ধ্যাচল ই. আই. রেল ষ্টেশন। সেখানে এক পাহাড়ের গুহায় দেবীমূর্তি আছে। বস্ত্রাবৃত থাকে, কেহ দেখিতে পায় না। সম্ভবতঃ অষ্টভুজা ভদ্রকালী, যিনি যশোদার কন্যা হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বিন্ধ্যাচলবাসিনী লিখিয়াছেন (১।৩৮)। মৎস্যপুরাণে দেউলের গোপুর (বহির্দ্বার) আছে। গোপুর দক্ষিণ ভারতে প্রসিদ্ধ। একস্থানে দেউলে দেবদাসীর উল্লেখ আছে, ইহাও দক্ষিণভারতের। এক স্থানে অন্যান্য ফলের সহিত তাল, নারিকেল, ও শমীর উল্লেখ আছে। তাল নারিকেল পূর্ব দিকেও আছে, কিন্তু বোধ হয় পূর্ব দিকে শমী নাই, শমী পশ্চিম দিকে আছে। এইসব কারণে মনে হয় মৎস্যপুরাণ কেরল দেশে রচিত হইয়াছিল; এই দেশ উত্তর-ভারত হইতে বহু দূরে অবস্থিত উত্তর-ভারতের প্রচলিত উপাখ্যান, বহু-দূরস্থিত দক্ষিণ-ভারতে ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কালান্তরও বিস্তর হইয়া থাকিবে।

মৎস্যপুরাণে নানা ঋষিবংশ ও রাজবংশ বর্ণিত হইয়াছে। সে-সকল বংশের বর্ণনাদ্বারা মৎস্যপুরাণের প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হইতেছে। নারদপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের সূচী আছে। আমি নারদপুরাণ দেখি নাই। শ্রীযুত কালে মনে করেন বর্তমান নারদপুরাণের পুরাণসূচী ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে বর্তমান মৎস্যপুরাণের কয়েকটি বিষয় ও ভবিষ্যৎ রাজবংশের বর্ণনা আছে। অতএব মৎস্যপুরাণ পঞ্চম খ্রিষ্ট শতাব্দে বর্তমান আকারে বিদ্যমান ছিল। মৎস্য-

পুরাণে প্রতিমা-লক্ষণ বর্ণিত আছে। প্রতিমা-লক্ষণ অধ্যায় চতুর্থ খ্রিষ্ট শতাব্দের মনে হইতেছে।

২। মার্কণ্ডেয়পুরাণ

আমরা যে মার্কণ্ডেয়পুরাণ পাইয়াছি তাহা খণ্ডিত। নারদপুরাণসূচী অনুসারে মার্কণ্ডেয়পুরাণে নয় সহস্র শ্লোক ছিল। বর্তমান বঙ্গবাসী-প্রকাশিত পুরাণে ৬৩০০ শ্লোক আছে। অবশিষ্ট ২৭০০ শ্লোকের অভাব পড়িতেছে। সে সব শ্লোকে কি ছিল তাহা নারদসূচী হইতে জানিতে পারা যায়। বর্তমান পুরাণের নরিষ্যন্ত চরিতের পর রামচন্দ্রের কথা, কুশবংশ, সোমবংশ, পুরুরবা, নহুষ, যযাতি, যদুবংশ, শ্রীকৃষ্ণবালচরিত, মাথুরচরিত, দ্বারকাচরিত, সর্বাবতার কথা ছিল। মনে হয় যেন কেহ ইচ্ছা করিয়া পুরাণের বৈষ্ণব অংশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তথাপি চতুর্থ অধ্যায়ে কবির বিষ্ণুপ্রীতি ও বাসুদেব-ভক্তি প্রকটিত আছে, কৃষ্ণের মাথুর মূর্তির উল্লেখও আছে। ইহা বৈষ্ণবপুরাণ কি শাক্তপুরাণ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সূর্যেরও এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণ সৌর কিনা তাহাও তর্কের বিষয় হইতে পারে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অনেক উপাখ্যান আছে। সে-সব উপাখ্যান অন্য পুরাণে পাওয়া যায় না। উপাখ্যান মনোহর ও হিতোপদেশপূর্ণ। চতুর্দশ মনুর উৎপত্তি, —বিশেষতঃ অষ্টম মনু সাবর্ণি মনুর উৎপত্তি অন্য পুরাণে নাই। সাবর্ণি মনু সম্পর্কে চণ্ডীমাহাত্ম্য আসিয়াছে। নারদসূচীতে উল্লেখ আছে। বোধহয় মার্কণ্ডেয়পুরাণ মৎস্যপুরাণ হইতে শুম্ভনিশুম্ভ, মধুকৈটভ ও মহিষাসুর লইয়াছেন। মহাভারত হইতে বৃক্ষ পর্যন্ত লইয়াছেন। বলরাম রৈবতক বনে নানাবৃক্ষ দেখিলেন ৬,১২-১৭)। যথা, আম্র, আম্রাতক (আমড়া), ভব্য (চালতা), নারিকেল, তিন্দুক (গাব)। "আবিল্বকান্ স্তথাজীরান্ দাড়িমান্ বীজপুরকান্।" ইত্যাদি মহাভারত বনপর্ব (যক্ষযুদ্ধপর্ব) হইতে গৃহীত।*

*মহাভারতে এই সকল বৃক্ষ গন্ধমাদন পর্বতে ছিল, মার্কণ্ডেয়পুরাণের কবি রৈবতক বনে আনিয়াছেন। গন্ধমাদন পর্বত, বর্তমান নাম করকোরম। এই সকল বৃক্ষ সেখানে অসম্ভব। মহাভারতের পাঠে 'তথা জীরান্' স্থানে অঞ্জীরান্ আছে, বিদ্বৎসমাজে তর্ক উঠিয়াছে। অঞ্জীর নাম ফার্সী, অর্থ সিরিয়া দেশের মধুর বড় ডুমুর। মহাভারতে ঐ নাম থাকা অতীব বিস্ময়কর।— মার্কণ্ডেয়পুরাণের পাঠ জীর! এই জীর বন্য ফল-তরু; জীরক (জীরা) নামক শাক নহে। জীর, কেমন তরু তাহা অজ্ঞাত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ-রচনার দেশ-নির্ণয় সহজ। ইহা বিন্ধ্যপর্বতে নর্মদা নদীর নিকটে (৪২।২)। সে দেশ অতিশয় গ্রীষ্ম। সে দেশে করম্ভ-বালুকা (বালুকার সহিত অল্প কর্দম মিশ্রিত করিয়া নির্মিত) কুম্ভমধ্যস্থ শীতল সমীরণ সুখসেব্য হইত ১৩,৫)। (বোধহয় বালিয়া মাটির কলসীতে জল রাখিয়া তাহার বায়ু বায়ুপ্রেরক যন্ত্রদ্বারা ধনাঢ্য ও সুখী ব্যক্তির দেহে প্রেরিত হইত। আমি কটকে এক মোহন্তের দুই হাত ব্যাসের তাম্র-নির্মিত বায়ু-প্রেরক দেখিয়াছি। বোধ হয় ভিতরে পাখা আছে, বাহিরে একজন ঘুরায়।) তালবৃন্ত, অনিলস্থান, চন্দন, উশীর (বেনামূল, খস্‌খস্‌) অপহরণ করিলে নরকভোগ হইত (১৪।১৮)। ঘটিযন্ত্র দ্বারা কূপ হইতে জল উত্তোলিত হইত (১১।১৬)। ধান্য, যব, গোধূম, মুদ্গ ও তিল প্রভৃতির সহিত অতসীর চাষ হইত (১৫।১৮)। সে দেশে ক্ষৌম, দুকূল, কার্পাস, বিশেষতঃ কৌশেয় ও পত্রোর্ণ পাওয়া যাইত।

এই কয়েক লক্ষণ যথেষ্ট। 'মধ্যপ্রদেশ' এই নামে দেশ বুঝিতে পারা যায় না। নাগপুর প্রদেশ বলিব। এই প্রদেশের অনেক বিশেষত্ব আছে। বঙ্গদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্র একপ্রকার আচার-ব্যবহার, একপ্রকার সংস্কৃতি, একপ্রকার ভাষা। নাগপুর প্রদেশে এই তিন বিষয়ে ঐক্য নাই। সে প্রদেশে হিন্দী ও মারাঠী, দুই ভাষা। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত নামের কোন অর্থ নাই। ব্রাহ্মণ ও কুর্মী নিরামিষাশী, অন্য সকলে আমিষাশী। পূজা বলিতে এক গণেশ-পূজা আছে, অন্য পূজা নাই, পরব আছে। নবরাত্রে পূজা নাই, ইহা এক পরব। নবরাত্র কৃষকদের পরব। তাহারা নবরাত্রের পরের দিন গোধূম বপন করে। শারদীয়া পূজার সময় পনর দিন "রামলীলা" নামক যাত্রাগান হয়। অথচ কয়েক বৎসর হইতে কোথাও-কোথাও কালীপূজা হইতেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এক বিজ্ঞ বহুতীর্থদর্শী আমায় বলিয়াছেন, তিনি গত দুর্গাপূজার মহাষ্টমীতে জব্বলপুর নগর হইতে টোঙ্গায় আরোহী হইয়া তের মাইল দূরে শ্বেত পাহাড় দেখিতে যাইতেছিলেন। পাঁচ মাইলের পর গ্রামপথে চারি-পাঁচখানি মৃন্ময়ী সিংহবাহিনী দশভুজার পূজা দেখিয়াছিলেন। বোধ হইতেছে এককালে কোথাও-কোথাও শক্তিপূজা ও তান্ত্রিক পূজা ছিল। জব্বলপুরে ষোড়শ যোগীনীর মন্দির আছে। কোন-কোন দেশীয় রাজ্যে ভৈরবীর পূজা হয়। জব্বলপুর নগর হইতে নর্মদা ছয় মাইল দক্ষিণে। এইখানে পুরাণের উৎপত্তি হইয়াছিল।

জব্বলপুরের দিকে গোধূমের চাষ হয়, কূপ হইতে ক্ষেত্রে জলসেচন হয়। কেহ কেহ ঘটিযন্ত্রদ্বারা জল তোলে। অন্য উপায়ও আছে। কবি কামরূপ

গিয়াছিলেন। সেখানে "সিদ্ধক্ষেত্রে" ভাস্করের মন্দির দেখিয়াছিলেন (১০৯।৩৯)। বিজয়নগর দেখিয়াছিলেন (৬৬।৮)। 'ময়নামতীর গানের' ও 'গোরক্ষবিজয়ে'র বিজয়নগর কদলীরাজ্য আসামে। তিনি সিদ্ধক্ষেত্রে কেন গিয়াছিলেন? তান্ত্রিক মন্ত্র শিখিতে? তিনি উচ্চাটন মন্ত্র (৭০।২২) আভিচারিক ক্রিয়া (১১৭) ও তান্ত্রিক যোগের (৩৯) উল্লেখ করিয়াছেন।

নাগপুরে প্রখর গ্রীষ্ম। ভারতের আর কোথাও তত গ্রীষ্ম হয় না। বিশেযতঃ জলের অভাবে লোকের আরও কষ্ট হয়। নদীকূলে বালিয়া মাটিতে অল্প তালগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তালবৃন্ত অল্প আসে। বাঁশের সরু চাঁচের পাখা অধিক প্রচলিত। সুখী ও ধনী লোকে খস্‌খসের পর্দা জলসিক্ত করিয়া গৃহের দ্বারে ঝুলাইয়া দেয়। বোধহয় পুরাণের কালেও এই উপায় করিত। পুরাণে নাগকুলের অনেক বর্ণনা আছে। নাগেরা মানুষ, সর্প নহে। সেই নাম হইতে নাগপুর নাম হইয়াছে। পুরাণের কালে অতসীর চাষ হইত, অংশু দ্বারা ক্ষৌম ও দুকূল নির্মিত হইত। এই দুই যন্ত্র চারি শত বৎসর অজ্ঞাত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে নাগপুর প্রদেশে ক্ষুমার নিমিত্ত অতসীর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। নাগপুর প্রদেশে কৌশেয় (তসর) উৎপন্ন হয়, কিন্তু পত্রোর্ণ (সাদা তসর) হয় কিনা, সন্দেহ। গঙ্গা ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যভাগে, বিশেষতঃ ছোট-নাগপুরে—যেমন চাইবাসায়, তসরের উৎপত্তি।*

এই পুরাণে অগ্নিশুচি বস্ত্রের উল্লেখ আছে (৮৫।৫২), যে বস্ত্র অগ্নিদ্বারা শুদ্ধ হয়। সে কি বস্ত্র যাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না? অগ্নির অস্পৃশ্য বস্ত্র একটি আছে। ইংরেজী নাম **Asbestos.** মিশর দেশের পুরোহিতেরা এই বস্ত্র পরিধান করিতেন। বোধহয় সেই দেশ হইতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেশে আসিয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অগ্নির অস্পৃশ্য বস্ত্রের উল্লেখ বহু স্থানে আছে।

* নাগপুর প্রদেশের রাইপুরের কার্যান্তক ইঞ্জিনিয়র রায় সাহেব শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের নিকট হইতে নাগপুর প্রদেশের অনেক বিবরণ পাইয়াছি। এইরূপ শ্রীহট্টের কার্যান্তক ইঞ্জিনিয়র শ্রীরাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণের নিকট হইতে কামরূপের অনেক বিবরণ পাইয়াছি। ইঞ্জিনিয়রকে নানা স্থান ঘুরিতে হয়, চোখ কান খুলিয়া রাখিতে হয়। এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনিয়র রায়সাহেব শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাস দর্শনে গিয়াছিলেন। হিমাবৃত মানস সরোবরে স্নান ও রজতোজ্জ্বল কৈলাস গিরি বিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে না শুনিলে মুঞ্জবান্ পর্বতের সে পারে রুদ্রের আলয় আমার মানস নেত্রে স্পষ্ট হইত না।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকালে রাজা বিক্রমাদিত্যের তালবেতাল নামক নিশাচর প্রসিদ্ধ হইয়াছিল (৭১)। ফলজ্যোতিষ (৭২), মেষাদি রাশি (৫৮) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বালকৃষ্ণচরিত ইত্যাদি চিন্তা করিলে পঞ্চম খৃষ্ট শতাব্দ মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল মনে হয়।

৩। দেবীপুরাণ

দেবীপুরাণ উপপুরাণ। ইহাতে দেবীর পূজাবিধি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, অন্য কথা প্রায় নাই পুরাণের প্রথম কয়েক পাতা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, এক রাজগুরু রাজাকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত এই পুরাণ লিখিয়াছিলেন। তিনি গুরুপূজাবিধিও দিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন রাজার পোষকতায় উপপুরাণের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তিনি নানা ছন্দে শ্লোক রচনা করিয়াছেন; তান্ত্রিক মন্ত্র ও কবচ প্রকাশ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন স্মার্তাচার্য দেবীপুরাণ হইতে অনেক গুরুতর প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। যেমন 'ইষে মাস্যমিতে পক্ষে' ইত্যাদি ইষ মাসে আশ্বিন মাসে কৃষ্ণ-নবমীতে বিল্বশাখায় দেবীর বোধন। বর্তমান বঙ্গবাসী প্রকাশিত দেবী-পুরাণে সে সব শ্লোক নাই। এক স্থানে (৮৯) আছে আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্ল-নবমী পর্যন্ত সর্বমঙ্গলার পূজা করিবে। এখানে বোধন কিম্বা পত্রী-প্রবেশের উল্লেখ নাই। আশ্বিন শুক্ল-অষ্টমী ও নবমীতে দেবীপূজা (২১), আশ্বিন শুক্লপ্রতি-পদ হইতে নবমী পর্যন্ত পূজা (২২) বিহিত হইয়াছে। ইহার সহিত পুরাতন বিধির বিরোধ হইতেছে।

পুরাণের দেশ নর্মদা ও বিন্ধ্যপর্বতের নিকটবর্তী। সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ শৈব ছিলেন (১০০)। নিকটে জৈনেরা থাকিত। কবি তাহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়াছেন (১৩।১০)। উষ্ট্র এক যান ছিল। ঘটিযন্ত্র দ্বারা কূপ হইতে জল উত্তোলিত হইত (৩৩।৭)। শমী কাষ্ঠের অরণি হইত। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে বর্বর, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির বাস ছিল। তাহারা বামাচারে দেবী পূজা করিত। তাহাদের দেহ কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা গুঞ্জাবীজের আভরণ পরিধান করিত। দ্রোণ, বিল্ব, আম্র,* জাতি, নাগ ও চম্পকপুষ্পে পূজার বিধি ছিল। সে দেশে নাগরাক্ষর প্রচলিত ছিল না (৯১।৫৩)। এই সকল লক্ষণ

*শরৎকালে আমের মুকুল কোথায় দেখা যায়? রঘুনন্দনধৃত ভবিষ্যপুরাণে দেবীকে আম্রফল দিতে বলা হইয়াছে। ইহা কি দো-ফলা আম?

হইতে মনে হয় এই দেশ বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে, রাজপুতনার দক্ষিণে অবস্থিত। বোধহয় উজ্জয়িনী এই পুরাণের দেশ (৩২)।

এই পুরাণ রচনার কাল অনুমানের কয়েকটি ক্ষীণসূত্র পাওয়া যায়, এই পুরাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরবর্তী। কারণ ইহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত 'সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে' ইত্যাদি নামের নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে (৩৭)। আরও লিখিত আছে, দেবী মহিষের বধার্থে দেবগণের তেজে পরিবৃত হইয়া জ্বালামালা সদৃশী (১৪২)। তিনি মহাদেবের তেজোময় শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় তেজে জ্বলন্তী। কালরাত্রি মহামায়া দীপ্তকাঞ্চনসপ্রভাতা (১২৭)। এই পুরাণে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের কারণ বিচারে বরাহমিহিরের অনুকরণ আছে। পুরাণের নানাস্থানে নক্ষত্র তিথি করণের নাম আছে কিন্তু যোগের উল্লেখ নাই। (অষ্টম খ্রিষ্টশতাব্দে যোগ গণনা আসিয়াছে।) পুরাণকালে হূণ জাতি ভারতে আসিয়াছিল। একাদশ অবতারের নাম, যথা—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি (৬), অর্থাৎ তৎকালে দশ অবতার গণনা বিধিবদ্ধ হয় নাই। বোধহয় দেবীপুরাণে সপ্তম খ্রিষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল।

এই পুরাণ মতে দেবী উগ্রসেন পুত্র কংসকে নিহত করিয়াছিলেন (১০২)। গজাননের উৎপত্তি নূতন। বিষ্ণু স্বীয় পাণিতল মন্থন করিয়া গজাননের সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১১২)। গণেশ মূর্তির বাম হস্তে পরশু ও মোদক, দক্ষিণ হস্তে অক্ষসূত্র ও অভয়দান অথবা দণ্ড ও মৎস্য (৫০।৩৯)। মূর্তির দক্ষিণ ভাগে রতি নাম্নী সুরূপা যুবতী মূর্তি। মহালক্ষ্মী কপাল-ধারিণী, নৃত্যমানা, হস্তে মুণ্ড ও খট্টাঙ্গ (৫০।৫২)। দেবীর রথযাত্রা ও দোলযাত্রা (২১) কোন পুরাণে নাই। একটা উৎসব করিতে হইবে, এই ভাবিয়া রথযাত্রা (৩১) আসিয়াছিল। এইরূপ নানাবিধ বিচিত্র কথা আছে।

কবি মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও মহাভারত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কবি মন্ত্রতন্ত্রের বহু প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু গারুড়ীর নিন্দা করিয়াছেন। (গারুড়া মন্ত্র দ্বারা সর্পবিষ নষ্ট হয়)। কবি লিখিয়াছেন, পুলিন্দ, শবরাদি জাতি অষ্টবিদ্যা দেবীর বামাচারে পূজা করে। হূণদেশে, বরেন্দ্রে, রাঢ়দেশে, ভোট্রদেশে, কামাখ্যায়, উজ্জয়িনীতে, ইত্যাদি স্থানে অষ্টবিদ্যাদেবীর অধিষ্ঠান আছে (৩৯।১৪৩-১৪৫)। "গুরু ভিন্ন আর কেহ সংসার হইতে নিস্তার করিতে পারে না।" এই পুরাণে সেই গুরু বহু ধন-রত্ন ব্যয়ে বিবিধ রূপধারিণী দেবীর পূজা প্রচার করিয়াছেন। পুরাণে নবরাত্রের উল্লেখ নাই। প্রতিমায়, পটে কিম্বা শূল খড়্গা বা

পাদুকায় পূজা বিহিত হইয়াছে। বোধহয় পুরাণের কালে ও দেশে নবরাত্র ব্রত প্রবর্তিত ছিল না। আশ্বিন কৃষ্ণনবমী হইতে শুক্লনবমী পর্যন্ত পূজায় নবরাত্র আসিতে পারিত না। কবি কতগুলি পীঠস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ওড্রদেশ (ওড়িষ্যা), স্ত্রীরাজ্য (কেরল), কামরূপ, উড্ডিয়ান (আসাম) ও বরেন্দ্র নাম আছে (৪২।৮,৯)।

৪। কালিকাপুরাণ

কালিকাপুরাণ এক উপপুরাণ। পুরাণ হইতে উপপুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণ মতে উপপুরাণ ব্যাসপ্রোক্ত নহে। ঋষির নাম না করিলে উপপুরাণ আদরণীয় হয় না। এই কারণে উপপুরাণের বক্তারূপে কোন দেব বা ঋষির নাম করা হইয়া থাকে। এইরূপে মার্কণ্ডেয় মুনি কালিকাপুরাণের বক্তা হইয়াছেন। রাজার আশ্রয় ব্যতীত উপপুরাণ লিখিত সদাচার, নীতিশাস্ত্র পূজাবিধি প্রভৃতির বর্ণনার সার্থকতা থাকে না। কালিকাপুরাণ কামরূপে কোন রাজার অভিমতে রচিত হইয়াছিল।

কালিকাপুরাণ পাঠ করিলে মনে হয় ইহার কবি গ্রহবিপ্র ছিলেন। গ্রহ-বিপ্রেরা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশে আচার্য নামে খ্যাত। কবি জ্যোতিষ চর্চা করিতেন। দৈবযুগ ও মানুষ যুগ, যুগ গণনার দুই ক্রম আছে। দুই যুগের পরিমাণে বহু অন্তর। কালিকাপুরাণে যেখানে কোন ঘটনার উল্লেখ আছে, সেইখানেই কবি মানুষ যুগের উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষযুগ মানুষের ব্যবহার-যোগ্য। কবি সেই যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, দৈবযুগের করেন নাই। কবে দক্ষের কতগুলি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কবি লিখিয়াছেন, মানুষ ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে (২২।১৩)। কবে পার্বতীর জন্ম হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বসন্ত কালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমী তিথিতে অর্ধরাত্রে পার্বতীর জন্ম হইয়াছিল (৪১)। অর্থাৎ সৌর চৈত্রমাস প্রবেশের দিন। তিনি চৈত্র-বৈশাখ বসন্ত গণিয়াছেন। কবে শিব-পার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বৈশাখ মাসে পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে, যেদিন সূর্য ভরণী-নক্ষত্রে প্রবেশ করেন (৪৪।৪৬)।*

* গণিত দ্বারা জানিতেছি ইহা খৃষ্ট-পূর্ব ৫৭১ অব্দে মহাবিষুব সংক্রান্তির পরদিন ও চন্দ্র নক্ষত্র আর্দ্রার পরদিন, বর্তমান পাঁজির ১৩ই বৈশাখ। আশ্চর্যের বিষয় বাঁকুড়ায় বিশেষত বিষ্ণুপুরে মহাজনেরা সেদিন নূতন খাতা খুলেন। সেদিন তাঁহাদের 'হালখাতা'। এক উপাখ্যানে আছে, সেদিন ধর্মপূজা-প্রবর্তক রামাই পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার ডোমশিষ্যরা ১৩ই বৈশাখ পুণ্যদিন মনে করে।

কামরূপের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, যেহেতু পুরাকালে ব্রহ্মা, কামরূপে থাকিয়া নক্ষত্রচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন (৩৮।১১৯)। এই ব্যাখ্যা সত্য নহে। মহাভারতে ও রামায়ণে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দিক্ নির্ণয় আছে। সে-দেশ শাকদ্বীপে, পেশোয়ারের উত্তরে, দিল্লীর পশ্চিমোত্তরে বোধহয় বর্তমান চিত্রল নামক স্থানে ছিল। কবি স্বয়ং জ্যোতিষী না হইলে, শাকদ্বীপী না হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামের এই কাল্পনিক উৎপত্তি জানাইতে প্রয়াসী হইতেন না। মহাভারতে ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ছিলেন। কামরূপের এক বিখ্যাত রাজবংশ তাম্রশাসনে ভগদত্তবংশ নামে কীর্তিত হইয়াছে। বোধহয় এই রাজবংশের পূর্ব-পুরুষ আর্যেতর জাতি ছিলেন। ভগদত্তের পিতার নাম নরক। নরক দুইটি, একটি স্বর্গীয়, অপরটি ভৌম। স্বর্গীয় নরক বলির ন্যায় এক দৈত্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে। দেবী পুরাণে নরক যমের অনুজ। ভৌম নরক ভূমি জাত, ভূমিজ, মৃত্তিজ, অর্থাৎ যে অন্য দেশ হইতে আসে নাই। কবি দুই নরককে অভিন্ন মনে করিয়া ভৌম নরকের পিতা বরাহরূপী বিষ্ণু এবং মাতা পৃথিবী বলিয়াছেন। এইরূপে কবি স্বীয় প্রতিপালক রাজার মহত্ত্ব বাড়াইয়াছেন। তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পরে দিতেছি।

কালিকাপুরাণকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম ভাগে পুরাণ, দ্বিতীয় ভাগে কামরূপের মাহাত্ম্য ও পূজাবিধি। রঘুনন্দন দুইখানা কালিকাপুরাণ পাইয়াছিলেন। তিনি একখানিকে 'দুষ্প্রাপ' বলিয়াছেন। তাহা হইতে প্রমাণ-উদ্ধার করিয়াছেন, সে পুরাণ লুপ্ত হইয়াছে। সে প্রমাণ পূজা-বিধির। বোধ হয় পুরাণের প্রথম ভাগে পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তনের কারণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় ভাগে দেবদেবীর ও কামরূপের বিশেষ-বিশেষ স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির নিমিত্ত পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারিত। একটা উদাহরণ দিতেছি। মাঘ শুক্ল পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী। এক স্থানে আছে সেদিন শিবার পূজা করিবে (৫১।২৫)। অন্য দুই স্থানে আছে লক্ষ্মীর পূজা করিবে (৮৫।১০, ৮৮।২২)। দুইটিই পূজাবিধির ভাগে আছে।

উপাখ্যান ভাগের সহিত পূজাবিধি ভাগের ঐক্য নাই প্রথম ভাগে লবঙ্গলতা যুথীর নাম (১০।৪২), দ্বিতীয় ভাগে লবঙ্গলতা না হইয়া যুথী নাম আছে (৬৯।৫৯)।

কবি প্রথম ভাগে মৎস্যপুরাণ হইতে হর-পার্বতীর বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর মৎস্যাবতার, দশভুজাদেবীর রূপ ইত্যাদি, মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে দেবীর স্বরূপ বর্ণনা,

"সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে" ইত্যাদি শ্লোক, দেবীপুরাণ হইতে "জয়ন্তী মঙ্গলা কালী" ইত্যাদি মন্ত্র ও পূর্ণিমান্ত আশ্বিন মাস গণনা ও আশ্বিন কৃষ্ণনবমীতে দেবীর পূজা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব কালিকাপুরাণ দেবীপুরাণের পরে রচিত হইয়াছিল। কত পরে তাহা বলা কঠিন। কালিকা-পুরাণের ভাদ্র কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দেবীর আবির্ভাব হইতে মনে হয় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মাহেশ্বর যুগের পর কালিকাপুরাণ রচিত হইয়াছিল। এই অনুমান অভ্রান্ত নয়। কারণ দেবীপুরাণেও কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দেবীর পূজা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালিকা-পুরাণে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল প্রমাণ একত্র করিলে কালিকা-পুরাণ অষ্টম খৃষ্টশতাব্দের বলিতে হইতেছে। কত বৎসর ইহাতে নূতন বিষয় যোজিত হইয়াছে তাহা বলা আরও কঠিন। দ্বিতীয় ভাগে (৮৮/৭০) বিষ্ণু-ধর্মোত্তরের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ অষ্টম খৃষ্টশতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে বর্তমান কালিকাপুরাণ অষ্টম হইতে একাদশ খৃষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল। সপ্তম হইতে দশম খৃষ্টশতাব্দ পর্যন্ত আসামে শালভঞ্জ বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজার নিমিত্ত রাজনীতি, দুর্গ নির্মাণ, পুষ্য স্নানাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি শ্রীহর্ষদেব (৭৩০-৭৫০ খৃষ্টাব্দে) প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। বোধহয় কবি এই রাজার পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতের জ্ঞাতব্য পূজার যাবতীয় উপচার ও পূজাবিধি এই পুরাণে বর্ণিত আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হোম ও যজ্ঞের বিধি নাই। তৎকালে ক্ষৌমবস্ত্র দুর্লভ হইতেছিল, শাণ (ভঙ্গার অংশু দ্বারা নির্মিত) বস্ত্র সুলভ ছিল (৬৮।১২)।

৫। দেবীভাগবত

বঙ্গদেশে দেবী ভাগবতের তাদৃশ প্রচার নাই। দক্ষিণ-ভারতে শৈবদিগের মধ্যে ইহা এক প্রামাণিক গ্রন্থ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ দেবী ভাগবতেরও টীকা লিখিয়াছিলেন।

বিষ্ণুভাগবত বঙ্গদেশে শ্রীমদ্ভাগবত নামে খ্যাত। বহুকাল হইতে একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে, বিষ্ণুভাগবত ও দেবী ভাগবত, এই দুই ভাগবতের মধ্যে কোন্‌টা পুরাণ কোন্‌টা উপপুরাণ।

বৈষ্ণবদিগের মতে বিষ্ণু ভাগবতই পুরাণ, দেবী ভাগবত উপপুরাণ। শাক্তদের মতে ঠিক বিপরীত। কোন-কোন পুরাণও দেবী ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের

মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রীযুত কালে তাঁহার 'পুরাণ নিরীক্ষণে' দুই ভাগবতের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক মত তুলিয়াছেন। এখানে সে-সব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দুই তিন প্রকারে উক্ত তর্কের নিরাশ করা যাইতে পারে। (১) কোন্ ভাগবতে পুরাণের লক্ষণ আছে, কোন্ পুরাণে নাই? (২) কোন্ ভাগবতের ভাষায় প্রাচীনতা দৃষ্ট হয়, কোন্ ভাগবতে হয় না? (৩) কোন্ ভাগবত পরে রচিত হইয়াছিল? এই তিন তর্ক যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমার বোধ হইয়াছে বিষ্ণু'—ভাগবতই পুরাণ, দেবী ভাগবত উপপুরাণ।

বিষ্ণুভাগবত স্কন্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত। দেবী ভাগবতও স্কন্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত, উভয়েই দ্বাদশ স্কন্ধ। কবির মতে দেবী ভাগবত পুরাণ, বিষ্ণুভাগবত উপপুরাণ। তিনি উপপুরাণের নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভাগবত, কালিকাপুরাণ, নন্দিপুরাণের নাম আছে (১৩।১৫)। অর্থাৎ কবি তাঁহার পুরাণকে উক্ত তিন পুরাণের পরে আনিয়াছেন। এই শ্লোক পরে যোজিত মনে করিবার হেতু নাই।

কবি নানাবিধ ছন্দে তাঁহার পুরাণ লিখিয়াছেন কিন্তু ভাষায় গাঢ়তা নাই। তিনি অনেক পুরাণ পড়িয়াছিলেন এবং সে-সকল পুরাণ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে মহিষাসুর বধ (৫ম স্কন্ধ), ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভূলোকে অবতার, তুলসীর উপাখ্যান (৯ম স্কন্ধ), বিষ্ণু-ভাগবত হইতে বৃত্রাসুর বধ, বোধহয় দেবীপুরাণ হইতে সারস্বত বীজ (৩/১১) গৃহীত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে কৃষ্ণ অবতার ইত্যাদি, মহাভারত হইতে রামায়ণ সংগ্রহ আশ্চর্যের বিষয় নহে, কিন্তু কালিকাপুরাণের অনুকরণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী পূজা লিখিত হইয়াছে। যজ্ঞকর্মে পশু-বধ অহিংসা। ইহাও দেবী-পুরাণ ও কালিকাপুরাণের অনুকরণ। বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের "যুদ্ধং বেদে প্রসিদ্ধঞ্চ তথা পুরাণে" (৬।২)। এখানে কবি আপনাকে বিষ্ণুভাগবতের পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষ্ণুভাগবতের এক লক্ষণ। কবির সময়ে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল (৯।৩৬)। ইহাও তাঁহার অর্বাচীনত্বের প্রমাণ, শ্রীযুত কালে লিখিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী দেবী ভাগবতের নাম করিয়াছেন। তিনি একাদশ খৃষ্টশতাব্দে ছিলেন। এই সকল কারণে মনে হয় দশম খৃষ্টশতাব্দে এই পুরাণ রচিত হইয়াছিল।

কাশী কিংবা নিকটস্থ কোন স্থান দেবী ভাগবত রচনার দেশ। কাশীর এবং কোশলের কয়েকটি উপাখ্যান এই পুরাণে নূতন। বিষ্ণুভাগবত দক্ষিণ-ভারতে, দেবী ভাগবত উত্তর-ভারতে প্রণীত হইয়াছিল। কবি নবরাত্র ব্রতবিধি

আনুপূর্বিক লিখিয়াছেন (৩।২৬)। বসন্ত ও শরৎ দুই ঋতু যমদ্রংষ্ট্রা। চৈত্র ও আশ্বিন দুই মাসেই দেবী পূজা কর্তব্য। "পুরাণং পঞ্চলক্ষণং" কবি এই পুরাণ পঞ্চ লক্ষণান্বিত করিয়াছেন। কবি বৈদিক গ্রন্থ হইতেও পুরাবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। এই একখানি পুরাণ পাঠ করিলে বহু পুরাণ পাঠের ফল লাভ হইবে, এই ভাবিয়া রচিত হইয়াছে।

৬। বৃহদ্ধর্মপুরাণ

বৃহদ্ধর্মপুরাণ একখানি উপপুরাণ। ইহা রাঢ়ে গঙ্গার নিকটস্থ হুগলী জেলায় রঘুনন্দনের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখের 'ভারতবর্ষে' 'পুরাণে রাঢ়ের ইতিহাস' ইতি নামে এক প্রবন্ধে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' হইতে ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলাম। আমরা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে কালকেতু ব্যাধের, উজানী নগরের শ্রীমন্ত সদাগরের ও কালীদহে কমলে কামিনী আবির্ভাবের পুরাণ পাঠ করি। সে-পুরাণ এক-এক শ্লোকে বৃহদ্ধর্মপুরাণে আছে। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র এই পুরাণ হইতে দক্ষযজ্ঞ নাশ ও আরও কতিপয় বিষয় লইয়াছেন।

পুরাণখানি পূর্ব, মধ্য ও উত্তর এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। পূর্বখণ্ডে তৎকাল প্রচলিত দেবদেবীর পূজার ও ব্রত আচরণের দিন নিরূপিত হইয়াছে। রঘুনন্দনে অধিক আছে। কোন কোন পূজায় প্রভেদ ঘটিয়াছে। একটা উদাহরণ দিতেছি। রঘুনন্দন মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিতে বলিয়াছেন। এই পুরাণের কবি সেদিন শিবা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কালিকাপুরাণের এক স্থানে শিবার, অন্য স্থানে লক্ষ্মীর পূজা বিহিত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই দুই দেবীর সহিত সরস্বতী আসিয়াছেন। সরস্বতীর প্রতিমাতে প্রভেদ ছিল। এই পুরাণে সরস্বতী শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা ও ত্রিনেত্রা। তাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা, হস্তে সুধা বিদ্যা মুদ্রা অক্ষমালা (পূঃ ১৫, পূঃ ২৫।২৯) চৈত্রশুক্ল পঞ্চমী আর এক শ্রীপঞ্চমী (পূঃ ১৬)। সেদিন লক্ষ্মী পূজা।

কবি, কালিকাপুরাণ মতে দুর্গোৎসবের প্রমাণ কিছু মানিয়া কিছু ছাড়িয়া রাম-রাবণের যুদ্ধকালের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন শ্রাবণ মাসে সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা হয়, এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় সুগ্রীব ভল্লুক ও বানরগণ আনাইয়া এক মাসের সময় দিয়া সীতা অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন (পূ. ১৯)। (বাল্মীকি রামায়ণে আছে চারিমাস বর্ষার পরে যখন আকাশ সলিল নির্মল হইয়াছিল,

অর্থাৎ শরৎকালে সুগ্রীব দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবি শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন কার্তিক, এই চারি মাস বর্ষা ধরিয়াছেন। অতএব অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার পর পৌষমাসে রাম-রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল।) সেই কবিই লিখিয়াছেন, রাম ভাদ্র পূর্ণিমার পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমান্ত আশ্বিন কৃষ্ণ প্রতিপদে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন (পৃ. ২১।২১)। সেদিন হইতে রাক্ষস ও বানরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবীর অনুগ্রহ লাভার্থ আর্দ্রা নক্ষত্রসংযুক্ত কৃষ্ণনবমীতে বিল্ববৃক্ষে বোধন করিলেন। আশ্বিন শুক্ল নবমীর অপরাহ্নে রাবণ ধরাতলে পতিত হইল।

কবি বিধান দিয়াছেন, বোধনের দিন হইতে ষষ্ঠী পর্যন্ত ত্রয়োদশ দিবস বিল্বশাখায় পূজা করিবে। সপ্তমীতে সে-শাখা গৃহে আনিয়া দিবসত্রয় পূজা করিবে। পনর (ষোল) দিন পূজা করিতে না পারিলে অষ্টমী, নবমী কিম্বা নবমীতে পূজা করিবে। কবি এক রাজার সভাপণ্ডিত কিম্বা গুরু ছিলেন। সে রাজ্যে নিশ্চয় উক্ত বিধি অনুসারে দুর্গার অর্চনা হইত। আশ্বিন শুক্ল ষষ্ঠী সায়ংকালে বোধন হইত না, পত্রী প্রবেশ হইত না, বোধহয় দুর্গার প্রতিমাও নির্মিত হইত না।

পুরাণের উত্তর খণ্ড হইতে জানিতে পারিতেছি কবির কালে রাঢ়ে হিন্দু-রাজ্য ছিল, পরিখা খনন দ্বারা দুর্গ নির্মিত হইত। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ বিভাগ ছিল, অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। তৎকালে যবনের বলবৃদ্ধি হইতেছিল। কেহ-কেহ যবন সংসর্গ করিত, যবন ভাষায় কথা কহিত। এইসব লক্ষণ হইতে মনে হইতেছে পুরাণখানি চতুর্দশ খৃষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল।

[প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৫৩]

রমেশচন্দ্র দত্ত

হিন্দু দর্শন

আমাদের দেশে দর্শনাশাস্ত্র বিজ্ঞানে দুইটি শ্রেণী বিভাগ আছে—আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন। যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করেন তাঁহারা আস্তিক, যাঁহারা করেন না তাঁহারা নাস্তিক বলিয়া কথিত। ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়টি সুপ্রসিদ্ধ দর্শন আস্তিক দর্শন। চার্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত প্রভৃতি কয়েকটি নাস্তিক দর্শন।

১। **বৈশেষিক দর্শন**—কণাদমুনি বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। বৈশেষিক দর্শনের সূত্রগুলি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক আছে। শিষ্যগণ প্রতিদিন যেটুকু অভ্যাস করিতে পারিবে, সেইটুকুকে এক একটি আহ্নিক বলা হইয়াছে।

বৈশেসিক দর্শনানুসারে পদার্থ সপ্ত প্রকার, যথা :—

দ্রব্য	···	Substance
গুণ	···	Quality
কর্ম	···	Action
সামান্য	···	Community
বিশেষ	···	Particularity
সমবায়	···	Coherence
অভাব	···	Nonexistence

ইহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার—পঞ্চভূত এবং কাল, দিক, আত্মা এবং মন। কণাদের মতে, পঞ্চভূতের সকলগুলিই পরমাণুর সমষ্টি। মৃত্তিকা পরমাণুর সমষ্টি পৃথিবী, জলীয় পরমাণুর সমষ্টি জল, ইত্যাদি। পৃথিবী ও জল অনিত্য, পার্থিব ও জলীয় পরমাণু নিত্য। শুধু পরমাণুরই উৎপত্তি ও বিনাশ নাই—পরমাণু সমষ্টির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের Atoms এবং আমাদের পরমাণু একই পদার্থ। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য Atomic Philosophy, আমাদের বৈশেষিক দর্শন ভিন্ন আর কিছু নহে।

পঞ্চভূত ভিন্ন আর যে-চারিটি দ্রব্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মনই প্রধান। মন অর্থে অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়। যদ্দারা আমরা বহির্বিষয় উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই মন।

দ্বিতীয় পদার্থ গুণ, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব ইত্যাদি।

গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থে যে-সকল তর্ক-বিতর্ক দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি হিন্দু পণ্ডিতগণের নিকট সুপরিচিত ছিল।

২। **ন্যায়দর্শন**—ন্যায়দর্শন প্রণেতাকে কেহ বলেন গৌতম, কেহ বলেন গোতম। ন্যায়দর্শনের মতে আত্যন্তিক দুঃখ-ধ্বংসই মুক্তি। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকিলে দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ অসম্ভব, সুতরাং সে-সম্বন্ধ ছিন্ন করাই মুক্তির উপায়। আত্মা সুখ দুঃখ ও জ্ঞানাদি সম্পর্ক পরিশূন্য হইলে মৃত্তিকা বা পাষাণের ন্যায় জড়পদার্থবৎ হইয়া পড়ে, এই বিবেচনা করিয়া নাস্তিক শিরোমণি চার্বাক আস্তিকদিগকে উপহাস করিয়া বলিতেছেন :-

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা চিত্তং তথৈব সঃ॥

যে মহামুনির শাস্ত্রানুসারে মুক্তির অবস্থা প্রস্তরাদির অবস্থার তুল্য তাঁহাকে তোমরা গোতম বলিয়া ত জানই, তিনি গো-তম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গোরুও বটেন।

গ্রীসদেশে ন্যায়দর্শন বা **Logic** প্রণীত হইবার পূর্বেই ভারতবর্ষে এই দর্শন প্রণীত হইয়াছিল।

ন্যায়দর্শনের সূত্রসংখ্যা সম্বন্ধে একটু বিবাদ আছে। ন্যায়দর্শনে সচরাচর ৫৪৭টি সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ন্যায়দর্শন অনুসারে পদার্থ ষোল প্রকার, যথা :—

প্রমাণ—**Proof**
প্রমেয়—**The thing to be proved**
সংশয়—**Doubt**
প্রয়োজন—**Motive**
দৃষ্টান্ত—**Instance or example**
সিদ্ধান্ত—**Determined truth**
অবয়ব—**Argument or Syllogism**
তর্ক—**Confutation**
নির্ণয়—**Ascertainment**
বাদ—**Controversy**
জল্প—**Jaugling**
বিতণ্ডা—**Objection**

হেত্বাভাষ—**Fallacy**

ছল—**Perversion**

জাতি—**Futility**

নিগ্রহস্থান—**Defeat**

পাশ্চাত্ত্য ন্যায়শাস্ত্রে যাহাকে আমরা **Syllogism** বলি—তাহাও হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রে স্পষ্ট দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য ন্যায়শাস্ত্রে তিনটি মাত্র পদ, হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রে পাঁচটি, যথা :—

১। প্রতিজ্ঞা······পর্বতে অগ্নি আছে।

২। হেতু······কারণ ধূম উঠিতেছে।

৩। উদাহরণ ···যেখানে ধূম উঠে, সেখানেই অগ্নি আছে যথা চুল্লী।

৪। উপনয়······পর্বতে ধূম উঠিতেছে ;

৫। নিগমণ······সুতরাং পর্বতে অগ্নি আছে।

ইহার মধ্যে প্রথম দুটি পদ বাদ দিলেই ঠিক অ্যারিস্টটল কৃত **Syllogism** হইল। এই **Syllogism** প্রণালী ভারতবর্ষ হইতে গ্রীকরা প্রাপ্ত হইয়াছিল অথবা আমরা গ্রীকদের নিকট ঋণী? পণ্ডিত প্রবর গরেস্ (**Gorres**) লিখিয়াছেন যে গ্রীকগণ কেবল যে **Syllogism** হিন্দুদের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে, ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি পরিভাষাও (**Techinal terms**) হিন্দুদের নিকট প্রাপ্ত। ইতিহাস লেখক নীবর (**Neibuhı**) বলেন যে হিন্দুগণ গ্রীকদের নিকট এই দর্শন পাইয়াছে। মোক্ষমূলর তাঁহার হিন্দু দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে সম্ভবত উভয় জাতিই স্বতন্ত্রভাবে নিজ-নিজ ন্যায়দর্শন আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এ-মতটি সন্তোষজনক নহে। অ্যারিস্টটলের দুই তিন শত বৎসর পূর্বে হিন্দু ন্যায়দর্শন প্রণীত-হইয়াছিল সুতরাং ইহা গ্রীকগণই যে আমাদের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

৩। সাংখ্যদর্শন—মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রথমাচার্য। তাঁহার প্রণীত সাংখ্যদর্শন "তত্ত্ব সমাস" নামে আখ্যাত। কিন্তু সে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। সুতরাং "সাংখ্য প্রবচন", "সাংখ্যকারিকা" প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থে এই দর্শন বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। "সাংখ্যকারিকা" অতি সুন্দর গ্রন্থ, ইহা ইউরোপীয় প্রায় সমস্ত ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনেরও লক্ষ্য ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ। এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ হইলেই মুক্ত হইল। এই ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশ কি উপায়ে হইতে

পারে ? বিবেক জ্ঞানই তাহার একমাত্র উপায়, সেইজন্য বিবেক জ্ঞান সম্পাদনই সাংখ্যদর্শনের চরম লক্ষ্য।

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, অধিকন্তু ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন কি না, এই লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মহাবিবাদ। বাচস্পতি মিশ্র, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতির মতে সাংখ্যকার নিরীশ্বরবাদী ঃ।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে পদার্থ ২৫ প্রকার, যথা—

প্রকৃতি—**Primal matter**

পুরুষ—**Soul**

বুদ্ধি—**Judgement**

অহঙ্কার—**Consciousness**

মন—**Internal organ**

(পঞ্চ) তন্মাত্র—**(5) Subtle elements**

(পঞ্চ) ভূত—**(5) Gross elements**

(পঞ্চ) কর্মেন্দ্রিয়—**(5) Organs of action**

(পঞ্চ) জ্ঞানেন্দ্রিয়—**(5) Organs of Senses**

এই পঞ্চবিংশতি পদার্থ ভাল করিয়া না বুঝিলে সাংখ্যদর্শন আয়ত্ত করা সম্ভব হইবে না।

প্রকৃতি কি ? যে জড় আদিম পদার্থ হইতে জগতের উৎপত্তি তাহারই নাম প্রকৃতি। তাহা চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর। এ-সম্বন্ধে দেখা যায় বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শনের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। বেদান্তদর্শনের অনুসারে ব্রহ্মণ বা আত্মনই সর্ব বিশ্বের হেতু। ব্রহ্মই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন; ব্রহ্মেই সমস্ত লীন হইবে। কিন্তু সাংখ্যদর্শন মতে মূল পুরুষ ভিন্ন মূল প্রকৃতিও চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর অতএব বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদী, সাংখ্যদর্শন দ্বৈতবাদী।

পুরুষ কাহাকে বলে ? যে আত্মা স্বরূপ প্রকৃতির সহিত লিপ্ত হইয়া জ্ঞান লাভ করে এবং জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয় সেই পুরুষ। এ-বিষয়েও বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শন মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। বেদান্তদর্শন অনুসারে ব্রহ্ম বা আত্মা একটি মাত্র; সাংখ্যদর্শন মতে পুরুষ পৃথক্-পৃথক্। প্রত্যেক পুরুষ মুক্তিলাভ করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন রূপে চিরকাল বাস করিবে।

বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন কাহাকে বলে ?

যাহার দ্বারা বহির্জগৎ উপলব্ধ হয় তাহাকে মন বলে। পাশ্চাত্যদর্শনে ইহাকে **Sensation** ও **Perception** বলে।

অহঙ্কারকে ইংরাজিতে Consciousness বলা যাইতে পারে। বুদ্ধিকে ইংরাজিতে Concept বা Jndgmeut বলা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যদর্শন মতে পুরুষ একটি নয়, প্রতি শরীরে ভিন্ন-ভিন্ন।

৪। **যোগদর্শন**—পতঞ্জলি মুনি যোগদর্শনের প্রণেতা। ইনি মহাভাষ্য নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া পাণিনির ব্যাকরণের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। যোগসূত্র রচনা করিয়া সাংখ্যদর্শনের নাস্তিকত্বের অপবাদ দূর করিয়াছেন। বাস্তবিক যোগদর্শন, সাংখ্যদর্শনের ভিত্তির উপরই নির্মিত। কেবল সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই—যোগদর্শনে তাহা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫।৬। **পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত**—জৈমিনী মুনি পূর্বমীমাংসার প্রণেতা। প্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্ট তাঁহার বার্তিকে পূর্বমীমাংসার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন। পূর্বমীমাংসার সূত্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও কর্মাদি সমর্থন করাই এই দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। বেদকে অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ও (উপনিষদ্) তিনি "শ্রুতি" বলিয়া গিয়াছেন। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রগুলিকে "স্মৃতি" বলিয়াছেন।

সমস্ত মীমাংসা দর্শনে উদাহরণ ও তর্ক-বিতর্ক সমূহ অতিশয় মনোহর। পণ্ডিতপ্রবর কোলব্রুক লিখিয়াছেন, মীমাংসার যুক্তি-তর্কাদি, ব্যবহার-শাস্ত্রের যুক্তি-তর্কের মতোই সূক্ষ্ম ও সারবান।

বাদরায়ণ বা ব্যাস বেদান্ত সূত্রের প্রণেতা। বেদান্ত সূত্রের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র। ইহা চারি অংশে বিভক্ত। প্রসিদ্ধ নামা শঙ্করাচার্য এই সূত্রের ভাষ্য লিখিয়া আপনার কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। তৎপরে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ এই দর্শনের দ্বিতীয় ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বেদান্তমতে এক ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগতের স্থিতি, এবং এক ব্রহ্মেই সমস্ত জগৎ লীন হইবে। যেমন এক সূর্য কোটি-কোটি জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া কোটি-কোটি মূর্তি ধারণ করেন,—কিন্তু বস্তুত তিনি সেই এক, সেইরূপ ব্রহ্মও সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত থাকিলেও তিনি সেই এক এবং অদ্বিতীয়। ইহাই হিন্দু-ধর্মের মূল বিশ্বাস, ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বলে।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এবং রামানুজ, বেদান্ত-দর্শনের দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। শঙ্কর যথার্থ 'অদ্বৈতবাদী'। তাঁহার মতে পরব্রহ্মই বিশ্বের

একমাত্র সত্য,—জীবসঙ্কুল বিশ্বজগতের অপরাংশ মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। রামানুজ 'বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী'। তাঁহার মতে পরব্রহ্মই বিশ্বের সারভূত—সত্যতম—তিনি জীবের প্রতি দয়া প্রেমে পরিপূর্ণ,—জীব ও দৃশ্যজগৎ ও সত্য—মায়া নহে। শঙ্কর ও রামানুজের অদ্বৈতবাদে এই প্রভেদ। শঙ্করের ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানী পণ্ডিত ও তার্কিকগণের মধ্যে সমাদর লাভ করিয়াছে—আর রামানুজের ঈশ্বরতত্ত্ব লক্ষ-লক্ষ হিন্দুর হৃদয়ে-হৃদয়ে বিরাজমান। তাঁহার সেই তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া কালক্রমে রামানন্দ, কবির, নানক, চৈতন্য, দাদু ও রামমোহন রায় প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম সংস্কারকগণের আবির্ভাব হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্বে পণ্ডিত মোক্ষমুলরের "ভারতীয় ষড়্‌দর্শন" নামক ইংরাজি গ্রন্থের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছি, উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা হইতে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে এই পণ্ডিতপ্রবরের একটি উক্তি নিম্নে সমুদ্ধৃত করিয়া এ-প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

It is surely astounding that such a systemas the Vedanta should have been slowly elaborated by the indefatigable and intrepid thinkers of India thousands of years ago, a system which even now makes useful giddy as in mounting the last steps of an ancient gothic cathedral. None of our Philosophers, not excepting Heraclitus, Plato, Kant, or Hegel has ventured to erect such a spire never frightened by storms or lightnings. Stone follows on stone in regular succession after once the first slep has been made after once it has been clearly seen that in the beginning there can have been but one, as there will be but one in the end, whether call it Atman or Brahman. (ভারতী জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ পৃষ্ঠা ১৭৪ হইতে ১৮০)।

(রমেশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড—সংক্ষেপিত)

সংঘাত : সমন্বয়

আদিযুগে এইভাবেই বিবিধ বিরোধী চিন্তার সঙ্গে সমন্বয় করে বৈদিক সংস্কৃতি, আর্যধর্মীকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু ধর্মীয় ভাবনার যে বিরোধিতা এতদিন তা ছিল নিজের ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—এবার প্রচণ্ড আঘাত এলো বাইরে থেকে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষে পূর্বভারতে শুরু হলো তুর্কি আক্রমণ। দেশে শুরু হলো অরাজকতা, লুণ্ঠন, চক্রান্ত ও অনিশ্চয়তা। শান্তি প্রতিষ্ঠার পর দেশে তুর্কী ও মোগলশাসনের সূচনা।

কিন্তু এই যুগেও বাঙালি আত্মস্থ ছিল। তারা ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠলো। কেবল বাঙলার নয়, সর্বত্র প্রেমধর্ম প্রচারিত হলো—এলেন চৈতন্য, কবীর, রামানন্দ, দাদু ও মীরাবাঈ ; এলেন সুফী ও সন্ত সাধকের দল! তারা যে মৈত্রী ও সমন্বয়ের সুর প্রচার করলেন সেই প্রেমধর্মে কোন কৃত্রিম ব্যবধান আর রইল না।—এ ধর্মে দেবতা ধরা দিলেন মানুষেরই অঙ্গনে, ধর্মীয় তত্ত্বচিন্তায় এই মানবীয় রূপ—এ যেন 'সর্বভূতেষু চাত্মানথ সর্ব্ব-ভূতানি চাত্মনি'—এই উপনিষদীয় মন্ত্রেরই এক প্রেমময় উপলব্ধি! বাউলদের মানবধর্ম—সেও এই যুগেরই দান!

অক্ষয়কুমার দত্ত

চৈতন্য-সম্প্রদায়

শ্রীচৈতন্য এই স্বতন্ত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন! চৈতন্য এ-সম্প্রদায়ের কেবল প্রবর্তক নহেন, উপাস্যও বটেন।

চৈতন্যের চরিত্র-বর্ণন-বিষয়ের ভূরি-ভূরি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে বৃন্দাবন দাসকৃত চৈতন্যচরিত সর্বাপেক্ষা পূজ্য ও প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি চৈতন্য-শিষ্য মুরারি-গুপ্ত-কৃত আদিলীলা ও দামোদর-কৃত শেষলীলা এই দুই গ্রন্থ হইতে আপন গ্রন্থসংকলন করিয়াছেন। আদিলীলায় চৈতন্যপ্রভুর গৃহাশ্রমের বৃত্তান্ত ও শেষলীলায় অর্থাৎ মধ্য ও অন্ত্য লীলায় তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের বিবরণ লিখিত হয়। ১৫৩৮ শকে কৃষ্ণদাস নামে এক বৈষ্ণব ঐ চৈতন্য চরিতের সার-সংগ্রহ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

চৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচী। জগন্নাথ প্রথমে শ্রীহট্ট নিবাসী ছিলেন; অনন্তর গঙ্গাবাস উদ্দেশে নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ৪ ঐ স্থানে চৈতন্যের জন্ম হয়।

শৈশবকালেই চৈতন্যের পিতৃবিয়োগ হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপ তাঁহার পূর্বেই সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, সুতরাং স্বীয় জননীর রক্ষণাবেক্ষনার্থ তাহাকে কিছুকাল গৃহ-ধর্ম প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল। তিনি বল্লভাচার্যের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ২৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত গৃহাশ্রমে থাকিয়া বিষয় কর্ম নির্বাহ করেন। ২৪ বৎসরের শেষে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক ছয় বৎসর কাল মথুরাবধি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পর্যন্ত নানা স্থান পরিভ্রমন করিয়া ক্ষমতানুযায়ী কৃষ্ণোপাসনা প্রচার ও শিষ্য-মণ্ডলী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। অবশেষে রূপ ও সনাতনকে মথুরায় প্রেরণ করিয়া এবং অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বাঙ্গালায় স্থাপিত করিয়া আপনি নীলাচলে অবস্থিতি করেন। তথায় ১৮ বৎসর অবস্থিতি করিয়া প্রেম-ভক্তি প্রচার ও জগন্নাথ দেবের উপাসনা-বিষয়ে সবিশেষ মনোনিবেশ করেন। বিশেষতঃ শেষ দ্বাদশ বৎসর কেবল কৃষ্ণানুরাগ এবং তন্নিবন্ধন উন্মাদ ও প্রলাপ-প্রকাশেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় তিনি উন্মত্ত প্রায় হন। এরূপ আখ্যান আছে যে, এক দিবস তিনি সমুদ্রকে যমুনা ভাবিয়া ও তদীয় শ্যামল জলে বৃন্দাবনের গোপীকাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া দেখিয়া তাহাতে অবগাহন করিলেন। প্রেমোন্মত্ত ও তপঃ-কাষ্ঠা হেতু কৃশ ও লঘু-কায় হওয়াতে ভাসিয়া উঠিলেন, নতুবা সেই স্থানেই তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে

হইত। এক কৈবর্ত ভ্যাশ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সমুদ্র হইতে তটে আনয়ন করিল এবং তখন স্বরূপ ও রামানন্দ দুই শিষ্য অচৈতন্য চৈতন্যদেবকে সচৈতন্য করিল। এই উপাখ্যানের প্রথমাংশ নিতান্ত অমূলক না হইলেও না হইতে পারে। চৈতন্যদেবের লীলা-সংবরণের সবিশেষ বৃত্তান্ত নাই। তিনি অন্তর্হিত হইলেন, এই কথা মাত্র লিখিত আছে, কিন্তু কি প্রকারে অন্তর্হিত হইলেন, তাহার বিশেষ নির্দেশ নাই। অতএব এতাদৃশ সমুদ্র-প্রবেশ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু হওয়া অসম্ভাবিত নহে। লেখা আছে যে, ১৪৫৫ শকে তিনি অন্তর্হিত হন।

এ-সম্প্রদায়ের মতানুসারে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে বিষ্ণুর অংশাবতার।[৮] তাঁহারা দুইজনে চৈতন্যের দুই অঙ্গ স্বরূপ। যিনি কৃষ্ণাবতারে বলরাম, তিনিই চৈতন্যাবতরে নিত্যানন্দ। অদ্বৈতও তাঁহারই মূর্তি-বিশেষ।

এ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই তিন প্রভু ব্যতিরেকে রূপসনাতনাদি ছয় গোস্বামীকে আদি-গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। এক্ষণকার অনেকানেক গোস্বামী পরিবার তাঁহাদের সন্তান। তাঁহারা গোহলস্থ গোস্বামীদিগের ন্যায় বংশানুক্রমে গুরু বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছেন। বোধ হয়, উল্লিখিত ছয় জন গোড়ীয় গোস্বামী মথুরা ও বৃন্দাবনে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের উপাস্য দেবতা। ইঁহাদের মতে তিনিই স্বয়ং ভগবান, চৈতন্য-প্রভু যুগ-ধর্মানুসারে বিধি-ভক্তির পরিবর্তে প্রেম-ভক্তি প্রকাশ ও হরিনাম-প্রচার-বারণার্থ অবতীর্ণ হন, কিন্তু এটি তাঁর বহিরঙ্গ কারণ, তদ্ভিন্ন একটি অন্তরঙ্গ কারণ আছে। পূর্বে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা উভয়ে লীলাচ্ছলে অনুপম সুখ-সম্ভোগ করিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অতুল-মাধুর্য রসানুভব করিয়া শ্রীরাধিকা যাদৃশ আনন্দ লাভ করিতেন, কৃষ্ণ তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া দুঃখিত ছিলেন। এই হেতু আপনার মাধুর্য-রসাস্বাদন নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া এবার পূর্ণ-শক্তি-স্বরূপা রাধিকা ও পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে এক দেহে মিলিত হইয়া নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই হেতু তিনি রাধার ন্যায় গৌরবর্ণ হইয়াছিলেন এবং আপনাকে রাধা-স্থানীয় ভাবিয়াও শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নিরন্তর প্রলাপ ও প্রেমোন্মাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥

রস আস্বাদিতে আমি কৈন্থ অবতার।
প্রেম-রস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥
রাগ-মার্গে ভক্ত ভজে মোরে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলাচরণ দুয়ারে॥

চৈতন্যচরিতামৃত, আদিখণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচী গর্ভে শুদ্ধ-দুগ্ধ-সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হইলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু।

চৈতন্যচরিতামৃত, আদিখণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমভক্তি এ-সম্প্রদায়ের সব-সম্পত্তি; তাহার অনুষ্ঠানে সকল ধর্মের ও যাবতীয় কর্তব্যকর্মেরই অনুষ্ঠান হয়। পুরাণে এইরূপ নির্দেশ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন, কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান ও অন্যান্য শুভানুষ্ঠান দ্বারা যাহা কিছু লব্ধ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা অনায়াসেই সে সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যদি স্বর্গ, মুক্তি ও আমার বৈকুণ্ঠধামও প্রার্থনা করেন তাহাও লাভ করেন।[১৩]

সবজাতীয় লোকেই ঐ প্রেম-ভক্তির অনুষ্ঠানে সমর্থ, অতএব মুসলমান ও অন্যান্য ম্লেচ্ছজাতি প্রভৃতি সকলেই এ-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এরূপ লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু এবং তাঁহার সহযোগী ভক্তেরা নিজে মুসলমান দিগকে উপদেশ দিয়াছেন।

পাঁচ প্রকার ভাব উল্লিখিত প্রেমের অন্তর্গত যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য। সনকসনাতনাদি পূর্ব-পূর্ব যোগীন্দ্র সকলে যে ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম শান্ত ভাব। সাধারণ ভক্ত সমুদায় যে ভাবে উপাসনা করেন, তাহাকে দাস্য ভাব কহে। সখ্য তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভীমার্জুন এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাৎসল্য-ভাব পিতা-মাতার স্নেহ স্বরূপ; নন্দ-যশোদা বাৎসল্য ভাবে উদ্ধার হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় এ-সম্প্রদায়ের মত-প্রতিপাদক বহুল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু কোন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। মাধুর্য সকল ভাবের প্রধান; রাধিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ যাদৃশ ভাবে কৃষ্ণ-সেবা করেন, তাহার নাম মাধুর্য। চৈতন্য-প্রভু এই শেষোক্ত ভাবের ভাবী হইয়া বাতুল হইয়াছিলেন।

বল্লভাচারী বৈষ্ণবেরা যেরূপ ভাবে কৃষ্ণ-সেবা করে, তাহার সহিত গোরাঙ্গ ভক্তদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই ; কিন্তু এ-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ লোকে বল্লভাচারী-দিগের ন্যায় প্রত্যহ অষ্টবার বিহিত বিধানে কৃষ্ণ-সেবা করে না। বাঙ্গালার অনেক স্থানেই কেবল পূর্বাহ্নে ও সায়ংকালে তাহার পূজা হয়, তবে কখন-কখন উল্লিখিত রূপ অষ্টবিধ সেবা ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নাম-সংকীর্তন এ-সম্প্রদায়ের পরম সাধন। ইহাদের মতানুসারে কলিযুগে হরি-নাম-সংকীর্তন ব্যতিরেকে আর পরিত্রাণের উপায় নাই।

মীরা বাঈ

দুই

এ-সম্প্রদায়কে বল্লভাচারীদিগের একটি শাখা বলিলেও—বলা যায়। বিশেষ এই যে, এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা মীরাবাঈ এবং তাঁহার ইষ্টদেব রণছোড়কে বিশিষ্টরূপ ভক্তি করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই এক পৃথক সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

ভক্তমালে মীরাবাঈয়ের উপাখ্যান থাকতে বোধ হয়, তিনি জনসমাজে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণু-বিষয়ে কতকগুলি পদ রচনা করেন। নানকপন্থী ও কবীরপন্থী প্রভৃতি একেশ্বরবাদীদিগের উপাসনা-পদ্ধতি মধ্যে তাঁহার অনেক গীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তমালে মীরাবাঈ আকবর শাহর সমকালবর্তী বলিয়া লেখা আছে। এরূপ আখ্যান আছে যে, আকবর, বাঈজীর অসাধারণ সঙ্গীত শক্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া, দেশ-বিখ্যাত তানসেনকে সঙ্গে লইয়া, তৎসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মীরাবাঈ মেরতার রাজার কন্যা। উদয়পুরের রাণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামি-গৃহ গমনের কিঞ্চিৎকাল পরেই নিজ শ্বশ্রুর সহিত ধর্মবিষয়ে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হয়। রাণা ও তাঁহার অন্যান্য পরিবারেরা শক্তি-উপাসক ছিলেন, কিন্তু রাণী পরম-বৈষ্ণবী হইলেন ; ইহাতে রাজমাতা তাঁহাকে বৈষ্ণব-ধর্মে বিরত ও শক্তি উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত বিস্তর উপদেশ দিলেন, কিন্তু বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণা মীরা কোনক্রমেই তাহা স্বীকার করিলেন না। রাণা তাঁহাকে গৃহ হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলেন, কিন্তু বোধহয়, তাঁহার বাস

ও ভরণপোষণাদি নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান এবং কিছু অর্থও প্রদান করিয়াছিলেন। মীরা এই প্রকারে স্বতন্ত্রা হইয়া রণছোড় নামক কৃষ্ণ-মূর্তির আরাধনায় রত হইলেন এবং দেশ-পর্যটক নিরাশ্রয় বৈরাগীদিগের এক প্রধান আশ্রয়-ভূমি হইয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে তিনি বৃন্দাবন ও দ্বারকা তীর্থে গমন করিলেন। যৎকালে দ্বারকায় ছিলেন, বোধহয়, তৎকালে উদয়পুরের রাণা স্বীয় অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিতে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় প্রেরণ করেন। মীরা তথা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্বে আপনার ইষ্টদেবের নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত তদীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাহার ভজনা সমাপ্ত হইলে পরে সেই মূর্তি বিদীর্ণ হইল ও মীরা তাহাতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পূর্ববৎ নিশ্ছিদ্র হইল এবং তদবধি মীরাবাঈ চিরকালের মতো অন্তর্হিত হইলেন। উদয়পুরে অদ্যাপি রণছোড়ের সহিত মীরা বাঈয়ের যে একত্র পূজা হইয়া থাকে, লোকে বলে ইহা ঐ ব্যাপারের স্মরণসূচক ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, মীরা ঐ অদ্ভুত বিষয়ের প্রার্থনা-সূচক দুইটি পদ রচনা করেন। পশ্চাৎ তাহার অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ পদ। রাজন্ রণছোড়! দ্বারকায় আমাকে স্থান দাও এবং তোমার শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দ্বারা যম-ভয় নিবারণ কর। তোমার মন্দিরে নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং তোমার শঙ্খ ও করতাল-ধ্বনিতে পরম আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি আপনার রাজ্য, সম্পত্তি, পতি, প্রেম সমুদায়ই বিসর্জন দিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার শরণার্থিনী হইয়া আসিয়াছে, তুমি তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ কর।

২ পদ। তুমি যদি আমাকে নির্দোষ জানিয়া থাক, তবে গ্রহণ কর ; তোমা বিনা, আমাকে দয়া করে; এমন আর কেহ নাই ; অতএব আমাকে ক্ষমা কর. ক্ষুধা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় যেন আমার শরীর ভগ্ন না হয়। হে মীরাপতি! হে প্রিয় গিরিধর! মীরাকে গ্রহণ কর। তোমার সহিত যেন আর কদাপি আমার বিয়োগ না হয়।

মধ্বাচারী

মধ্বাচার্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, এ প্রযুক্ত লোকে ইহাকে মধ্বাচারী বলিয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তর-খণ্ডে মধ্বাচারীদিগের মতের প্রচার নাই তবে এ-খণ্ডে কখন-কখন এ-সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু অধিক নহে। এদিকে তাঁহাদিগের একটিও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

এ-সম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণব অপেক্ষা আধুনিক। ইহার প্রবর্তক মধ্বাচার্য দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী তুলব-দেশনিবাসী মধিজী ভট্টের পুত্র। মধ্বাচারীদিগের গ্রন্থে তাহার যেরূপ চরিতকীর্তন আছে, তাহাই এ-স্থলে বর্ণিত হইতেছে। পবনদেব নারায়ণের আদেশক্রমে ধর্ম-সংস্থাপনার্থে অবতীর্ণ হইয়া মধ্বাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি ১১২১ শকে জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তেশ্বরের মঠে বিদ্যাভ্যাস করেন এবং নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সনক কুলোদ্ভব অচ্যুতপ্রচ-নামা আচার্য সন্নিধানে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপরেই গীতাভাষ্য প্রস্তুত করিয়া হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে উপনীত হইয়া বেদব্যাসকে প্রদান করেন। ব্যাসদেবও তাহাকে বহু সমাদরপূর্বক তিনটি শালগ্রাম-শিলা উপহার দেন। মধ্বাচার্য সুব্রহ্মণ্য, উদিপি ও মধ্যতল এই তিন স্থানের মঠত্রয়ে ঐ শিলাত্রয় প্রতিষ্ঠা করেন ও তদ্ব্যতিরেকে উদিপিতে আর এক কৃষ্ণ-মূর্তি স্থাপন করেন। ঐ কৃষ্ণমূর্তি স্থাপিত করিবার বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে, লিখিত হইতেছে। কোন বণিকের একখানি অর্ণবপোত দ্বারকা হইতে মলয়বর দেশে যাইতে যাইতে তুলব দেশের নিকটে গিয়া জলমগ্ন হয়। ঐ অর্ণবপোতে এক কৃষ্ণ-বিগ্রহ গোপীচন্দন মৃত্তিকার মধ্যে আবৃত ছিল; মধ্বাচার্য দৈবজ্ঞান-বলে জানিতে পারিয়া ঐ প্রতিমা উত্তোলন পূর্বক উদিপিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তদবধি উদিপি নগর এ সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। মধ্বাচার্য তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া সূত্রভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, অনুবাকানুনয়বিবর্ণ, অনুবেদান্তরস প্রকরণ, ভারত-তাৎপর্য নির্ণয়, ভাগবৎ-তাৎপর্য, গীতা-তাৎপর্য, কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব, তন্ত্রসার প্রভৃতি সাঁইত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিছুদিন পরে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া শঙ্করাচার্য প্রভৃতি আচার্যদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন। পরিশেষে বদরিকাশ্রমে গমনপূর্বক ব্যাসদেবের সমভিব্যাহারে একত্র অবস্থিতি করেন। মধ্বাচারীরা কহেন, অদ্যাপি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

এই উপাখ্যানের মধ্যে তুলব-নিবাসী মধিজী ভট্টের ঔরসে মধ্বাচার্যের জন্ম, অচ্যুত-প্রচের নিকট উপদেশগ্রহণ ও উদিপিতে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা এই তিনটি কথা সপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মধ্বাচার্যের শিষ্য-সংখ্যার আশু বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি উদিপির মন্দির ব্যতিরেকে ক্রমে-ক্রমে আর আটটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তথায় বিবিধ প্রকার বিষ্ণু-মূর্তিসংস্থাপন করেন এবং স্বীয় ভ্রাতাকে ও গোদাবরী তীরস্থ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব আটজন সন্ন্যাসীকে ঐ সকলের অধ্যক্ষতা পদে নিয়োজিত করেন। ঐ সমুদায় মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ আট মন্দিরের অধ্যক্ষেরা প্রত্যেক

সম্প্রদায়-প্রবর্তকের লিখিত নিয়মানুসারে পর্যায়ক্রমে ২ বা ২॥০ বৎসর উদিপিস্থ মন্দিরের অধ্যক্ষতা করিয়া আসিতেছেন।

যে সময়ে যিনি অধ্যক্ষ থাকেন, তখন তাঁহাকেই ঐ দেবালয়ের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়। লোকানুরাগ ও যশোলাভ বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের পরস্পর জিগীষা প্রযুক্ত অতীত ব্যয়-বাহুল্য হইয়া ওঠে; সুতরাং তথাকার নিয়মিত আয়দ্বারা কোনমতে নিবৃত্তি পায় না। এ-কারণ মন্দিরাধ্যক্ষ সন্ন্যাসীরা অবকাশ-কালে দেশপর্যটন পূর্বক বিষয়ী শিষ্যদিগের নিকট দান সংগ্রহ করিয়া এক-এক সময় বিপুল অর্থ উপার্জন করেন এবং তাহার অধিকাংশই আপন-আপন অধ্যক্ষতাকালে উদিপির দেব-সেবায় ব্যয় করিয়া থাকেন।

ঐ আটটি দেবালয়ই তুলব-রাজ্যের অন্তর্গত। তদ্ব্যতিরেকে মধ্বাচার্য পদ্মনাভ তীর্থকে আর কয়েকটি মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিলেন এবং তাঁহার হস্তে পূর্বোক্ত ব্যাস-শালগ্রাম ও শ্রীরামচন্দ্রের কতিপয় প্রতিমূর্তি সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "আমার মত প্রচার কর ও উদিপির দেবালয়ের আনুকূল্যার্থ ধন সংগ্রহ কর।" দক্ষিণাপথের পশ্চিমভাগে পদ্মনাভ তীর্থের চারিটি মঠ বিদ্যমান আছে, তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা তথাকার অধ্যক্ষ হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মধ্যে-মধ্যে উদিপির দেবালয়েও গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাকার অধ্যক্ষতা করেন না।

সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য লোকের দীক্ষাগুরু হইবার অধিকার নাই। দীক্ষাগুরুরা নিতান্ত অন্ত্যজ ব্যতিরেকে আর সকল জাতিকেই উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রত্যেক গুরুরই কতকগুলি করিয়া পৈতৃক শিষ্য থাকে এবং তাঁহার গুরুত্ব-পদ বিক্রয় করিবার ও বন্ধক দিবারও অধিকার আছে।

এ-সম্প্রদায়ের উদাসীন আচার্যেরা দণ্ডীদিগের ন্যায় যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন, দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ করেন, মস্তক-মুণ্ডন করেন এবং এক-এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহারা চিরকালের মতো সংসার-ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া বাল্যকালেই সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করেন। মধ্বাচারীরা তপ্ত লৌহ দ্বারা স্কন্ধে ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের চিহ্ন করেন এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় নাসামূল অবধি কেশ পর্যন্ত দুটি উর্দ্ধ-রেখা চিহ্নিত করিয়া ঐ দুই রেখার নাসামূলগত উভয় প্রান্ত অপর একটি ভ্রূ-মধ্যগত রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেন; তবে বিশেষ এই যে; রামানুজ বৈষ্ণবেরা ঐ দুই উর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্য দিয়া পীত অথবা রক্তবর্ণ একটি উর্দ্ধরেখা করেন, মধ্বাচারীরা তাহার পরিবর্তে নারায়ণ-নিবেদিত

দগ্ধ গন্ধ দ্রব্যের ভস্ম দ্বারা ঐ স্থলে একটি কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার শেষভাগে হরিদ্রাময় এক বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন।

ইহারাও অপরাপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় বিষ্ণুকে বিশ্ব-কারণ পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহার পোষকতার নিমিত্ত কতিপয় উপনিষদ ও অন্যান্য গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। ইহাদের মতানুসারে আদৌ একমাত্র অদ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান নারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন। সমুদায় জগৎ তাহারই শরীর হইতে উৎপন্ন হয়। তিনি অশেষরূপ-সদ্‌গুণসম্পন্ন অনির্বচনীয় স্বরূপ ও স্বতন্ত্র। মধ্বাচারীরা জীব ও পরমেশ্বরের পৃথক-পৃথক সত্তা স্বীকার করাতে দ্বৈতবাদী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তৎপ্রযুক্ত শঙ্করাচার্য ও রামানুজ আচার্যের মতের সহিত ইহাদিগের মতের সবিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। ইহারা বলেন, জীবাত্মা নিত্য, ঈশ্বরের অধীন ও তাঁহার সহিত চিরসম্বন্ধে সংবদ্ধ, কিন্তু উভয়ে এক নহে।

যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানাবৃক্ষরসা যথা।
যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদন বনে যথা॥
চৌরোপহার্য্যৌ চ যথা যথা পুংবিষয়াবপি।
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদৈব বিলক্ষণৌ॥

মহোপনিষৎ।

পক্ষী ও সূত্রে, বৃক্ষ ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধ জল ও লবণে, চোর ও হৃত দ্রব্যে এবং পুরুষ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে যেমন বিভিন্নতা আছে, জীব ও ঈশ্বর নিয়তই সেইরূপ পরস্পর বিভিন্ন ও বিলক্ষণ।

ইহারা কেবল জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর প্রভেদ স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত থাকেন না, পঞ্চপ্রকার ভেদজ্ঞান অঙ্গীকার করেন; জীবেশ্বর-ভেদ, জড়েশ্বর-ভেদ, জড়-জীব-ভেদ এবং জীবগণের ও জড়পদার্থের পরস্পর ভেদ। এই পঞ্চভেদ শাস্ত্রে প্রপঞ্চ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ইঁহারা পরমাত্মাতে জীবের লয় অর্থাৎ নির্বাণ-মুক্তি স্বীকার করেন এবং শৈবদিগের যোগ ও বৈষ্ণবদিগের সাযুজ্যও অঙ্গীকার করেন না। ইঁহাদিগের মতে নারায়ণ বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মী, ভূমি ও নীলা দেবী এই তিন পত্নীর সহিত স্বর্গীয় বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া অনির্বচনীয় ঐশ্বর্যসুখ সম্ভোগ করেন। তিনি স্বরূপাবস্থায় গুণাতীত, কিন্তু যখন মায়ার সংযুক্ত হন, তখন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এবং শিবরূপে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়

করিতে থাকেন। তাঁহারা মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং মায়ার যোগেই স্ব-স্ব কার্য সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন বিশ্বকারণ নারায়ণের হৃদয়, ললাট ও পার্শ্বদেশ এবং অন্য-অন্য অঙ্গ হইতে শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণের উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে। আর বিষ্ণুপ্রধান পুরাণ সমুদায়ে বিষ্ণুর নাভি পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ও ব্রহ্মার অশ্রুজলে রুদ্রের উৎপত্তি বিষয়ে যে-যে উপাখ্যান আছে, তাহাতেও মধ্বাচারীদিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

উপাসনার তিন অঙ্গ। প্রথমতঃ অঙ্কন; অর্থাৎ অঙ্গ বিশেষে বিষ্ণুর শঙ্খ চক্রাদির চিহ্ন ধারণ। দ্বিতীয় অঙ্গ নামকরণ; অর্থাৎ বিষ্ণুর নামে আপন সন্তান দিগের নামকরণ। তৃতীয় অঙ্গ ভজন; অর্থাৎ কায়িক, বাচিক, মানসিক এই ত্রিবিধ ভজন; সত্যবচন, হিতকথন, প্রিয়ভাষণ ও শাস্ত্রানুশীলন, এই চারিটি বাচনিক ভজন; আর দান, পরিত্রাণ, পরিরক্ষণ, এই তিনটি কায়িক ভজন।

ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি। অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনম্॥

সর্বদর্শনে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্।

এই দশটি ধর্ম এ-সম্প্রদায়ের নীতি শাস্ত্রের সার। অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় ইঁহাদিগেরও বিগ্রহ-পূজা ও দেবোৎসব প্রচলিত আছে। ইঁহাদিগের দেবালয়ে বিষ্ণু-মূর্তির সহিত শিব, পার্বতী ও গনেশেরও মূর্তি থাকে এবং তাঁহাদিগেরও যথানিয়মে পূজাদি হয়, অতএব বলিতে হয়, শৈবদিগের সহিত মধ্বাচারীদিগের বিশেষ বিসংবাদিতা নাই। ইহাদিগের মতানুসারে বিষ্ণুর প্রসাদলাভ পূর্বক চরম সুখ প্রাপ্তিই মনুষ্যের একমাত্র কামনার বিষয় ও সমুদয় সাধনের মুখ্য প্রয়োজন। বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষের জ্ঞান হইলেই তাঁহার প্রসন্নতালাভ হয়, নতুবা জীবেশ্বরের অভেদ মানিলে যে তিনি সানুকূল হন, এ-কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। শিব-ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ অনিত্য ও ক্ষরশব্দ-বাচ্য, কেবল লক্ষীই অক্ষর। বিষ্ণু ঐ ক্ষরাক্ষর হইতে প্রধান ও স্বতন্ত্র। এই সমুদায়ের জ্ঞান হইলে বিষ্ণুর প্রসাদলাভ হয়। বিষ্ণুর প্রতি যাঁহার প্রীতি জন্মে, তাঁহার আর জন্মান্তর হয় না। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া সারূপ্য, সালোক্য, সান্নিধ্য ও সাষ্টি এই চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া অনির্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন।

মধ্বাচার্যের প্রণীত সমুদায় গ্রন্থ এবং বেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও রামায়ণ ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। ইঁহারা ঐ সকল শাস্ত্রে সবিশেষ শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তর বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

বোধহয়, মধ্বাচার্য প্রথমে শৈবব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৈষ্ণব-ধর্ম অবলম্বন করিয়া শৈব ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদভঞ্জনার্থ যথাশক্তি যত্ন করেন। এ-বিষয়টি অনেক কারণে সম্ভাবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথমত তিনি অনন্তেশ্বরনামা শিব মন্দিরে দীক্ষিত হন। দ্বিতীয়ত, তিনি শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত তীর্থ উপাধি গ্রহণ করেন।

তৃতীয়ত, মধ্বাচারীদিগের দেবালয়ে বিষ্ণুর সহিত একত্রে শিব, পার্বতী প্রভৃতিরও পূজা হয়। চতুর্থত, মাধ্ব ও শাঙ্কর গুরুদিগের শিষ্যেরা পরস্পর উভয় পক্ষীয় গুরুদিগকেই নমস্কার ও শ্রদ্ধা ভক্তি করেন এবং শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গগিরিস্থ মঠের মহন্ত উদিপি নগরের কৃষ্ণ-মন্দিরে পূজা করিতে আইসেন। অতএব এই উভয় প্রকার শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী উপাসকদিগের পরস্পর ঐক্য ও সদ্ভাব আছে বলিতে হইবে। যে সকল শৈব ও বৈষ্ণব এরূপ সদ্ভাব-সম্পন্ন না হইয়া পরস্পর বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, মাধ্বেরা তাঁহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

বল্লভাচারী

তৃতীয় প্রধান সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র সম্প্রদায়। বল্লভাচার্য ইহার প্রবর্তক, এই নিমিত্ত লোকে ঐ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে বল্লভাচারী বলিয়া থাকে। রাম-সীতার উপাসনা ভারতবর্ষের সর্বস্থানেই প্রচারিত আছে বটে, কিন্তু উহার উত্তর-খণ্ডের, বিশেষত ঐ খণ্ডের পশ্চিমভাগের ঐশ্বর্যবান ও ভোগবান গৃহস্থেরা প্রায়ই রাধাকৃষ্ণের উপাসক। কিছুদিন হইল, তৎপ্রদেশে বল্লভাচার্য প্রবর্তিত বালগোপালের সেবা সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গোকুলস্থ গোস্বামীরা এই ধর্ম উপদেশ দেন, এ-প্রযুক্ত ইহা গোকুলস্থ গোস্বামীদিগের ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

এরূপ প্রবাদ আছে, আদৌ বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী এই মতের সার তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমী ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যকে শিষ্য করিতেন না। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানদেবের শিষ্য নামদেব ও ত্রিলোচন। তাহাদের অব্যবহিত কাল পরে অথবা কিয়ৎকাল ব্যবধানান্তর ত্রৈলিঙ্গ-দেশীয় লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র বল্লভাচার্য গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়া শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সবিশেষ যত্ন সহকারে ঐ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে তিনি গোকুলে বাস করিতেন। তথায় কিছুকাল যাপন করিয়া তীর্থ-পর্যটনার্থ যাত্রা করেন।

ভক্তমালে লিখিত আছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে বিজয়-নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়া তথাকার স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন এবং তত্রত্য বৈষ্ণবগণের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হন। তথা হইতে উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিয়া শিপ্রাতটে অশ্বত্থবৃক্ষ তলে অবস্থিতি করেন। ঐ স্থান অদ্যাপি তাহার বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মথুরার ঘাটে তাঁহার ঐরূপ আর এক বৈঠক আছে এবং চুনারের এক ক্রোশ পূর্ব্বে একটি মঠ ও মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মঠের প্রাঙ্গনে একটি কূপ আছে বলিয়া ঐ স্থানকে আচার্য্যকুঁয়া কহে। তথায় তিনি কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাহার অচলা ভক্তি ও ধর্ম্মার্থ কায়-ক্লেশ স্বীকার করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং অতি মনোহর অপূর্ব্বরূপে দর্শন দিয়া বালগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। বল্লভাচার্য্যের মৃত্যুঘটনাবিষয়ক আখ্যান অতিমাত্র অদ্ভুত। তিনি শেষাবস্থায় কিছুদিন বারাণসীর জেঠন-বড়ে বাস করিয়াছিলেন। ঐ জেঠন-বড়ের নিকট অদ্যাপি তাঁহার এক মঠ আছে। তিনি মর্ত্তলীলা সম্পন্ন করিয়া এক দিবস হনুমান্ ঘাটে গঙ্গা-সলিলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবগাহন করিতে-করিতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহার অবগাহন স্থান হইতে এক দীপ্যমান অগ্নিশিখা উত্থিত হইল এবং তিনি বহুতর দর্শক-সমক্ষে স্বর্গারোহণ করিতে লাগিলেন ও অবশেষে আকাশে লীন হইয়া গেলেন।

যদিও মহাভারত অবধি করিয়া বিষ্ণু ও কৃষ্ণের অভেদ বর্ণনা আরম্ভ হয় এবং শ্রীভাগবতে তাহার কেলি-কৌতুক পরিপূর্ণ যৌবন লীলার সবিস্তার বর্ণন আছে, কিন্তু বিষ্ণু অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রাধান্য বর্ণন এই দুই গ্রন্থের কোন অংশে দৃষ্ট হয় না এবং উহাদের কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কলরূপের উপাসনারও সুস্পষ্ট বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্থাপন করা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ পুরাণানুসারে শ্রীকৃষ্ণই মায়াতীত, গুণাতীত, নিত্য, সত্য পরমেশ্বর ; তিনি পূর্ণ-যৌবন সম্পন্ন, নানারত্ন বিভূষিত, পীতাম্বর মুরলীধর রূপে অক্ষয় গোলকধামে নিত্য স্থিতি করেন ; বৈষ্ণুর বৈকুণ্ঠ-ধামের পঞ্চাশৎ কোটি যোজনের উপর বৃন্দাবন-বাসী গোপালের গোলকধাম। ঐ গোপাল হইতেই এই চরাচরে বিশ্ব উৎপন্ন হয় ; তাঁহা হইতেই তিন গুণ, পঞ্চভূত এবং দেবগণাদির ক্রমে-ক্রমে উৎপত্তি হয় ; তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে নারায়ণ, বাম পার্শ্ব হইতে মহাদেব, নাভি-পদ্ম হইতে ব্রহ্মা, বক্ষস্থল হইতে ধর্ম, মুখ হইতে সরস্বতী, মন হইতে লক্ষ্মী,

বুদ্ধি হইতে দুর্গা, জিহ্বা হইতে সাবিত্রী, মানস হইতে কামদেব এবং বামাঙ্গ হইতে রতি ও রাধিকা উৎপন্ন হন ; রাধার লোমকূপ হইতে ত্রিংশৎ কোটি গোপাঙ্গনা এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে ত্রিংশৎ কোটি গোপ জন্মগ্রহণ করে : আদৌ গোলকবাসী, পরিশেষে বৃন্দাবন নিবাসী ও বৎস পর্যন্ত ও তাঁহার লোমকূপ হইতে উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণ অনুগ্রহ করিয়া তাহার একটি গরু মহাদেবকে দিয়াছিলেন। ঐ পুরাণের সৃষ্টি প্রকরণে সৃজনকর্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কিশোররূপ বর্ণিত আছে, আর তাঁহার বাল্য-লীলার বর্ণনা মধ্যে অনেকানেক অদ্ভুত ব্যাপার বিনিবেশিত হইয়াছে। অতএব যদিও শাস্ত্রে বালগোপালের উপাসনার সুস্পষ্ট আদেশ না থাকে, তথাপি ভাগবতে এবং বিশেষত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তাঁহার বাল্যলীলা বর্ণন পাঠ করিলে ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের বালরূপ উপাসনার বিষয়ে অনুরাগ সঞ্চার হওয়া সর্বতোভাবেই সম্ভব।

যখন শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে পঞ্চ-ভূতাদি নিঃসৃত হইবার প্রসঙ্গ আছে, তখন বলিতে হইবে, বেদান্ত দর্শনের ন্যায় ঐ প্রসঙ্গেও কার্যকারণে অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগতে অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে। আর বল্লভাচারীদিগের শাস্ত্রের মধ্যে বার্তা নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহাতেও জীব-ব্রহ্মের একপ্রকার অভেদভাব স্পষ্টই লিখিত আছে।

তব্ শ্রীআচার্য জীনে কহী। জো তুম্ জীবকো স্বভাব জানতী হো দোষবন্ত হৈ। তো-তুমসো সম্বন্ধ কমে হোয়। তব্ শ্রীআচার্য জীসো শ্রীঠাকুরজী কহে। জো তুম্ জীবকো ব্রহ্ম সম্বন্ধ করো হোঁ তিনকো অঙ্গীকার করোঁ গোঁ।

তখন আচার্য কহিলেন, "তুমি জীবের স্বভাব জ্ঞাত আছ, তাহার সকলই দোষ, তবে কিরূপে তোমার সহিত তাহার সংযোগ হইবে ?" তাহাতে ঠাকুরজা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন, "তুমি ব্রহ্মের সহিত জীবের যেরূপ সংযোগ সাধন করিবে, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া লইব।"

বল্লভাচার্য একটি অসামান্য বিষয়ের বিধি দিয়া গিয়াছেন ; হিন্দুধর্ম প্রচারকের পক্ষে যেরূপ উপদেশ দেওয়া সহসা সম্ভাবিত বোধ হয় না। তিনি কহিয়া গিয়াছেন, পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই ; উত্তম বসন পরিধান ও সুখাদ্য অন্ন ভোজনাদি সমস্ত বিষয়-সুখ-সম্ভোগপূর্বক তাঁহার সেবা কর। বস্তুত এ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা অতিমাত্র বিষয়ী ও ভোগবিলাসী। গোস্বামীরা সকলেই গৃহস্থ। সম্প্রদায় প্রবর্তক বল্লভাচার্য যদিও প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু লোকে বলে, তিনি পুনর্বার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেবকেরা গোস্বামীদিগকে

পরিধানার্থে উত্তমোত্তম বহুমূল্য বস্ত্র প্রদান করে এবং চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুরস দ্রব্য ভোজন করায়।

শিষ্যদিগের উপর গোস্বামীদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; এমনকি, শিষ্যেরা তাঁহাদিগকে তন, মন, ধন তিনই সমর্পণ করিবে, এরূপ স্পষ্ট বিধি আছে। সেবকেরা অনেকেই ব্যবসায়ী লোক। গোস্বামীরাও বহু-বিস্তৃত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং তীর্থ ভ্রমনোপলক্ষে দূরদূরান্তর গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য নির্বাহ করেন।

দেব-সেবার বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। ইহাদিগের গৃহে ও মন্দিরে গোপাল, রাধাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে! এই সমস্ত প্রতিমূর্তি প্রায়ই ধাতু নির্মিত। প্রতিদিবস কৃষ্ণের আটবার সেবা হয়; পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করিতেছি।

১ মঙ্গলারতি। সূর্যোদয়ের অর্দ্ধঘণ্টা পরে শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে উত্তোলন পুরঃসর আসনারূঢ় করিয়া তাম্বুল সংবলিত যৎকিঞ্চিৎ জল-পানের সামগ্রী প্রদান করিতে হয় এবং সে সময়ে তথায় দীপ রাখিতে হয়।

২ শৃঙ্গার। চারি দণ্ড বেলার সময় শ্রীকৃষ্ণ তৈল, চন্দন ও কর্পূর দ্বারা সুগন্ধিত ও বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বার দিয়া বসেন।

৩ গোয়ালা। ছয় দণ্ড হইলে শ্রীকৃষ্ণ যেন গোচারণে যাত্রা করিতেছেন, এইরূপ বেশ ধারণ করেন।

৪ রাজভোগ। মধ্যাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে যেন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভোজন করিতেছেন, এই মনে করিয়া দেবালয়ের পরিচারকেরা বিগ্রহ-সমীপে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অন্যান্য সুখাদ্য সামগ্রী স্থাপন করেন এবং ভোগ সমাপ্ত হইলে পর প্রসাদীদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী উপস্থিত সেবকদিগকে পরিবেশন করিয়া দেন এবং কোন-কোন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শিষ্যের বাটীতেও প্রেরণকরিয়া থাকেন।

৫ উত্থাপন। ভোগান্তে বিগ্রহের নিদ্রা হয়, পরে ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে জাগরিত করিয়া উত্থান করাইতে হয়।

৬ ভোগ। উত্থাপনের অর্দ্ধঘণ্টা পরে বৈকালিক ভোগ হয়।

৭ সন্ধ্যা। সূর্যাস্তসময়ে শ্রীকৃষ্ণের সায়ংকালিক সেবা হয়। তখন তাঁহার দিবা-পরিহিত সমুদায় অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পুনর্বার তৈল ও গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা অঙ্গসেবা করিতে হয়।

৮ শয়ন। অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে বিগ্রহকে শয্যায় স্থাপন পূর্বক

তৎসন্নিধানে পানীয় জল, তাম্বুলাধার ও অন্যান্য শ্রান্তিহর দ্রব্য সমুদায় রাখিয়া পরিচারকেরা দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করেন।

এই সকল সময়ে প্রায় একপ্রকারই সেবা হয়; যথা পুষ্প, গন্ধ ও ভোগদান এবং স্তোত্রপাঠ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। বিগ্রহসেবক এবং অন্যান্য লোকেও এই সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু কৃষ্ণস্তোত্র প্রায় ঐ সেবকেরাই পাঠ করিয়া থাকে।

নিত্য-সেবা ব্যতিরেকে কতকগুলি সাংবৎসরিক মহোৎসব আছে, যথা—রথযাত্র, রাসযাত্রা ও জন্মাষ্টমী। রথযাত্রা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যাতেই বিশিষ্টরূপে হইয়া থাকে পশ্চিমাঞ্চলেরও কোন-কোন স্থানে কিছু-কিছু প্রচলিত আছে। কাশীধামে ও পশ্চিম প্রদেশীয় অন্যান্য অনেক স্থলে জন্মাষ্টমী ও রাসযাত্রায় অতিশয় আমোদ হয়। গ্রাম সন্নিহিত কোন চত্বরে সমারোহ পূর্বক রাসযাত্রার কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কত লোকে শ্বেত, পীত, লোহিতাদি কত উৎকৃষ্ট বসন পরিধান পূর্বক রাস-ভূমিতে সমাগত হয়, কত প্রকার অতি মনোহর নৃত্য-গীত-বাদ্যেরই অনুষ্ঠান হয় ও শ্যামসুন্দরের সুললিত লীলানুরূপ কত কৌতুকই প্রদর্শিত হয়। স্থানে-স্থানে গায়ক, বাদক ও নর্তক সকল স্বেচ্ছানুসারে উপস্থিত হইয়া নিজ-নিজ গুণ প্রকাশ পুরঃসর লোকের মনোরঞ্জন করে এবং দর্শকগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মনোমত পারিতোষিক প্রদান পূর্বক পুরস্কৃত করে। স্থানে-স্থানে তৃণ-গৃহ, বস্ত্র-গৃহ ও পণ্য-শালা প্রস্তুত হয়, মধ্যে-মধ্যে মনোহর দোলনা ও ঝোলনা সকল আলম্বিত থাকিয়া লোকদিগকে অতিশয় আমোদিত করে, অপর্যাপ্ত ফল-মূল ও নানাবিধ মিষ্টান্ন সামগ্রী পরিপাটিক্রমে সজ্জীভূত থাকিয়া সর্বস্থানে সুশোভিত করে এবং দর্শকগণ পরম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে চতুর্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। অসংখ্য লোকের সমাগম! বিচিত্র বসন! বিচিত্র ভূষণ! বিবিধ কৌতুক! পরমাশ্চর্য সুদৃশ্য ব্যাপার! এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া লোকের আমোদের আর ইয়ত্তা থাকে না। বৃন্দাবনেও চান্দ্র আশ্বিন মাস অবধি করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত এই উৎসব হয়। তথায় নদী কূলে পাষাণময় কৃত্রিম বেদির উপর শ্রীকৃষ্ণের অবিকল প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বল্লভাচারীরা ললাটে দুই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া নাসামূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া মিলাইয়া দেন এবং ঐ দুই পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ বর্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। এ সম্প্রদায়ের ভক্তেরা শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বাহু ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের প্রতিরূপ মুদ্রিত করেন এবং কেহ-কেহ শ্যামবন্দী নামক

কৃষ্ণমৃত্তিকা অথবা কৃষ্ণবর্ণ অন্যরূপ ধাতু দ্বারা উল্লিখিত বর্তুলাকার তিলক আলিখিত করিয়া থাকেন। ইহারা কণ্ঠে তুলসীর মালা এবং হস্তে তুলসীকাষ্ঠের জপ-মালা ধারণ করেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জয়গোপাল' বলিয়া পরস্পর অভিবাদন করেন।

বল্লভাচার্য শ্রীভাগবতের একখানি টীকা করেন; ঐ টীকা ইহাদিগের প্রধান সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। তাহাতে ভাগবতের যাদৃশ ব্যাখ্যা আছে, ইহারা তাহাই অবলম্বন করিয়া চলেন। তদ্ব্যতিরেকে তিনি বেদব্যাস-প্রণীত কতকগুলি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং সিদ্ধান্ত রহস্য, ভাগবত-লীলা রহস্য-একান্ত-রহস্য প্রভৃতি অনেকানেক সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়া যান। এ-সকল গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য, কেবল পণ্ডিতদিগেরই ব্যবহার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তদ্ভিন্ন সামান্য সেবকদিগের মধ্যে কৃষ্ণলীলা প্রতিপাদক বহুতর গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা—

বিষ্ণু-পদ: এ গ্রন্থ ভাষায় লিখিত। ইহা বল্লভাচার্য কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে। ইহাতে বিষ্ণু-গুণ-প্রতিপাদক কতকগুলি পদমাত্র নিবেশিত আছে।

ব্রজ-বিলাস: ব্রজবাসী দাস নামে একব্যক্তি এই অনতিক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভাষায় রচনা করেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার বর্ণনা আছে। অষ্টচ্ছাপ, এ গ্রন্থে বল্লভাচার্যের আটজন প্রধান শিষ্যের উপাখ্যান আছে।

বার্তা: এই ভাষা গ্রন্থ বল্লভাচার্য ও তাঁহার মতানুবর্তী ৮৪ জনের ভক্তের অত্যদ্ভুত চরিত্র বর্ণিত আছে। ঐ ৮৪ জনের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়জাতীয় ও সকল বর্ণোদ্ভব লোকই ছিল।

ঐ কয়েকখানি ব্যতিরেকে আরও বিস্তর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, কিন্তু সে সমস্ত তাদৃশ প্রচলিত নহে। ভক্তমালেও এ-সম্প্রদায় সংক্রান্ত অনেক উপাখ্যান আছে। কিন্তু বল্লভাচারীরা অপরাপর সম্প্রদায়ের ন্যায় উহাকে মূল-শাস্ত্র বলিয়া অস্বীকার করেন না। উল্লিখিত বার্তাই ইহাদের ভক্তমাল স্থানীয় হইয়াছে। ভক্তমালের ন্যায় ঐ গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ও আবির্ভাব সূচক অনেকানেক অলৌকিক ও অসম্ভাবিত উপাখ্যান বিনিবেশিত আছে। উহার অন্তর্গত একটি রাজপুতানী অর্থাৎ রাজপুত্রজাতীয় স্ত্রীলোকের উপাখ্যান পাঠ দ্বারা বোধহয়, এ-সম্প্রদায়ের মতে সহমরণের বিধান ছিল না। বল্লভাচার্যের জগন্নাথ ও রানা-ব্যাস নামে দুই শিষ্য নদী-তীর্থে স্নান করিতেছিলেন, এমত কালে ঐ স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সহগমনার্থ তথায় উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া জগন্নাথ সতীর্থ রানাব্যাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম প্রকাশের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার ব্যাপার খানা কি?" রানাব্যাস শিরশ্চালন

পূর্বক কহিলেন,, "শবের সহিত সৌন্দর্যের অনর্থ সংযোগমাত্র।" রাজপুতানী তাঁহার শিরশ্চালনের তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া সহগমনে নিবৃত্ত হইল। কিছু দিন পরে রাজপুতানী অকস্মাৎ একদিন তাঁহাদিগকে দেখিয়া আপনার সহমরণ-নিবারণ-সংক্রান্ত পূর্ব-বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিল এবং তৎকালে তাঁহাদের দুইজনের কি কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাও জানিতে প্রার্থনা করিল। রানাব্যাস নিশ্চিত জানিলেন, রাজপুতানার উপর শ্রীআচার্যের কৃপা হইয়াছে এবং জগন্নাথের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত করিয়া কহিলেন, 'তোমার রূপ-লাবণ্য শ্রীঠাকুরজীর সেবায় সমর্পিত না করিয়া শবের উপর নিক্ষিপ্ত করা অতিশয় অনুচিত ও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।' লিখিত আছে, অনন্তর রাজপুতানী রানাব্যাস-সন্নিধানে উপদিষ্ট হইয়া শ্রীঠাকুরজীর পরিচারণা কার্যে নিয়োজিত থাকিয়া আয়ুঃক্ষয় করিয়াছিলেন।

বল্লভাচার্যের পুত্র বিত্তলনাথ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। এ-সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে শ্রীগোঁসাইজী বলিয়া জানে। বিত্তলনাথের সাত পুত্র ;—গিধরি রায়, গোবিন্দ রায়, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম। ইঁহারা সকলেই ধর্মোপদেশক ছিলেন এবং ইঁহাদের মতানুবর্তীরা যদিও পৃথক্ সমাজভুক্ত; কিন্তু প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রায় সকল সমাজেরই ঐক্য আছে। কেবল গোকুলনাথের শিষ্যদিগের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অপর ছয় সমাজের মধ্যে কিছুই শ্রদ্ধা করে না এবং স্বকীয় সমাজের গোস্বামী ব্যতিরেকে আর কাহাকেও শাস্ত্রবিহিত গুরু বলিয়া স্বীকার করে না। বিত্তলনাথের অন্য কোন পুত্রের মহানুবর্তী লোকেদের এরূপ একতর পক্ষপাত নাই।

নানাস্থানের, বিশেষত গুজরাট ও মালোয়াদেশের বহুতর স্বর্ণবণিক্ ব্যবসায়ী লোকে বল্লভাচার্যের মতাবলম্বী হইয়াছে, এ-নিমিত্ত এ-সম্প্রদায়ে অনেক ধনাঢ্য লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সর্বস্থানে, বিশেষত মথুরা ও বৃন্দাবনে ইহাদিগের বিস্তর মঠ ও দেবালয় আছে। কাশীতে এ-সম্প্রদায়ের দুটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে ;—লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির। ঐ দুই বিগ্রহ অতি বিখ্যাত ও বহু-বিষয়াপন্ন। জগন্নাথক্ষেত্র ও দ্বারকা এ সম্প্রদায়ের অতিমাত্র পবিত্র তীর্থ এবং আজমীরের অন্তঃপাতী শ্রীনাথদ্বারের মঠ সর্বাপেক্ষা মহামান্বিত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। লোকপ্রবাদ আছে, এ-মঠের বিগ্রহ পূর্বে মথুরায় ছিলেন ; আওরঙ্গজেব বাদশাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অনুমতি করিলে পর ঐ সর্বান্তর্যামী বিগ্রহ তথা হইতে

আজমীরে প্রস্থান করেন। তথাকার বর্তমান মন্দির অধিক দিনের নহে, কিন্তু সেবক-দত্ত ধনে তত্রস্থ বিগ্রহের বিস্তর সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে। বল্লভাচারী-দিগের অন্তত একবারও শ্রীনাথদ্বার দর্শন করিতে হয় এবং প্রধান গোস্বামীর সন্নিধানে তদ্বিষয়ের প্রমাণপত্র গ্রহণ করিয়া মঠের আনুকূল্যার্থে যথাসম্ভব কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ দান করিতে হয়।

[ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ]

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অভয়ের কথা

প্রণয়বতী আর্যপুত্রকে 'অজ্জউত্ত' বলিলে যেমন তাহার হর্ষোল্লাস হয়, তদ্বৎ প্রীতি ঠাকুরাণীকে "পিরীতি" বলিয়া সম্বোধন করিলে আনন্দে দেবীর মধুর সুন্দর চন্দ্রবদন আকর্ণ রক্তিমাভ হইয়া সুন্দরতর শোভা-সমৃদ্ধ হয়। এই প্রীতির ঋষি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, নদীয়ার অপরূপ উজ্জ্বল গোরাচাঁদ, গোরাপ্রিয় রামানন্দ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভু, মুসলমান—হরিদাস, রূপ, সনাতন, গোবিন্দ দাসাদি মহাজনগণ, তাঁহাদের প্রিয়-হিত-পদাবলী পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ আপনাদিগকে পবিত্র কৃতার্থ করিয়া লইবেন। উক্ত মহাপুরুষগণ বৈদান্তিক সহ কতকটা একমতে, রসরূপ প্রিয় দেবতা হইতেই জগত উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া জগতের সমগ্র দেশের রসরূপত্ব স্বীকার করেন। জগতে যাহা কিছু দুঃখ বলিয়া প্রতীত হয়, যাহা স্বরূপে দুঃখ নহে, তাহা বস্তুত রসপোষক ও সুতরাং রস-রূপেই অর্থাৎ প্রীতি ঠাকুরাণীর পরিজন ও "সিদ্ধ" উপাসকগণ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—মন্ত্রকে সত্য বলিয়া মান্য করেন। লীলারহিত অভয়ের চর্চা তাঁহারা বড় বেশি পরিমাণে করেন না, লীলাসক্তা সুন্দরের "মধুর" লীলা-রসেরই চিন্তন, পূজন করেন। অথবা কৃপাপ্রাপ্ত যথা—অধিকার ভেদে, অধিকার বশে, বাৎসল্যাদি রসেই রুচিমান হয়েন।

পুরুষটির লক্ষণ এই যে তিনি সেব্য, ভোক্তা। অন্য যাবতীয় স্থির-চর সকলেই তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি রাধিকার রূপভেদে এবং সেবক, ভোগ্য, নারী। সেবকত্বই নারীত্ব। তুমি, আমি, মাতা, পুত্র, কলকণ্ঠ কোকিল, শীতল পবন, আকাশের চাঁদ, ফুল্ল ফুলদল, মন্থরা যমুনা সকলেই সেই এক পুরুষের, ঈশ্বরের —নারী, সেবক, সুখদাতা; হ্লাদিনী পুরুষকে নানারূপে ভালোবাসে, শিষ্য হইয়া গুরুকে, জনক-জননী হইয়া সন্তানকে, সন্তান হইয়া পিতামাতাকে, ভৃত্য হইয়া প্রভুকে, স্ত্রী হইয়া ভর্তাকে, ভর্তা হইয়া পত্নীকে, পরকীয়া হইয়া বর-নাগরকে। এই অলৌকিক ভালোবাসার দৃষ্টান্ত নাই; লৌকিক ভালোবাসা হইতে ইহার অল্প আভাসমাত্র দেওয়া যাইতে পারে। সেই আভাসটুকু অবলম্বন করিয়াই ভালোবাসাকে ভালোবাসিতে হইবে, পূজা করিতে হইবে। হ্লাদিনীর স্নেহে পুরুষের অপূর্ব সুখ হয়।

ভক্তগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় পুরুষকে ঈশ্বর জানিয়া সগৌরবে ভাল বাসিতেন, যথা নন্দিকেশ্বর, হনুমান, গুহক, বিভীষণ, প্রহ্লাদ, নারদ, উদ্ধব, বসুদেব, দেবকী পাটরাণী রুক্মিণী। অন্য এক সম্প্রদায়, পুরুষ যে ঈশ্বর তাহা না

জানিয়া তাঁহাকে নিজদের মতো স্বজাতীয় বোধে, অসঙ্কোচে ভালবাসিতেন, যথা—নন্দ, যশোমতি, সুবল, মধুমঙ্গল, চন্দ্রাবলী, কুন্দ, ললিতা, ঠাকুরাণী রাধা। ইহারা গোবিন্দের বিপদ আশঙ্কা করিতেন এবং অপ্রত্যক্ষ মহাবল কোনও ঈশ্বরের নিকট গোবিন্দের নিরাময় প্রার্থনা করিতেন ; পুরোহিত বরণ করিয়া গ্রহশান্তি করিতেন ; মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ গোবিন্দের দেহে বাঁধিয়া দিতেন, এবং গোবিন্দের রোগ হইয়াছে বুঝিলে বৈদ্য আহ্বান করিতেন।

উক্ত দুই শ্রেণীর ভক্তই বড় ভক্ত। প্রিয় দেবতার বা প্রাণ-গোবিন্দের কোনও বর প্রার্থনা করিতেন না, রাজ্যও না, স্বর্গও না ; বড় জোর কেহ সামীপ্য এবং কোনও সেবাধিকার যাজ্ঞা করিয়া লইতেন ; কোনও অভিমানিনী, বঁধুর সঙ্গে পূব পরামর্শ না করিয়াই বঁধুর সেবায় কায়মনোবাক্যের যাবতীয় চেষ্টার শুভ বিনিয়োগ করিতেন।

যশোদার বাৎসল্য, সুবলের সখিত্বাদি অলৌকিক রস, লৌকিক বাৎসল্য, সখিত্ব হইতে কথঞ্চিৎ যেন বুঝা যায়। পরন্তু মধুর রস বুঝা যায়ই না বলিলে চলে। কৃপা ব্যতীত ইহার জাগরণ জীব-হৃদয়ে হয় না ; যখন হয়, তখন জীব কোন দৃষ্টান্ত-উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া তাহার আস্বাদন সহজেই পায়। অবশ্য যশোদার কৃষ্ণ-অদর্শনে ও রাধার কৃষ্ণ-অদর্শনে যে উৎকণ্ঠা তাহা ওজনে তুল্যই ; এবং যশোদা-কৃষ্ণ বা রাধা-কৃষ্ণ মিলনে উভয়েই তাহাদের পূর্ণ তৃপ্তি ; কিন্তু তথাপি তটস্থের পক্ষে ভাবে ও রকমে রসের প্রভেদ ও উৎকর্ষ আছে। মধুরই মহোৎকৃষ্ট রস, মধুরই সর্বপ্রধান সেবা। সকল পুষ্পের নানাজাতীয় সকল সৌরভ যথা সংগৃহীত হইয়া মধুতে রক্ষিত হয়, সেইরূপ মধুর-রসে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি সকল রসেরই সমাবেশ আছে। গৌরী-শঙ্করের, সীতা-রামের, মহিষী রুক্মিণী ও দ্বারকানাথের সংযত বৈধ প্রণয়ে (?), এবং রাধা-শ্যামের মনোহর চপল-চরিতে অন্য সকল রসই বর্তমান। ঠাকুরাণী স্বহস্তে গোবিন্দের জন্য মিষ্টান্নাদি পাকে ও ফুলশয্যাদি রচনা দ্বারা গোবিন্দের দাসী ; নিজ কণ্ঠের পুষ্পহার পুষ্পকণ্ঠে দিয়া ও নানা রসালাপে তৃপ্তি দান করিয়া গোবিন্দের সখী ; শ্রান্ত গোবিন্দের ঘর্মলাঞ্ছিত সুন্দর বদন নিজাঞ্চলে মুছাইয়া ও ব্যজনাদি করিয়া জননীর মতো স্নেহবতী ; কিসে কৃষ্ণ সুখী হয় তাহা "নিজ অনুমানে" জানিয়া চর্বিত তাম্বুল কৃষ্ণমুখে দিয়া ও প্রণয়ানুরোধে দুস্ত্যাজ্য কুলশীলে অনাদরপূর্বক দেহ পর্যন্ত দান করিয়া প্রেয়সী-প্রধানা। বৈধ প্রণয় বলিয়া কোন বস্তু নাই। সীতারামের কিম্বা অন্য কোনও প্রসিদ্ধ যুগলের অন্যোন্য প্রণয়ের হেতুটি বিবাহ নহে। প্রণয়টি অহৈতুক। প্রসঙ্গগত বিবাহের কথা কিছু বলিব ;

স্বয়ংবরার বা পিতৃদত্তার বা অন্যবিধার সহ যে মিলন বা বিবাহ-উৎসব তাহার বটে সামাজিক মর্যাদার ইয়ত্তা নাই। বিবাহিতাই দেবী—সমাজের কল্যাণ বিধাত্রী; যেহেতু উচ্ছৃঙ্খলতার নিদারুণ হস্ত হইতে ইনি যাবতীয় সমাজকে বহু দিন হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহাও জানিবেন যে, বিবাহের মর্ম সামাজিক কুশল হইতে আরও গূঢ়। পতিসেবার পাতিব্রত্য হইতে, অর্থাৎ সামাজিক পত্নীত্ব হইতে, পতির অধিক মঙ্গল—পারলৌকিক মঙ্গল নারীরই হস্তে আছে, সেইজন্য ইহার নাম সহধর্মিণী। 'বৈধ প্রণয়' শব্দটি 'সোনার পাথর বাটি' শব্দের মতো। ইহা হয় ত হয়, হইলে নিষেধ মানে না। ইহা সহজ বস্তু—না বিধির অধীন, না নিষেধের অধীন। রাধা-গোবিন্দের প্রীতি বৈধ নহে, অবৈধও নহে; ইহা অলৌকিক, ও জীবের চরম ইষ্ট। বিবাহিতের প্রণয় অপেক্ষা রাধা-শ্যামের প্রীতিতে কিছু দুর্বিজ্ঞেয় অতিশয় আছে এতদপেক্ষা দুর্লভতর বস্তু মানবের কল্পনার অতীত।

লৌকিক মধুর-রস দ্বারা সৌন্দর্যপূজায় যথেষ্ট আদর সোহাগ স্নেহাদি উত্তম উপকরণ থাকিলেও তাহাতে একটা অভিসম্পাত আছে; তাহা "কাম", "স্বার্থ" "নিজ সুখ"—পুরুষে কি নারীতে। অলৌকিক মধুর-রসে "কাম" নাই। কৃষ্ণ হইতে রাধা নিজে সুখ চাহে না; কৃষ্ণকেই সুখী করিতে চাহে; তথা কৃষ্ণ নিজ সুখের জন্য রাধার সহিত মিলিত হইবার "কামনা" রাখে না, মিলিত হইলে শ্রীমতী সুখী হইবে জানিয়াই শ্রীমতীকে সুখী করিবার জন্যই কৃষ্ণ রাধাসহ মিলিত হয়। কায়িক, বাচিক, মানসিক সর্বপ্রকার সেবাতে কৃষ্ণকে সুখী করিতেই হয়, ও হইলে গোপী অবশ্য সুখী হয়। এই ব্যবহারটি লৌকিক নয়; ইহা ব্যবহার বটে, কিন্তু ইহা বিপরীত ব্যবহার; বিম্ব-প্রতিবিম্ব একরূপ হইলেও যথা বিলক্ষণ, দুহিতা-চুম্বন ও কান্তা-চুম্বন যথা ভাবে একরূপ ব্যাপার হইয়াও ভাবে অত্যন্ত পৃথক; তথাই, কালে সঙ্গতি ও প্রীতি—মিলন অরসিকের স্থূল দৃষ্টিতে অন্যরূপ বোধ হইলেও, ভাবে মরমে নিরতিশয় বিপরীত, ও ইহা বিস্ময়কর। প্লেটো (Plato) মহাশয় ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে।

গোপীর সকল চেষ্টার তাৎপর্য কৃষ্ণসুখে। গোপী কৃষ্ণের সেবাই ইচ্ছা করে; কৃষ্ণকে কামে, নিজ সুখের জন্য, ভোগ করিতে চাহে না; কিন্তু যদি বুঝে যে, গোবিন্দ আলিঙ্গনে অভিলাষী, তবে গোপী যথা দেহাংশ হস্তদ্বারা গোবিন্দের পদ "সেবা" করে, সেইভাবে সেবারূপেই, সমগ্র দেহ, আলিঙ্গন চুম্বনের জন্য অকাতরে দান করে এবং তাহাতে কৃষ্ণ সুখী হয় বলিয়াই গোপী নিজে অপরিমিত

সুখানুভব করে। এই ব্যাপারটিই আমাদের অ-পরোক্ষ নহে, ইহা যোগে-যাগে আমাদের কল্পনাগোচরমাত্র হইলেও হইতে পারে। গোপী নিজে সেবক-অর্থাৎ নারী অভিমান রাখে, এবং নন্দ-সুবলাদি সকলেই নিজের মতো সেবক অর্থাৎ নারী বুঝে; মনে করে যে, সুন্দর গুণবান গোবিন্দকে দেখিয়া আমার যেমন সর্বতোভাবে সেবা করিবার লোভ হয়, তেমনই অপর সকলেরও হয়। নিজে ও অপর সকলে নারী হওয়ায় গোবিন্দ ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষ গোপী দেখে না; সুতরাং কোনও দ্বিতীয় পুরুষে অনুরাগ—সম্ভাবনামাত্র গোপীর নাই। সুতরাং গোপী একনিষ্ঠ সহজ সতী। ব্রজবাসী পুরুষদেহী সুবলাদিও ধাতুগত নারী, পরমপ্রিয় কৃষ্ণ-সেবার চিন্তায় পূর্ণমনস্ক, কোনও ইতর চিন্তার অবসর শূন্য। 'সোঽকাময়ত…প্রজায়েয়'—শ্রুতির "কামের" কথা বলিতেছি না, কাম নামে নিজ ইন্দ্রিয়মূলক নরনারীর চেষ্টাবিশেষের উল্লেখ করিতেছি।

অপিচ, জগৎ সৃষ্টি হইবার পরে কামের জন্মলাভ হইয়াছে। কিন্তু জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও পরমা-প্রকৃতি রাধিকার প্রেমালিঙ্গনে সুখবদ্ধ হইয়াই পরম পুরুষ গোবিন্দ বর্তমান ছিলেন; তখন কাম ছিল না; এখনও লৌকিক কাম সৃষ্টির পরেও রাধাশ্যামে সেই অলৌকিক প্রীতিই আছে; কাম নাই। রাধিকার নিজ সুখে অভিসন্ধি নাই, প্রিয়-সুখের জন্যই অবিরাম যত্ন আয়োজন আছে। যে তিনটি সামগ্রী লইয়া মাধুর্য, তারুণ্য, কারুণ্য, লাবণ্য, তাহা গোপীর যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। গোবিন্দ মাধুর্য হইতে সুখী হয়েন, তাহাই গোপী নিজ মাধুর্যকে মধুরতর করিতে সদাই সচেষ্ট।

মধুর প্রীতি, পুরুষে বা নারীতে পুরুষে-নারীতে হয় না; ইহা নারী-পুরুষেই হয়। লৌকিক আমরা পুরুষদেহে অভিমানী হইয়া আপনাদিগকে ভ্রমে পুরুষ মনে করি; লৌকিক নারীগণও পুরুষদেহ দেখিয়া তত্রস্থ জীবগণকে ভ্রমে নানা পুরুষ মনে করে; ফলে স্বার্থ অর্থাৎ নিজ-নিজ কামতৃপ্তির লালসা হইতে, কদর্য পরকীয়াদি ভাবের আরোপ মধুর রসে হইয়া যায়। উজ্জ্বল রস অতি পবিত্র; তত্র এক অদ্বিতীয় পুরুষ ব্যতীত সকলেই সেবক, নারী; সুতরাং পরস্পর কামশূন্য এবং সকলেই নিজ-নিজ ভাব অনুসারে "এক" পুরুষ গোবিন্দে অনুরক্ত। লৌকিক পরকীয়া রসে একটা উন্মাদকরী তীব্র উৎকণ্ঠা আছে; তাহাই মাত্র অলৌকিক প্রীতির তীব্রতা, গাঢ়তা, অসাধারণতা, অন্যোন্যদুর্লভতা, আনন্দ—ব্যাকুলতাকে কথঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্য উল্লিখিত হয়। লৌকিক রসে তীব্রতা থাকিলেও ভোগসামর্থ্য থাকে। অলৌকিক রসের তীব্রতরতা, অতিতীব্রতা এই যে, তাহাতে শরীর স্তম্ভিত, মন পবিত্রভাবে পুলকিত, মদন মূর্ছিত, ও

ভোগসামর্থ্য অন্তর্হিত থাকে। বস্তুত রাধা-শ্যামের প্রীতি স্বকীয়া প্রীতি; রাধার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় পুরুষ না থাকায় পরকীয়া প্রীতি প্রসঙ্গটা আসলে একেবারেই ভিত্তিশূন্য। ইহা রসোল্লাসের জন্য কল্পিত মাত্র। রাধার পক্ষে নন্দও নারী, সুবলও নারী, রাধার স্বামী অভিমন্যুও নারী।

রাধাশ্যামের রাজ্যে মদন বা মদনপীড়া নাই। বিরহ-জ্বালা মদন-পীড়াবশতঃ নহে, সকল নারী ভালোবাসে একই প্রাণ-গোবিন্দকে, প্রিয়-গোবিন্দকে, জয়-গোবিন্দকে। গোবিন্দই পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ নাই; সকল গোপীই সুতরাং সহজ পতিব্রতা, বিনা-বিচার, বিনা-শাসন, বিনা-বিধি। ভালোবাসার পাত্রকে না দেখিতে পাইলে, না চুম্বনালিঙ্গন করিলে, না চুম্বিতালিঙ্গিতা হইলে—গোপী বিরহকাতরা হয়। ব্রজভূমিতে মদন নাই। দ্বারকায় ভবিষ্যতে প্রদ্যুম্নের জন্ম হইবে। বর্তমানে রাধা গোবিন্দের আলিঙ্গনে মদন মধ্যস্থ নহে। মিলনে, বিরহে, সুখে, জ্বালায়, আছে কেবল—স্বার্থশূন্য শুদ্ধ প্রীতিমাত্র। শিবজীও মদনকে ভস্ম করিয়া পরে কেবল শুদ্ধা প্রীতির দুর্লভ অনুভব করিবার লোভেই দেবীকে স্বীকার করিয়াছিলেন। রসিক বিবেচক ভক্তগণ ভস্মীভূত মদন এবং মূর্ছিত মদনের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ অনুভব করেন। বিদ্বদনুভব নাকি প্রমাণ চূড়ামণি। লৌকিক নরনারী দেহের গঠন চিহ্নভেদ অবলম্বন করিয়া কাম আপনাকে ব্যক্ত করে, অলৌকিক রাধা-শ্যাম দেহে গঠনভেদ বর্তমান থাকিলেও তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়েরই অত্যন্ত বিস্মৃতি, সুতরাং কন্দর্প-অনুপস্থিত অথবা উপস্থিত হইয়াও মূর্ছিত; অথচ পরস্পরের সর্বাঙ্গীন আলিঙ্গন সর্বাঙ্গ-চুম্বনে অতি চঞ্চল আগ্রহ ও মহতী প্রীতি। জীবদেহে, পুষ্প-শরীরে, নর ও নারীভেদ পরাগ ও গর্ভকেশর ভেদ আছে। কখনও-কখনও একই ফুলে পুরুষ কেশর ও আধার কেশর দেখা যায়। অভিষিক্ত নর ও নারী নিজদেহে একাধারেই কুণ্ডলিনী শক্তি ও শিব পুরুষ এবং শক্তি পুরুষের মিলন জাত পরমানন্দ অনুভব করিতে চাহেন। যথা একটি চণক লও; দেখিবে ত্বগাবরণ অন্তঃপুরে দুইটি দল বা দানা আছে, তাহারা ভবিষ্যতে অঙ্কুর উৎপাদন করিবে; সুতরাং তাহারা নর-নারী, কিন্তু গঠনে এত সমান যে কোন্‌টি পুরুষ, কোন্‌টি নারী ধরা যায় না; তাহারা পরস্পর দৃঢ়ালিঙ্গিত। চণকবৎ রাধাশ্যাম—যুগলের কে যে নারী, কে যে পুরুষ এই অনুসন্ধান উভয়েরই নাই; তাহা তাহারা ভুলিয়াছে এবং ভোলা-অবস্থাতেই শুদ্ধ প্রীতিবশতঃ নিবিড়ালিঙ্গন—সুতৃপ্ত; কত যে তাহাদের অন্যোন্য প্রীতি তাহার পরিমাপক কিছু নাই, তুলনা নাই; তাহা নিষেধ-মুখে বুঝিতে হয়। তত্রবিলোল-তরঙ্গ

কটাক্ষ আছে ; যুগল-শরীরে স্বেদকম্প আছে, উভয়ের মুখে চক্ষুতে ভুবনভুলান হাসি আছে, মহাভাবব্যঞ্জক রুদ্ধকণ্ঠ আছে এবং কোমলাভিরাম বাহু-বেষ্টন আছে ; কিন্তু "নাই" মদন। লৌকিক রস হইতে কাম-নিষেধে অলৌকিক প্রীতি কথঞ্চিৎ বুঝা যায়, যেমন "ক"-এর ভিতরে "ব" আছে ; "ক"র আঁকড়ি নিষেধে "ব" পাওয়া যায়। তত্র কেবলা শুদ্ধ প্রীতিরই ভরপুর প্রকাশ ও আধিপত্য। প্রীতির মিলন পুরাতন হয় না। প্রীতি মিলনই প্রথম সমাগমের মতো সমান উল্লাসময়। এই প্রীতি নিষেধ-মুখে বুঝাইতে হয় বলিয়াই প্রথমে কামের উল্লেখ করিতেই হয়। বালকাদি যাহারা কাম বুঝে না, তাহারা মধুর প্রীতিও বুঝিতে অক্ষম ইহা মণিপদ্ম, গৌরীপট্টাসনে শিব, Rose and cross প্রভৃতির পূজা নহে। ইহা প্রজাসৃষ্টির অর্থাৎ জননী শক্তির অথবা প্রজননাভি-প্রায়-বর্জিত রতি কামেরও উপাসনা নহে, ইহা কামগন্ধশূন্যা প্রীতি ঠাকুরাণীর দ্বারা প্রিয় গোবিন্দের সেবার কথা। শ্রীমতীর বড়ই বিস্ময় হইত : নিজের কলঙ্ক-কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেন না ; বলিতেন যে, রাখাল বালকেরা কৃষ্ণ সঙ্গ করে, কৃষ্ণালিঙ্গিত হয়—তাহাদের কোনও কলঙ্ক রটে না, কেহ তাহাদের সম্বন্ধে কোনও বিঘ্নাচরণ করে না ; কিন্তু আমি সেই শ্যামল সুন্দরেরই সহ মিলিত হইলে কেনই বা আমার অপযশ ও এত বিঘ্নবিস্তার হয় ? ইহা সরল প্রীতির সরল মরম কথা। ইহা স্পষ্টই পবিত্র উজ্জ্বল রস, ইহাতে কাম কোথায় ?

আমাদের মধ্যে যিনি যতটা নিষ্কাম, সংযমী, সচ্চরিত্র ও নিষ্পাপ হইবেন, তিনি প্রীতিঠাকুরাণীকে ততই অধিক বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু যতই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার ততই "বোধ" হইবে যে—তিনি অজ্ঞ, পতিত ও দেবীর কৃপার অযোগ্য। তাঁহার সর্বদা একটা উৎকণ্ঠা জাগরূক থাকিবে যে, কবে বা কৃপা হইবে, কবে যুগলপ্রীতির মরম বুঝিব ? এই ব্যক্তিই গুরু, নরোত্তম। ইনি নর হউন, আর নারী হউন, তুমি নর হও, নারী হও—ইঁহার সঙ্গ কর, ইঁহার শরণ লও।

বেদান্তের ব্রহ্ম মহাশয়ও যেমন অটল, নির্বিকার, হ্লাদিনী রাধিকার ভালোবাসাও তেমনি ধৈর্যচ্যুতিকরী, বিবেকহারিণী, মহোল্লাসকারী। শ্রীমতী জাতিকুল বিসর্জন করিয়া ব্রহ্ম গোবিন্দকে ভালোবাসে এবং বিনিময়ে কিছু চাহে না। গোবিন্জী বড় ফাঁপরে পড়িয়া গিয়া ঋণী হইয়াছেন। ঠাকুরাণীর নিঃস্বার্থ পীরিতির বিনিময়ে যাহা কিছু তিনি দিতে প্রস্তুত, তাহা ঠাকুরাণী অঙ্গীকার করে না। সর্বশক্তিমান এবং পরম চতুর হইয়াও গোবিন্দ এমন কিছু বস্তু আবিষ্কার করিতে অক্ষম, যাহাতে দেবীর লোভ হইতে পারে। স্ববশ,

স্বতন্ত্র, নির্বিকার গোবিন্দ উপস্থিত অবশে প্রেম পরতন্ত্র ও রাধা-বশ। রাধা ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য নিরুপায় গোবিন্দ—রাধা তাঁহাকে যতটা ভালোবাসে, রাধাকে ততটা ভালবাসিবার চেষ্টা করেন। পারেন না, ঋণশোধ রূপ উদ্দেশ্য ও চেষ্টা এই দুটি বস্তু গোবিন্দের ভালবাসাকে রাধার অহেতুক সহজ ভালবাসা হইতে ন্যূন করিয়া ফেলে, রাধার গোবিন্দ-প্রীতিতে কোনও উদ্দেশ্য বা চেষ্টা নাই—তাহা নিরতিশয় সহজ, স্বাভাবিক। সুতরাং গোবিন্দ ঋণী; ঠাকুরাণীই মহাজন। গোবিন্দ ভুবনমোহন বটে; কিন্তু শ্রীমতী ভুবনমোহন-মোহিনী। গোবিন্দও ব্রহ্ম, রাধিকাও ব্রহ্ম - তবে, বড় ব্রহ্ম; প্রীতিই আনন্দ, হ্লাদিনী রাধাই ত গোবিন্দের ব্রহ্মত্ব।

রাধাগোবিন্দ নিত্য তৃপ্ত, লীলা করিয়া তাহাদের কোনও নিজ তৃপ্তি সম্পাদন করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। প্রশ্ন উঠে যে, তবে লীলার হেতু কি? হেতুটি তাঁহাদের অসীম করুণা। এই যে রাধার জয়ে পরাজিত গোবিন্দের আনন্দলীলা, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, হতভাগ্য জীবের সৌভাগ্য হউক; জীব এই মধুর হইতে সুমধুর অলৌকিক প্রীতিদেবীর জয়লীলারস চর্চা ও আস্বাদন করুক। হে জীব, তুমি তরুণ যুগলের এই করুণ ব্যবহার স্মরণ করিয়া নিত্য কৃতজ্ঞ হও ও রাধা-গোবিন্দের নিত্য জয়গান কর।

অলৌকিক অর্থাৎ স্বার্থশূন্য প্রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেও জীব পরস্পর দ্বেষ ত্যাগ ও প্রীতি অনুভব করিবে; তাহার স্বভাব ক্রমেই শুদ্ধ ও বিষয় বিশেষে বজ্র হইতে কঠিন, ও কিরীচ হইতেও কোমল হইতে থাকিবে। নরদেহীগণ কর্মবীরগণ কর্মবীর হইবে, নারীদেহী শক্তিরূপিনীগণ সেই কর্মভারক্লিষ্টগণকে —পিতা, স্বামী, ভ্রাতাকে—অসহায় শিশুর প্রতি স্নেহময়ী মাতার মতো— ভালোবাসা দিয়া, সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত করিয়া, তাহাদের অন্তরে বল সঞ্চার করিবে। পতি-পত্নী উভয়ে একত্রে রাধা-গোবিন্দ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া—উভয়েই শয়নমন্দিরে একের প্রমাদ-সময়ে অপরে অপ্রমত্ত থাকিয়া পরস্পর নিষেধ পূর্বক, কামবর্জনাভ্যাস পথে উভয়েই সখীভাবে, দুর্লভ যুগলভজনাধিকার লোভে, পরস্পর জ্ঞাতসারে নিজ-নিজ নারীত্ব উপলব্ধির চেষ্টায় অন্যোন্য উত্তরসাধক হইবে। পত্নীর এই উত্তরসাধকত্বই সহধর্মিণীত্ব। নরনারীমিলনের—বিবাহের সামাজিকত্ব হইতে এই সহধর্মিণীত্বই পরম গৌরব। প্রত্যেক নবদম্পতী, প্রথমে না পারেন, মধ্য যৌবনেই কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। কল্যাণকামী বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণও নিশ্চয় করিবেন। তাঁহাদের আয়ু অল্প; উদ্যোগে অবহেলা করিলে চলিবে না। মৃতের সাধনও নাই সিদ্ধিও নাই।

"সংসার গোবিন্দের; আমি গোবিন্দ-নিয়োজিত; গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রই আমার পূরাবেতন; শিষ্টগণ, অসহায় শিশুগণ, দুর্বলচিত্ত যুবক-যুবতীগণ ও অপটু বৃদ্ধগণ গোবিন্দের পরিজন; আমি তাহাদের রক্ষণ-পালনের জন্য নিযুক্ত"—এঁই কথাটা বুঝিয়া জীবন নির্বাহ কর, প্রহ্লাদের মতো। ইহা ঈশ্বর গোবিন্দের পূজা। অথবা যদি অকাম শুদ্ধ প্রীতির উদ্দেশ পাইয়া থাক, তবে ললিতার মতো ঠাকুরাণীর পূজা কর, ঠাকুরাণীকে পাইলেও তত্র তাঁহার প্রিয়, তদধান গোবিন্দকেও পাইবেই পাইবে। ইহা যুগল উপাসনা, চরম ইষ্ট। কামের ক্ষয় ও যুগল প্রীতির উদয় অপেক্ষা—অর্থাৎ রাধা-গোবিন্দের কৃপায় রাধা-গোবিন্দের সামীপ্য প্রাপ্তি অপেক্ষা ইষ্টতর সম্পত্তি রাধা-গোবিন্দের ভাণ্ডারেও নাই। আত্মসমর্পণ হইতে অধিক দান সর্ব-শক্তিমানেরও সাধ্যাতীত।

("অভয়ের কথা ও ঠাকুরাণীর কথা")

বিপিনচন্দ্র পাল

রসের রূপ

বাৎসল্য ও মাতৃমূর্তি

ভালোবাসার কি কোনও আকার আছে? সাকার নিরাকার সম্বন্ধীয় বাদবিতণ্ডায় কখনও-কখনও এই প্রশ্নটা তোলা হয়। আর সচরাচর ইহাতে সাকারবাদিগণকে একরূপ নির্বাক ও নিরুত্তর করিয়াই তোলে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে একান্ত সাকারবাদী না হইয়াও, ভালবাসার কি কোনও আকার বা রূপ সত্যসত্যই নাই?—এ প্রশ্নটাও বোধহয় তোলা যাইতে পারে।

তবে ভালবাসা বস্তুটা এক জাতীয় নহে। ভালবাসা কতকগুলি আন্তরিক অনুভূতির একটা সাধারণ নাম। আমরা সন্তানকেও ভালবাসি, স্ত্রী বা স্বামীকেও ভালবাসি, বন্ধুবান্ধবদিগকেও ভালবাসি। কিন্তু এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রে, ভালবাসা তিন আকারে প্রকাশিত হয়। সন্তানের প্রতি ভালবাসাকে আমরা বাৎসল্য বলি, স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাকে মাধুর্য, তারি বন্ধু-বান্ধবের প্রতি ভালবাসাকে সখ্য বলিয়া থাকি। এই বাৎসল্য, মাধুর্য এবং সখ্য এক জাতীয় বস্তু হইলেও, ঠিক এক বর্ণের নহে। বাৎসল্যে ও মাধুর্যে, মাধুর্যে ও সখ্যে এবং সখ্যে ও বাৎসল্যে পরস্পরের প্রভেদ বিস্তর। সুতরাং ভালবাসার রূপ বা আকার যদি কিছু থাকে, তাহা এই তিন ক্ষেত্রে তিন প্রকারেই প্রকাশিত হইবে। বাৎসল্যের রূপ যাহা, তাহা মাধুর্যের রূপ হইতে পারে না। আর সখ্যের রূপ এক দুই হইতেই ভিন্ন হইবে।

আর বাৎসল্যাদির কি কোনও রূপ বাস্তবিকই নাই? ভালবাসাটা অন্তরের বস্তু সত্য। কিন্তু বাহিরে যে এই আন্তরিক ভাব সর্বদাই নানাভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে, ইহাও প্রত্যক্ষ কথা। এইরূপ অভিব্যক্তি ব্যতীত আমরা যে একে অন্যকে ভালবাসি ইহা কিছুতেই জানিতে বা জানাইতে পারিতাম না। প্রথমত আমরা ইহাকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকি। সন্তানকে, পতি বা পত্নীকে, বন্ধুবান্ধবকে আমরা যেভাবে সম্বোধন করি, তাহার ভিতর দিয়া আমাদের এই সকল বাৎসল্যাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাষায় অন্তরের রসাদির যে অভিব্যক্তি হয় তাহাকে রূপ বলা চলে না। ভাষা রসের সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র, তাহার গুণও নয়, রূপও নয়। যাদু, বাছা, অন্ধের নড়ি, ঘাটের ধন, এসকল বাৎসল্য সূচক কথার সঙ্গে বাৎসল্য বস্তুর কোনও অপরিহার্য ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। কোনও জনক বা জননী আপনার সন্তানকে ওভাবে সম্বোধন নাও করিতে পারেন, অথচ তাহাতে আমাদের অন্তরের বাৎসল্যের অভাবও বোঝাইবে না, আর সে রসের স্ফূর্তির কোনও বিশেষ ব্যাঘাতও জন্মিবে না। যেমন ভাষায়

ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত হয়, সেইরূপ বাহিরের আচার আচরণেও অন্তরের ভাব প্রকাশিত হয়। স্বামী-পুত্রের সেবার ভিতর দিয়া সন্তানবতী সতীর মাধুর্য ও বাৎসল্য আপনার চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়া থাকে। এই সকল সেবা-যত্নের ভিতর দিয়াও তাহাদের অন্তরের ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সকল সেবা-যত্নের সঙ্গে বাৎসল্যের বা মাধুর্যের কোনও নিত্য ও অপরিহার্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। কোনও বিশেষ কারণে এই সেবা-যত্ন করা অসম্ভব বা অপ্রার্থনীয় হইতেও পারে। কিন্তু এই সেবা যত্নের অভাব সর্বত্রই যে অন্তরের রসের অভাব বা এ সেবা যত্নের অল্পতা যে সে রসের লঘুত্ব বুঝাইবে, এমন বলা যায় না। সুতরাং ভাষায় রস বিশেষের যে-অভিব্যক্তি হয়, তাহা যেমন সে রসের রূপ নহে, সেইরূপ আমাদের আচার-আচরণে তাহার যে বহিঃপ্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকেও সে রসের রূপ বলা যায় না।

ভাষাতে বা আচার-আচরণে রসের যে প্রকাশ হয়, তাহা সর্বত্র এক নহে। আমরা যে কথায় বাৎসল্য প্রকাশ করি, ইংরেজ ঠিক সে কথা ব্যবহার করেন না। আমাদের দেশে প্রাচীনেরা পাত্র ব্যবহারে অনেক সময় পুত্রকে "প্রাণতুল্যেষু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইংরেজি ভাষায় এইরূপ সম্বোধন অতিশয়োক্তি বলিয়াই গণ্য হইবে। ইংরেজ সমাজে ইহা শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া বিবেচিত হইবে কিনা সন্দেহ। অন্যপক্ষে আমাদের দেশে পত্নীকে সকলের সমক্ষে প্রথম যৌবনে ডার্লিং (Darling) বা ডিয়ার (Dear)—বাছাধন বা প্রিয়তম বলিয়া ডাকা, আর বয়োবৃদ্ধিতে ক্রমে প্রেম যখন পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইয়া "স্নেহসারে" পরিস্ফুট, সেখানেই তারই সঙ্গে-সঙ্গে রসের সঞ্চারও অনিবার্য। আর রস যেখানে ফুটে, সেখানে অবশ্যম্ভাবীরূপে কর্মচেষ্টাও প্রকাশিত হইবেই হইবে। আর বোধ, রস, চেষ্টা এই ত্রিপাদে জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই তিনের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য যেখানে হয়—অর্থাৎ বোধ যেখানে তাহার রসের সঞ্চার করে, এই রস সেখানে তার যথাযোগ্য চেষ্টাকে জাগাইয়া তুলে -- আর ইহারা তিনে মিলিয়া যেখানে পরস্পরে পরস্পরের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করে, সেখানেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কথাটা ভাবিয়া দেখিলেও, রসের সঙ্গে দেহীর পক্ষে একদিকে ইন্দ্রিয় বোধের ও অন্যদিকে কর্মচেষ্টার সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী, ইহা বুঝিতে বড় গোল হইবার আশঙ্কা আর থাকে না। আর তখন রসের রূপ যে নিতান্ত নিরাকার হইতেই পারে না, এ-সিদ্ধান্তটাকেও ঠেলিয়া ফেলা সম্ভব হয় কিনা সন্দেহ।

আমার পূর্ব প্রবন্ধের মুখবন্ধে ভালবাসার আকার রূপ সম্বন্ধে যে কথাটা

তুলিয়াছিলাম, তাহাকে আর একটু বিশদ করিবার জন্য, এখানে এতগুলি কথা বলা হইল। এমন সোজা কথাটা যে কেহ গোলমেলেভাবে বুঝিবেন বা বুঝিতে পারেন, ইহা তখন ভাবি নাই, নতুবা সেইখানেই ভালবাসা প্রভৃতি রসের সম্বন্ধে রূপ কথাটা ব্যবহার করা যে অসঙ্গত নয়, ইহার আলোচনা করিতাম।

আমি যদিও রসের রূপ কথাটা ব্যবহার করিয়াছি, আমাদের দেশের রসশাস্ত্রে এতদপেক্ষা একটা বেশি গুরুতর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁরা খোলাখুলিভাবে রসের মূর্তির কথাই বলিয়াছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ রাগিণীর মূর্তির কথার উল্লেখ আছে। রস-শাস্ত্রে রসমূর্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আর সর্বশ্রেষ্ঠ রসশাস্ত্র যে ভক্তিশাস্ত্র, তাহাতে ভক্তির উপজীব্য ভগবানকে "নিখিলরসামৃতমূর্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ-মূর্তি সাকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, নিরাকার অর্থাৎ সর্ববিশেষণশূন্যও নহে, কিন্তু ইহা চিন্মূর্তি। মহাপ্রভু কাশিধামে প্রকাশানন্দ স্বামীর সঙ্গে বিচারে বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম শব্দ মুখ্য অর্থে কহে ভগবান
চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ সমান।
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥

ভগবানের "নিখিল রসামৃত মূর্তিটি" চিদমূর্তি জড়মূর্তি নহে। সুতরাং রসের রূপের কথা তুলিলেই যে সে রূপকে সর্বথা জড়ধর্মাপন্ন বলিয়া নির্দেশ করা হয়, এমন কথা ভাবিয়া লইবার কোন হেতু নাই।

অন্যপক্ষে এইরূপ যে, অন্তত আমাদের চক্ষে ও জ্ঞানে, সর্বপ্রকার জড় সম্পর্ক শূন্য, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে সুতরাং কোনও রস যতক্ষণ না আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর, বিশেষত আমাদের চক্ষুগোচর হয়, ততক্ষণ তাঁহার যে যে রূপ আছে, ইহা আমরা জানিতে বা বুঝিতে পারি না। সুতরাং রসের রূপ বলিতে আমরা রসবিশেষের আবির্ভাবে জীবদেহে যে সকল বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয়, কেবল সেই বস্তুকেই জানি ও সেই বস্তুকেই বুঝিয়া থাকি। বাৎসল্যভাব যখন জননীকে অভিভূত করিয়া, তাঁহার স্নায়ু-মণ্ডলকে অধিকার করে, ও সেই স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্যে তাঁহারা শরীরের শোণিত প্রবাহ ও পেশি সমূহকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার দেহ যষ্টিতে একটা বিশেষ ছবি ফুটাইয়া তুলে, সেই ছবিটিকেই বাৎসল্যের সত্যকার রূপ বলি। এরূপ নিত্য

অর্থাৎ যেখানে বাৎসল্য একটা বিশেষ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়, সেখানেই এই ছবিটি ফুটিয়া উঠে। এইরূপ সার্বজনীন অর্থাৎ সভ্য-অসভ্য, শ্বেত-কৃষ্ণ, বিজ্ঞ-অজ্ঞ সকল জননীতেই ফুটিয়া উঠে। এইরূপ সার্বভৌমিক সকল দেশেই ইহার প্রকাশ হইয়া থাকে।

আর রসের এ-সকল প্রকাশ জীব দেহেতেই হয় বলিয়া, তাহার রূপ বা মূর্তি আছে বলা কিছুতেই অসঙ্গত হয় না।

পূর্ব প্রবন্ধে আমি বাৎসল্য রসের রূপ বা মাতৃমূর্তির কথাই বিশেষভাবে ও বিস্তৃতরূপে বলিয়াছি। আর সর্বপ্রথমেই বাৎসল্যের ও মাতৃমূর্তির আলোচনা করিয়াছি এইজন্য যে এই মূর্তিটি অনেকেই, ভাগ্যগুণে, স্বচক্ষে নিজের ঘরে বা প্রতিবেশীদের ঘরে কখনও না কখনও দেখিয়া থাকিবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিন্তু যেমন বাৎসল্যের, সেইরূপ অন্যান্য রসেরও এক-একটি নিজ-নিজ মূর্তি আছে। যেভাবে বাৎসল্যের মূর্তি জননীর দেহযষ্টিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটিয়া উঠে, সেইভাবে যখন যে-রস কোনও ব্যক্তির অন্তরে জাগিয়া তাঁহার মন-প্রাণকে অধিকার ও অভিভূত করে, সেই রসের আপনার বিশেষ মূর্তিটি সেই ব্যক্তির দেহে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। কোনও রসের মূর্তিই নিতান্ত বিদেহী নহে।

এইরূপে যেমন বাৎসল্যের সেইরূপ মাধুর্যেরও একটা নিজস্ব মূর্তি আছে। দাস্য এবং সখ্যেরও আছে। এ-সকলের মধ্যে দাস্য রসের মূর্তিটিই সর্বাপেক্ষা সরল। কারণ দাস্য রসও তত জটিল নহে। প্রভুতে একান্ত আত্মসমর্পণ ও প্রভুর সেবাতে চরম কৃতার্থতা লাভ করাই দাস্য রসের ধর্ম। প্রভুর প্রতি সম্ভ্রম, তাঁহার সেবাতে নিষ্ঠা, ও সর্বতোভাবে তাঁহার আনুগত্য সাধনেই দাস্য রস তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং এখানে সম্ভ্রম ও আনুগত্যের ভাবটাই প্রধান। এই সম্ভ্রম ও আনুগত্যেরও একটা রূপ আছে। এই রূপও আমাদের মুখের ভাবে, চক্ষের চাহনিতে, চলাফেরায়, বসা-দাঁড়ানর ধরনেতে ধরা পড়িয়া যায়। যাঁহাকে অতিশয় সম্ভ্রম করি, তাঁহার দিকে চাহিতে গেলে, চক্ষু আপনা হইতেই আনত হইয়া আইসে। শরীরের সমস্ত পেশীগুলি শিথিল হয় না, কিন্তু কেমন যেন একটা নম্র ভাব ধারণ করে। আর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একটা প্রগাঢ় অকিঞ্চনতা ফুটিয়া বাহির হয়। এই রূপের মধ্যে ভয়ের চিহ্ন নাই, কিন্তু বশ্যতা আছে; লোভের চিহ্ন নাই, অথচ সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে; হীনতা বোধ নাই, কিন্তু অপূর্ব দীনতা আছে, স্পর্দ্ধা নাই. কিন্তু বিলক্ষণ আব্দার আছে। সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য যতটা জটিল, দাস্যরস ততটা জটিল নয় বলিয়া ইহা যে একান্ত

একটা সরল বস্তু, ইহার মধ্যেও যে অদ্ভুত, অপূর্ব বিচিত্রতা নাই, এমন মনে করা সঙ্গত নহে। দাস্যরসেরও অশেষ প্রকারের তরঙ্গভঙ্গলীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই রস যখন জীবের অন্তরে জাগিয়া, তাহার অন্তর্বাহ্য সমুদায় বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় গ্রামকে অধিকার করে, প্রভুই যখন দাসের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উপজীব্য হইয়া বসেন,—তখন এই রস দাসের স্নায়ুমণ্ডলীকে অধিকার ও তাঁহার পেশী সমূহে শক্তি সঞ্চার করিয়া, তাঁহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া, আপনার নিজস্ব রূপটিকে ফুটাইয়া তুলে। দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর আমরা দাস্য মূর্তিটি দেখিতে পাই না। কারণ আমাদের সমাজেই দাস্য রস একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর রঙ্গমঞ্চে সুনিপুণ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মধ্যে, কখনও-কখনও এরূপটি দেখিতেও পাওয়া গিয়া থাকে।

সখ্য মূর্তি

সখ্য রসটি দাস্যরস অপেক্ষা অধিক জটিল। "পূর্ব-পূর্ব রসের গুণ পরে-পরে বৈসে।" বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রসিক সুজনদিগের বিচারে দাস্যরস সখ্যরসের নিচে। সুতরাং দাস্যের গুণ সখ্যেতে থাকিবেই, কিন্তু সখ্যে যে একটা খোলা-খুলি গলা-গলি ভাবে, যে একটা সাম্য সম্বন্ধ থাকে, দাস্যে তাহা সম্ভবে না। দাস্যরস যখন বিশেষ গভীরতা লাভ করে, তখন দাসের দেহের স্নায়ুমণ্ডলকে যাইয়া অধিকার করে এবং তাহারই জন্য তাঁহার মুখে চক্ষে ও অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, চালচলনে সকল বিষয়েই একটা বিশেষ ছবি ফুটিয়া উঠে। সখ্যেতেও তাহা হয়। আর সখ্যের রূপ বা ছবিটি ঠিক দাস্যের মতন হয় না। সখাও সখার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া তদ্গত প্রাণ হইতে পারেন। সখাও সখার সেবা করিতে পারেন। সখ্যেতেও সম্ভ্রম এবং আনুগত্য সকলই আছে, কিন্তু ক্ষেত্রগুণে এ-সকল বস্তু এখানে যে আকারে ফুটে তাহা দাস্যেতে এগুলি যেভাবে ফুটে,তাহা অপেক্ষা কতকটা ভিন্ন। প্রভু সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কোনও আকারে উদাসীনতা প্রকাশ পাইলে দাস্য রস নষ্ট হইয়া যায়। প্রভুর উপস্থিতি বা প্রভুর সেবা বিষয়ে দাসের কোনও ভাবের কি বাহিরের কি ভিতরের, কিছু পরিমাণ অনবধানতা বা ঔদাসিন্য থাকিতে বা জন্মিতে পারে না। জন্মিলে তাহাতে রসভঙ্গ হইয়া, অপরাধ হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অনবধানতা সখ্য রসের কোনও সাংঘাতিক ব্যাঘাত উৎপন্ন নাও করিতে পারে। সখার উপস্থিতিতে সখা উঠিয়া দাঁড়ান বা বসিয়া থাকুন, তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া

আসুন বা না আসুন, তাঁর পায়ের নিচে বসুন কিংবা ঘাড়ের উপরে চড়ুন এ সকলে তাঁর প্রাণগত সখ্যরসের কোনও ইতর বিশেষ হয় না, হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং দাস প্রভুর নিকট দাঁড়াইলে তাঁর অন্তরগত রসের পীড়নে, চক্ষে মুখে, দাঁড়াইবার ভঙ্গিতে, এ-সকলে যে মূর্তিটি প্রকাশিত হইবে, সখা যখন সখার কাছে যাইয়া দাঁড়ান, তখন কোনও মতেই সেই মূর্তিটি ফুটিবে না। সখ্যরস দাস্য রস অপেক্ষা সমধিক জটিল বলিয়া, এ-রসে যতটা বৈচিত্র্য ফুটিবার অবসর আছে, দাস্যরসে ততটা নাই। সখ্যের রসবৈচিত্র্য ও রসলীলা দেখিতে হইলে, কিশোর-কিশোরীদিগের মধ্যেই তাহার অন্বেষণ করিতে হয়। আর বড় বেশি অন্বেষণ করারও প্রয়োজন হয় না ; ঘরে ঘরে, পল্লীতে-পল্লীতে এ-রসের শত শত প্রাণ বিমোহন ছবি দিনের ভিতরে কতবারই না চক্ষে পড়ে। ইংরেজিতে যে School boy বা School girl love বলে, তাহাতে এই অপূর্ব সখ্যরসেরই বিচিত্র মূর্তি সকল ফুটিয়া উঠে। সে বিষয়ে এই রসই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন, কিশোর বয়সের এই প্রেমেতেই এই সখ্যের নিত্যকার ও সত্যকার রূপটি অতি পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটা অতি অদ্ভুত কথা এই যে, বয়ঃসন্ধিকালে শৈশব আর যৌবন যেখানে গঙ্গা যমুনার মতো মিলিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তখনকার সখ্যেতে এমন সকল বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, যাহা বস্তুত সচরাচর কেবল মাধুর্যেতেই দেখা গিয়া থাকে এই বয়ঃসন্ধিকালের বালকে-বালকে ও বালিকায়-বালিকায় যে অপূর্ব স্নেহের, প্রেমের, সাম্যের, স্পর্দ্ধার, ঔদ্ধত্যের, আব্দারের, মাপের, কখনও অনুরাগের কখনও বিরাগের, ক্ষণে কলহ ক্ষণে মিলন, ক্ষণে ক্রোধ ক্ষণে ক্ষমা—এ-সকল ভাব যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সখ্যের বিচিত্র স্বরূপ। আর এই সকল বিচিত্র ভাবের তাড়নায় ক্ষণে-ক্ষণে এই সকল প্রণয়িগণের মধ্যে যে রস উচ্ছলিত হইয়া তাহাদের চক্ষে-মুখে, অঙ্গে-প্রত্যঙ্গ, সর্বশরীরে ছাইয়া পড়ে, ও তাহার দরুণে ইঁহাদের দেহকে আশ্রয় করিয়া যে জীবন্ত ছবি সকল ফুটিয়া উঠে, তাহাই সখ্যের রূপ, কৃষ্ণলীলার অভিনয়ে, গোষ্ঠের পালায় ও রসের স্ফূর্তি ও মূর্তি দেখিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, সুকুমার বালকগণকে লইয়াই ভিন্নভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা করা প্রয়োজন হয়, কারণ তাহাদের সুকোমল ও কাম সম্পর্ক শূন্য দেহেতেই কেবল সখ্যের বিশুদ্ধ রূপটি ফুটিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। যাহারা অনাচারে ও অত্যাচারে ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হইয়া বীর্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের দেহের এ-রসের মূর্তিটিকে ধারণ করিবার শক্তি থাকে না।

দাস্য মূর্তি

রূপ কথাটা লইয়া, দেখিলাম আমার কোনও-কোনও নবশিক্ষিত বন্ধু একটু গোলে পড়িয়াছেন। রূপ আর আকার কি এক? এই প্রশ্নটাই কেহ-কেহ তুলিতেছেন। এক নয় কি? আকার কাকে বলি? আকার আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে বিশেষভাবে কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা ধরিতে পারি ও ধরিয়া থাকি? মূলতঃ চক্ষুই কি আমাদের আকার জ্ঞানের মুখ্য ইন্দ্রিয় নহে? অন্ধেরা বস্তুর উপরে হাত বুলাইয়া, তার দৈর্ঘ-প্রস্থাদির জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে বটে, আর কেবল দৈর্ঘ-প্রস্থাদি যদি আকারের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে, তাহাকে ঠিক রূপের এক পর্যায়ভুক্ত করা নাও যাইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতেও চক্ষু দিয়াই যে মুখ্যত আমরা বস্তু আকারের জ্ঞান পাইয়া থাকি, ইহা অস্বীকার করা যায় না। স্পর্শ দ্বারাও এ জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু চক্ষুর দ্বারাও হয়, এই কথাই বলিতে হয়; কিন্তু আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞান শীতোষ্ণাদিকেই স্পর্শের বিশেষ বিষয় বলিয়াছেন। রূপ বলিতে যাহা আমরা বুঝি, তাহা বিশেষভাবে চক্ষুরই বিষয়। এই জন্য চক্ষুর অন্তর্নিহিত দৃষ্টি শক্তিকে আমাদের মনোবিজ্ঞান রূপতন্মাত্রা বলিয়াছেন, আর রসের রূপ কথাটা এইজন্যই আমি ব্যবহার করিয়াছি যে, রস জীব দেহে, সেই দেহের স্নায়ুমণ্ডলকে অবলম্বন করিয়া, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেশীসমূহের ভিতর দিয়া যে বাহ্য লক্ষণগুলি ফুটাইয়া তুলে, তাহারা মুখ্যত আমরা চক্ষু দ্বারাই দেখি; হাত দিয়া ধরিতে বা ছুঁইতে, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করিতে রসনা দ্বারা আস্বাদন করিতে পারি না। এইটুকু বিচার করিয়া দেখিলে, এক্ষেত্রে রূপ শব্দের প্রয়োগ দূষণীয় বলিয়া হয়ত বোধ হইবে না।

আর একটা কথা। অরূপ আর নিরাকার একই কথা নয় কি? পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আমরা নিরাকার শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা একটি বিশেষ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ-স্থলে আমরা নিরাকার আর অতীন্দ্রিয় একই অর্থে ব্যবহার করি। ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, অর্থ এই যে তাহা কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে মনকেও ইন্দ্রিয় বলা হয়, একথাটাও এ-স্থলে ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং নিরাকার বস্তু কেবল যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তাহাও নয়, সে বস্তু মন দিয়াও ধরিতে পারা যায় না। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"যতো বাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—ইত্যাদি।

আর নিরাকারের সত্য অর্থ যদি এই হয়, তবে রূপবস্তুকে নিরাকার বলা

যায় কি? কারণ রসবস্তু যে-জাতীয়ই হউক না, তাহা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হউক আর নাই হউক, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সঙ্গে একরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ এ-কথাটা অস্বীকার করা অসাধ্য। আমরা যাহাকে রস বলি, ইংরেজিতে যাহাকে ইমোষণ-স (Emotions) বলিয়া থাকে। এই রস আমাদের বিষয় জ্ঞানের একটি মুখ্য অঙ্গ। ফলতঃ রস ব্যতীত জ্ঞান আপনি কিছুতেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বস্তু সাক্ষাৎকার জ্ঞানের পূর্ববৃত্ত ব্যাপার বা ঘটনা বা কর্ম্ম। এইজন্য জ্ঞান মাত্রেই বস্তু তন্ত্র, বস্তুর অধীন। ইহা যেমন সার্বজনীন সত্য; সেইরূপ এই জ্ঞানও যে নিয়তই জ্ঞাতার অন্তরে কোনও না কোনও রসের সঞ্চার করে, ইহাও সার্বজনীন সত্য। যেখানে বোধ মাত্র জন্মে, কিন্তু রসের সঞ্চার হয় না, সেখানে এই বোধটাকে অত্যন্ত ক্ষীণ, আছে কি-না এমন মনে করিতে হইবে। বোধ যেখানেই স্থিতি করে, তখন তাঁহাকে মা (Mother) বলিয়া সম্বোধন করা, কখনওই শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। দাম্পত্য সম্বন্ধের অন্তরালে যে মাধুর্য্যরস বিদ্যমান থাকে আমরা এই সকল কথায় সে রসকে ব্যক্ত করি না। আমরা এই ক্ষেত্রে যে সকল কথা ব্যবহার করি, ইংরেজ বা জার্মাণ কাফ্রি বা জুলু সে কথা বা তার অনুরূপ অন্য কোন কথা ব্যবহার করেন না। আর এ পার্থক্য যে সামান্য তাহাও নয়। আমাদের অন্তরের ভাব যখনই ভাষায় ব্যক্ত হয়, তখনই আমাদের নিজেদের সভ্যতার ও সাধনার নিজেদের পারিবারিক জীবনের ও সমাজ গঠনের আরো অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাব বা আদর্শ তার সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই কারণে অন্তরের ভাবটা শুদ্ধ ও অমিশ্র হইলেও, বাহিরের প্রকাশটাতে আশেপাশের অনেক বস্তু মিশিয়া থাকে। আর এরূপ মিশ্রণ হয় বলিয়াই ভাষায় বা আচার-আচরণে একই মানবীয় রসের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহা ভিন্ন-ভিন্ন দেশে, ভিন্ন-ভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভাষায় বা আচার-আচরণে রস বিশেষের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে সে রসের রূপ বলা যাইতে পারে না।

কারণ প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সেই বস্তুর রূপের সম্বন্ধটা কিয়ৎ পরিমাণে নিত্য আর সর্বত্রই অঙ্গাঙ্গী। এক জাতীয় বস্তুর রূপ বা আকার মোটের উপর এক। মানুষের রূপ বা আকার সকল মানুষের মধ্যেই মোটের উপরে এক। মানুষে মানুষে বর্ণে বা গঠনে, চেহারায় বা চলনে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, এ সকল বিভিন্নতা মানবীয় রূপের অনতিক্রমনীয় সীমা বা সমতাকে কিছুতেই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। খর্বাকৃতি লোমশ কেভম্যান (Cave Man) একদিকে, কৃষ্ণকায় কুঞ্চিতকেশ, স্থুল অধরোষ্ঠ সম্পন্ন কাফ্রি আর একদিকে

সুগঠিতবপু, শ্বেতবর্ণ রোমক বা গ্রীক আর একদিকে, আমেরিক ইণ্ডিয়ান একদিকে আর চীনাম্যান বা জার্মানী আর একদিকে ; এ সকলের মধ্যে বিস্তর আকৃতিগত বৈষম্য আছে। কিন্তু এ-সকল বৈষম্য সত্বেও সকলের মধ্যেই মানুষী রূপ বলিয়া যে একটা সামান্য বস্তু আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এই রূপ ইহাদের সকলকেই অধিকার করিয়া আছে। এই রূপ আছে বলিয়াই ইহারা পরস্পর হইতে এতটা পৃথক হইয়াও, সকলেই মানুষ হইয়াছে। এই মানুষী রূপের সঙ্গে মানব মাত্রেরই একটা নিত্য ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানেই মানুষ সেখানেই এই মানুষী রূপটি ফুটিয়া আছে। ছায়া যেমন আতপের অনুগমন করে, আতপ ছাড়া যেমন কোথাও ছায়া থাকে না, থাকা সম্ভব নহে ; আর ছায়া ছাড়াও কোথাও আতপ থাকে না, থাকাও সম্ভব না ; সেইরূপ মানুষের সঙ্গে এই মানুষী রূপেরও একটা নিত্য ও অপরিহার্য যোগ রহিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সেই বস্তুর রূপের সম্বন্ধ এইরূপই নিত্য, অঙ্গাঙ্গী অপরিহার্য। ভাষায় বা আচার-আচরণে আমরা সচরাচর অন্তরের ভাবকে বা রসকে যেরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকি, তাহা সর্বত্রই সমান নহে। এইজন্য রসের এই সকল অভিব্যক্তিকে তার রূপ বলা যায় না। রসের রূপ তার এমন একটা বিশেষ বহিঃপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি হওয়া চাই, যার সঙ্গে তার একটা নিত্য, অপরিহার্য, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছেই আছে। যেখানেই মানব-অন্তরে কোন রস বিশেষ জাগিয়া উঠে, সেখানেই তার এই নিজস্ব রূপটিও প্রকাশিত হইবেই হইবে, এরূপ না হইলে, তাহাকে সে-রসের রূপ বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু কোনও রস বা ভাব প্রাণে জাগা মাত্রই যে তার এই রূপটি ফুটিয়া উঠিবে, এমন কোন কথা নাই। রূপ মাত্রেই বস্তু বিশেষের বহিঃপ্রকাশ। আর বস্তুর গাঢ়তার উপরে তার রূপের প্রকাশ হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা সচরাচর জড় পদার্থের তিনটি অবস্থার উল্লেখ করেন। এক—তার বায়বীয় অবস্থা, ইংরেজীতে ইহাকে Gaseous বলে। দ্বিতীয়—তার তরল বা লিকুইড (Liquid) অবস্থা। তৃতীয়—তার কঠিন বা সলিড (Solid) অবস্থা। প্রথমাবস্থায় পদার্থের রূপ থাকে না ; চক্ষে তাহাকে দেখা যায় না। দ্বিতীয় অবস্থায় পদার্থ চক্ষু গ্রাহ্য হইলেও তরল পদার্থের যে সাধারণ আকার তাহা ছাড়া সে নিজস্ব কোনও বিশেষ আকার ধারণ করিতে পারে না। তরলাবস্থায় পদার্থের আকার চঞ্চল থাকে, স্থৈর্য লাভ করে না। পদার্থ বিশেষ সর্বাপেক্ষা গাঢ়তম কঠিনাবস্থা লাভ করিলেই তার মধ্যে কোনও স্থির ও স্থায়ী রূপ ফুটিয়া উঠিবার অবসর প্রাপ্ত হয়।

আমাদের আন্তরিক রসেরও এইরূপ তিনটি অবস্থা আছে। জড়পদার্থের বায়বীয় বা গ্যাসাস (Gaseous) অবস্থার মতো, আমাদের বাৎসল্য মাধুর্য্যাদিরও একটা অতিশয় হালকা, বায়বীয় অবস্থা আছে। এ-অবস্থায় রসের সাড়া মাত্র অন্তরে অনুভব করা যায়, কিন্তু তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে-ছুঁইতে পারা যায় না। এ-অবস্থায় রস নিতান্ত ছায়ার মতো, অশরীরী হইয়া থাকে। বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়া, আবার তখনই নিভিয়া যায়। এ-অবস্থায় তার রূপের প্রকাশ হয় না। জড়পদার্থের তরলাবস্থার ন্যায় আমাদের অন্তরের এই সকল রসেরও একটা তরল অবস্থা হয়। এই অবস্থায় রসকে আস্বাদন করা যায় বটে, কিন্তু ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই অবস্থাতেই রস ব্যভিচারী ব্যবহার করিয়া থাকে। এক রস অপর বিরুদ্ধ রসের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। অপস্মার বা উন্মাদ রোগগ্রস্ত লোকের মধ্যে এইরূপ ব্যভিচারী রসের খেলা সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। হাসিতে-হাসিতে ইহারা কাঁদিতে আরম্ভ করে। কাঁদিতে-কাঁদিতে আবার হঠাৎ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে। ক্ষণে ভয়, ক্ষণে অভয়, ক্ষণে উচ্ছ্বসিত অনুরাগ, ক্ষণে তীব্র বিরাগ, এইরূপে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু তাড়িত জলরাশির ন্যায় ইহাদের চিত্ত যুগপৎ বিবিধ বিরোধী ভাবের তাড়নায় বিক্ষোভিত হইয়া উঠে। এই তরল অবস্থাতেও রস আপনার রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। জড়পদার্থ যেমন কাঠিন্য লাভ করিলেই বিশেষ আকার বা রূপ ধারণ করিয়া থাকে, অন্তরের রসও সেইরূপ স্থির ও গভীর হইলেই আপনার নিজস্ব রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সুতরাং এ-সকল রসের রূপ দেখিতে হইলে, যে-ক্ষেত্রে ইহারা অনন্যসাধারণ স্থৈর্য ও প্রগাঢ়তা লাভ করে, সেইখানেই তাহাদের নিজ-নিজ রূপের অন্বেষণ করিতে হয়, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন এ-রূপের সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভবে না।

এই সকল রস আমাদের অন্তরেই জন্মে, অন্তরেই বাড়িয়া উঠে, অন্তরেই বাস করে, সত্য, কিন্তু তাহাদের নিজ-নিজ রূপ আমাদের দেহেতে ফুটিয়া উঠে। বাহিরের আলোকের সঙ্গে আমাদের চক্ষের গোলকের এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে, আলোক ফুটিলেই, গোলকে তার প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ আমাদের অন্তরের রসের সঙ্গে একদিকে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর ও অন্যদিকে এই স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই, আমাদের শরীরের পেশিসমূহের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অন্তরে কোনও রসের সঞ্চার হইবা মাত্রই, স্নায়ুমণ্ডলে তার সাড়া পাওয়া যায়। এই রস ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গাঢ়তা লাভ করিলে, আমাদের শরীরের পেশীকে আসিয়া দখল করে, এবং যে-পেশীর সঙ্গে যে

রস বিশেষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী, সেই পেশীগুলির ভিতর দিয়া, তাহাদের ক্রিয়া বিশেষকে আশ্রয় করিয়া, আপনার নিজস্ব রূপটিকে ফুটাইয়া তুলে। ভিন্ন ভিন্ন রসের তাড়নায় আমাদের স্নায়ুমণ্ডলে প্রথমে এবং ক্রমে আমাদের শরীরের বিভিন্ন পেশীসমূহের সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে বিশেষ-বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, এবং এই সকল স্নায়বীয় ও পৈশিক ক্রিয়া নিবন্ধন আমাদের চক্ষে মুখে যে সকল ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহাই এই সকল রসের রূপ। এই সকলকে লক্ষ্য করিয়াই আমাদের প্রাচীন রসশাস্ত্র প্রণেতাগণ রসের মূর্তির কথা বলিয়াছেন। আজিকালি য়ুরোপীয়েরাও শারীরতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের যে সকল অভিনব সত্যের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও, এ সকল রসমূর্তি পুরাণোল্লিখিত বলিয়া বাস্তবিকই যে একেবারেই কেবল উদ্দাম কল্পনাসম্ভূত, এমন কথা বলা কতকটা অসমসাহসিকতা হইবে বলিয়াই মনে হয়।

এই সকল রসমূর্তির প্রকাশ যে অত্যন্ত বিরল, তাহাও নহে। ইহাদিগকে লক্ষ্য করাও যে একান্তই কঠিন, এমনও বলিতে পারি না। প্রায় সর্বদাই এ সকল রসমূর্তি আমাদের সংসারের দৈনন্দিন ঘটনাদির ভিতর দিয়া, আমাদিগের চারিদিকে ফুটিয়া উঠে। আমাদের রসনামুভূতি প্রখর নহে বলিয়া, সকল সময় আমরা এগুলিকে দেখিয়াও দেখি না। সন্তানবতী রমণী যখন আপনার সুকুমার শিশুকে কোলে পাইয়া, তাহার মুখ দেখিতে-দেখিতে, সেই অসহায় সন্তানের মধ্যে আপনাকে একান্তভাবে ডুবাইয়াছেন, তখন তাহাকে কোন্ গৃহস্থ না দেখিয়াছে? কিন্তু তাঁর এই রূপের ভিতর দিয়াই যে বাৎসল্য রসের নিত্য মূর্তিটি ফুটিয়া উঠে, ইহা অল্প লোকেই জানে। এই রূপকেই জগতের শ্রেষ্ঠতম চিত্রকর ও ভাস্করগণ য়ুরোপের ম্যাডোনা (Madonna) বা আমাদের গণেশজননীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রাকৃতজনে হয়তো ভাবে যে, সন্তান কোলে ধরিয়াই ম্যাডোনা ম্যাডোনা এবং গণেশজননী গণেশজননী হইয়াছেন। সন্তান কোলে করিয়া না বসিলে, তাঁহাদের মাতৃত্বের রূপটি বুঝিবা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিত না। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। সন্তানকে কোলে করিয়া যখন জননী তাঁহার সেই সন্তানের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যান, তখনই তাঁর মধ্যে বাৎসল্যের সমগ্র রসটি মূর্তিমন্ত হইয়া উঠে, সত্য; কিন্তু সে-রসের রূপটি সন্তানের মধ্যে নহে, কিন্তু তাঁহার আপনার দেহতেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এইজন্য সন্তানের মুখ ধ্যান করিতে-করিতে ক্রমে বাৎসল্যে বিভোর হইয়া যে জননীর বাহ্য চেতনা লোপ পাইয়া যায়, তাঁর ক্রোড় হইতে সে-অবস্থায় ঘুমন্ত

শিশুটিকে ধীরে-ধীরে সরাইয়া নিলেও, তাঁর দেহযষ্টিকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্যের যে-রূপটি প্রকট হইয়াছিল, তাহা অমনি অপ্রকট হইবে না। পুত্রশোকাতুরা জননী যখন বিরহের তীব্রতায় বাহ্যজ্ঞান শূন্যা হইয়া, বাৎসল্যের তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া মানসচক্ষে মৃত পুত্রকে জীবন্ত ভাবে আপনার ক্রোড়স্থ দর্শন করেন, তখন সন্তানের দৈহিক সান্নিধ্য ব্যতীতও, বাৎসল্যের প্রকৃত মূর্তিটি তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া স্বচ্ছন্দেই ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং কোনও-কোনও স্থলে যে ফুটিয়া থাকে, ইহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সুতরাং য়ুরোপের ম্যাডোনাগুলিতে বা আমাদের গণেশজননীতে যেভাবে মাতৃমূর্তিটি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা ছাড়া যে এই মূর্তিটি অতি পরিস্ফুটরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না, এমন নয়। ফলতঃ সন্তানকে কোলে দিয়া, ম্যাডোনাতে এবং গণেশজননীতে মাতৃ-মূর্তির নিজস্ব রূপটিকে ফুটাইবার দিকে অন্তত কোনও-কোনও চিত্রকর ও ভাস্কর নিজেদের দায়িত্বভার যে অনেকটা লঘু করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাও বলিতে পারি না। সন্তান যখন কোলে আছে, তখন এ-চিত্র বা ভাস্কর্য যে মায়েরই তৈলচিত্র বা প্রস্তরমূর্তি, এ-ধারণা আপনা হইতেই অনেকটা জন্মিয়া যায়। আর সেইজন্য এই সকল চিত্রপটে বা প্রস্তরফলকে বাৎসল্যের নিজস্ব মূর্তিটি সত্য-সত্য কতকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে বা উঠে নাই, এ-বিষয়ে অনেকেই কোনও বিশেষ অনুসন্ধান আর করে না। মোটের উপরে ছবিখানি বা প্রতি-মূর্তিটি নয়নপ্রীতিকর হইয়াছে কি-না, তাহারই দ্বারা তারা ভাল-মন্দের বিচার করিয়া থাকে, সন্তান কোলে লইয়াও যে কোনও জননীর মধ্যে কখনও-কখনও তাঁর সত্যিকার মাতৃমূর্তিটি ফুটিয়া নাও উঠিতে পারে; সকল সময় যে ফুটিয়া উঠে না, ইহাও প্রত্যক্ষ কথা। সকল জননীই তো দিনের মধ্যে কতবার সন্তানকে কোলে করিয়া বসেন ও তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া থাকেন। কিন্তু সর্বদাই যে এ-সকল অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে বাৎসল্যের মূর্তিটি ফুটিয়া উঠে, এমন তো দেখা যায় না। আর যখন এই মূর্তিটি কোনও জননীর মধ্যে সত্যসত্যই ফুটিয়া উঠে; তখন তাঁহাকে চিনিতেও বেশি বিলম্ব হয় না। সে আপনা হইতেই আপনাকে ধরা দিয়া থাকে। আর এই যে অপরূপ মাতৃমূর্তিটি, তাহারই মধ্যে বাৎসল্য-রসের রূপটি ফুটিয়া উঠে।

বাৎসল্য রস পিতা-মাতা উভয়েরই মধ্যে সঞ্চারিত হয় সত্য, কিন্তু ইহা সন্তানের জননীকে যতটা পরিমাণে অধিকার করে, তাহার জনককে সে-পরিমাণে অধিকার করে না। কারণ মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধটা যতটা ঘনিষ্ঠ, তাঁর দেহ-মন-প্রাণ-জীবনের সকল বিভাগের ভিতর দিয়া এই সম্বন্ধ আপনাকে যে

ভাবে গড়িয়া তুলে, পিতার সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠ নয় ও হইতেই পারে না। আপনার সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ কেবল আন্তরিক নহে, কায়িকও। প্রথমত মা দশ মাস দশ দিন সন্তানকে আপনার গর্ভে ধারণ করিয়া এই কায়িক সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সুদীর্ঘ গর্ভবাস নিবন্ধন মায়ের স্নায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সন্তানের স্নায়ুমণ্ডলের একটা অতি নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হয়, নাড়ীচ্ছেদের সঙ্গে-সঙ্গেই এ যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কি-না, তাহাও বলা সহজ নহে। আর এই জন্য জননীর সন্তান বাৎসল্যের মধ্যে অন্তত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত যে একটা শারীরিক দিকও জাগিয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য। সুতরাং জননীর অন্তরের বাৎসল্যরস যখনই বিশেষ গাঢ়তা লাভ করে, তখনই যে তাহা তাঁর মনকে ছাড়াইয়া, দেহকে পর্যন্ত যাইয়া সহজেই অধিকার করিয়া বসে এবং তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে আপনার নিজস্ব মূর্তিটিকে ফুটাইয়া তোলে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। জননী ঘুমন্ত শিশুকে কোলে লইয়া, তার সুকুমার মুখখানিতে আপনার চক্ষু দুটি নিবদ্ধ করিয়া যখন আপনার মাতৃভাবে একেবারে বিভোর হইয়া উঠেন, এবং তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে যখন তাঁর মুখে, চক্ষে, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, এমনকি প্রতি লোমকূপের মধ্য দিয়া এই অপূর্ব বাৎসল্য রস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে ও সেই রসের আবেগে যখন তাঁর পীনপয়োধর যুগল হইতে আপনা হইতে ক্ষীরধারা ছুটিয়া সন্তানের চক্ষে মুখে যাইয়া পড়িতে আরম্ভ করে,—সন্তানবতী জননীকে এ-অবস্থায় যে দেখিয়াছে, সে-ই বাৎসল্য রসের নিজস্ব রূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। বাৎসল্য রসের পীড়নে জননীর স্নায়ুমণ্ডলে যে-সকল বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাঁর চক্ষের, মুখের, উরসের স্নায়ুসকল ও পেশীসমূহ যে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, এগুলিকে লক্ষ্য করিয়া, এই ক্রিয়ার ছবিকে অন্তরে ধারণ করিয়া, যে চিত্রকর বা ভাস্কর তাহাকে চিত্রপটে বা মর্মর খণ্ডে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই সত্য মাতৃমূর্তি রচনায় সিদ্ধি লাভ করেন। সন্তানের মুখ ধ্যান করিতে-করিতে যে জননীর চক্ষে অসীম ত্যাগের অটল সংকল্প মুখে ভাগবতী করুণার কোমল আভা ফুটিয়া না উঠে, এই কারুণ্যে যাঁহার সর্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ না হয় এবং তারই সঙ্গে ক্ষীরভারে স্তনযুগল যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, এমনি অবস্থা না ঘটে, তাঁর মধ্যে বাৎসল্যের রূপ প্রকাশিত হয় না, হইতেই পারে না। এই জন্য যাঁরা আজি কালিকার দিনে, একটা বিমানচারিণী ভাবুকতার মোহে পড়িয়া, বাৎসল্যের এই সত্য শারীর-ধর্মগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল একটু চাহনি বা একটা হাবভাব কি পোজের (Pose) সাহায্যে,—ক্ষীণ পয়োধর

ও লঘুনিতম্ব কৃশাঙ্গিনীগণকে শাড়ি পরাইয়া, ছেলে কোলে দিয়া, মাতৃমূর্তি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁদের এ-চেষ্টা যে একান্ত অসত্যকে আশ্রয় করিয়া নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে, ইহা আর বিচিত্র কি !

[বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১৩১৯]

ক্ষিতিমোহন সেন
কবীরের প্রেম সাধনা

এক

কবীরের যদি পরিচয় দিতে আমি চেষ্টা করি, তাহলে একটু আগে থেকে বল্‌তে হবে। পূর্বে রামানুজের সময় হতে আচারি সম্প্রদায় চলে আসছিল। আচারি বৈষ্ণব সম্প্রদায় খুব আচার মেনে চলতেন, তাঁদের আচারের বন্ধন খুব বেশি ছিল। যেমন, খাওয়ার সময় কেউ দৃষ্টি দিলে তাঁদের খাওয়া বন্ধ হতো, 'দৃষ্টি দোষ' হতো। যিনি প্রথম অনাচারী হন, তিনি হলেন গুরু রামানন্দ। কাহারও-কাহারও মতে তিনি রামানুজের ৫'পীঢ়ি' অর্থাৎ ৫জন গুরুর পরে। আচার নিয়েই রাঘবানন্দের সঙ্গে তাঁর লাগল। বিরোধ এত দূর বেড়ে উঠল যে, রাঘবানন্দ তাকে বললেন, 'তোমার ধর্ম বুদ্ধিতে যদি বাধে, তাহলে তুমি তোমার নতুন দল গড়ে তোল, আমাদের এতকাল পুরানো সম্প্রদায়ের উপর আঘাত করো না। দোহাই তোমার, এত কালের জিনিসটার উপর হাত চালিও না। নতুন কিছু যদি করতে হয় তো তুমি নিজে আলাদা করে নেও।'

রামানন্দ বেরিয়ে এল পরে, রামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাঘবানন্দই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হয়ে উঠলেন। রামানন্দের মনের মধ্যে এই যে নতুন একটি বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল, বোধহয় রাঘবানন্দের সঙ্গে ভাগ হয়ে যাবার অনেক দিন পূর্ব্বেই সেটার সূত্রপাত হয়েছিল। কারণ, দেখতে পাই, রামানন্দ সমস্ত ভারত ঘুরে এলে, তাঁর দলের লোকেরা তাঁকে আর গুরু বলে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। কেননা তিনি তার আগেই আচার ভঙ্গ করে ছিলেন। আরো দেখতে পাই, রামানন্দের প্রধান শিষ্যেরা সবাই প্রায় অন্ত্যজ। সেই সময় নারীদের হীন বলে মনে করা হতো। তিনি তাঁদেরও শিষ্য করে নিয়েছিলেন। নারী সাধিকাদের মধ্যে রামানন্দের শিষ্যা পদ্মাবতী আমাদের এমন অনেক জিনিস দিয়ে গেছেন, যার মূল্য হয় না। তাছাড়া, তাঁর আর একটি শিষ্যার নাম ক্ষেমশ্রী। তিনি জাতে ছিলেন গোয়ালা। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ক্ষেমশ্রীর একটি কবিতা তাঁর Personality নামক গ্রন্থে অনুবাদ করার প্রলোভন ছাড়তে পারেন নি।

কবীরও গুরু রামানন্দের অন্ত্যজ শিষ্য হলেন, তার নানা রকম ব্যাখ্যা চলিত আছে। এ-বিষয়ে গুরু রামানন্দের মান বাঁচাতে গিয়ে, অনেক ভক্তি-গ্রন্থ অদ্ভুত সব গল্প চালিয়েছেন। গল্প আছে, একদিন কবীর অন্ধকারে রামানন্দের স্নানের পথে শুয়েছিলেন। কবীরের গায়ে রামানন্দের পা লাগে। তাতে রামানন্দ

'রাম' 'রাম' বলে উঠেন। কবীর বললেন, 'তবেই তো তুমি আমার গুরু হলে। আমি তোমার কাছে 'রাম' নাম মহামন্ত্র পেলাম।' এই রকম করে কবীরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও শিষ্যত্ব হয়। রামানন্দের ৭২ জন অপ্রধান শিষ্যের মধ্যে প্রায় ৫৬ জন হীনজাতি বা অন্ত্যজ। প্রধান শিষ্যদেরও অধিকাংশই অতি নীচ ও ছোট জাতির লোক।

কবীর সন্ন্যাসীও ছিলেন, গৃহস্থও ছিলেন। তিনি বলতেন, সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে প্রাচীরের মতো কোন ব্যবধান নাই। যিনি সংসারী তিনিও সন্ন্যাসী হবেন, এই তাঁর মত ছিল। কারণ তিনি বলতেন ঃ

'কঁহৈ কবীর অস উদ্যম কীজৈ
আপ জীয়ে ঔরনকো দী জৈ॥'

অর্থাৎ এতটা শ্রম তোমার করা দরকার, যাতে তুমি আপনি জীবন ধারণ করে আরো দু-চার জনকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করতে পার।

যাঁর সংসারের ভার আছে ও পরিশ্রম করার শক্তি আছে, তিনি অন্যের পরিশ্রমের ফলের ভাগ নিতে পারেন না। যতক্ষণ শক্তি আছে, কেন পরিশ্রম করবে না? তাই তিনি তাঁত বুনে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবিকা নিজে উপার্জ্জন করেছেন। তিনি সন্ন্যাসী অথচ তিনি বিবাহ করলেন। শত্রুরা নিন্দা করতে লাগল। তারা বল্‌তে লাগল—'যা হোক, বিয়ে করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর সন্তান হবে না।' পরে যখন তাঁর সন্তান হলো, শত্রুরা খুশী হলো। তারা বললো—'ডূবা বংশ কবীরকা জবহি উপজা পুত্র কমাল।' অর্থাৎ কবীরের বংশই আবর্জ্জনার স্তূপ—এইবার এল কমাল, দেখো কি হয়!

যেদিন তাঁর সন্তান হয় সেদিন তিনি আগে থাকতে তা বুঝতে পারেন নি। বাজারে গিয়েছিলেন সুতা কিনতে। নিন্দুকের দল ভিড় করে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, তাঁকে খবর দিয়ে জব্দ করবে বলে। তিনি কাপড় বিক্রি করে, সুতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসছিলেন, পথে জনতা দেখে অবাক হলেন। বড় আনন্দে তারা সবাই বললে—কবীর তোমার পুত্র হয়েছে। তারা ভেবেছিল, কবীর বুঝি কথাটি শুনে মুষড়ে যাবেন। কবীর প্রসন্ন হয়ে সুতার বোঝাটি কাঁধ থেকে নামিয়ে ছয়টি পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করলেন। মানব শিশুর জন্ম সম্বন্ধে এই রকম কথা আর কোথাও বলা হয়েছে কি-না জানি না। টেনিসন De Profundis নামে যে কবিতাটি লিখেছেন, সে এর চেয়ে অনেক দীর্ঘ, অথচ

তাতেও যে গভীর কথাটুকু এবং মানব জীবনের যে-রহস্যটুকু তিনি বুঝিয়ে বলতে পারেন নি, কবীর ছয়টি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে তা অনায়াসে বলে গেছেন।

তিনি বললেন :

'অহদ মুসাফির পহুনা আয়া ধরো মল থার
ঘর আংগনকী কদর ভয়ী হৈ রাহ্ হ্‌বৈ গুলজার॥
জনম মরণমেঁ কদম তুমহারা অবস ভয়াহয় কাল।
মেরা ঘরমেঁ ডেরা লাগায়া পায়া হাম কমাল॥
কৌনসী সেবা করিগৌ তুমকো কোন করিহৌ পূজা।
পংথ পংথী ঘর একহি হৈজী ভাব মিটা অব দূজা॥'

'এই যে আমার পুত্র সে অসীমের যাত্রী। অসীম যাত্রার সাধনা করবার জন্য দু-চার দিনের জন্য সে আমার ঘরে অতিথি এসেছে। তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শুভ অর্ঘ্যের থালিটি সাজিয়ে ধর। আজকে আমার ঘর, আমার আঙ্গিনা অর্থাৎ আমার ঘরের ভিতর-বাহির আজ তার যথার্থ কদর পেয়েছে! এই ক্ষুদ্র যাত্রীটি তার যাত্রা পথখানিকে একেবারে পুষ্পিত করে আমার ঘরে এসেছে।

'হে অসীমের যাত্রী আমার পুত্র, জন্ম ও মৃত্যু তোমারই অসীম যাত্রার এক একটি পা ফেলা ও তোলা, জন্ম মৃত্যুর মধ্যে পা ফেলে তুমি চলেছ, কাল তোমার কাছে হার মেনেছে। আমার ঘরেতে যে তুমি এসে আশ্রয় নিলে, আমি তাতে কমাল অর্থাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হলাম। কেমন সেবা বল তো আমি তোমায় করি? সেবা আবার কি? তোমাকে আমি কোন্ পূজা দিয়ে ধন্য হব? আজ আমার সব দ্বৈত ভাব ঘুচে গেছে। আজ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি যিনি অসীম লক্ষ্য হয়ে বিরাজমান, তিনিই অসীমের যাত্রী হয়ে সেই লক্ষ্য লাভের সাধনায় যাত্রা করেছেন। আর তিনি পথ হয়ে অসীম যাত্রীকে অসীম লক্ষ্যের দিকে উপনীত করে দিচ্ছেন।' শত্রুরা নিস্তব্ধ হয়ে চলে গেল। এই যে কমাল অর্থাৎ পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন বলে কবীর বললেন, তাতেই পুত্রের নাম হলো 'কমাল' এবং পরে যখন তাঁর কন্যা হলো তারও নাম রাখলেন 'কমালী'।

কবীরের যে কি প্রভাব উত্তর ভারতে আছে, তা যাঁরা উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা ছাড়া কেউ জানেন না। তিনি ভগবানকে নিজের গুরু মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি অসীমের বার্তা এনেছি, গুরু রামানন্দ আমায় চৈতন্য দিয়াছেন। কিন্তু আমার গুরু বলতে এক ভগবান—

"প্যাস অহদকা সাথ হাম লায়া রামানন্দ চেতায়ে॥"

অসীমের তৃষ্ণা নিয়ে আমি এই জগতে এসেছি। রামানন্দ আমার চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন ; কারণ, আমি যে কিসের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছিলাম, সে আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। সে-তৃষ্ণা যে অসীমের তৃষ্ণা, জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে এই তৃষ্ণার সূত্র ধরেই আমি চলেছি, এ-কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। চেতনা যিনি দিলেন, তিনি গুরু রামানন্দ। তবে সত্য গুরু যদি বলতে হয়, তবে সে স্বয়ং ভগবান, তিনি এই অসীমের তৃষ্ণা দিয়েছেন, তিনি প্রতিদিন আমার সেই বন্ধন ক্ষয় করে, তাঁর দিকে আমাকে অগ্রসর করে নিচ্ছেন ; তাঁরই উপলক্ষ্য হয়ে রামানন্দ আমার গুরু হয়েছেন। একজন ধর্মতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক তাঁকে তাঁর সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলেন :

'তোমার সাধনার পথটি আমায় বুঝিয়ে বলতে পার ?'

কবীর বললেন, 'পথ কি আমি দেখেছি ? রাত্রি ছিল অন্ধকার। তাঁর বংশীর সুর শুধু কানে আসছিল। মন আমার উদাস যখন হলো, তখন কি আর পথের খোঁজ-খবর নিয়েছি ? পাগলের মতো সুর শুনেই এগিয়ে চলেছিলাম।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তোমার গুরু ?' তখন কবীর গান গাইলেন—

বাঁসুরী জব মোহে ডগরা ধরাঈ।
রৈন অন্‌ধেরী রহী কারী বাদরন্‌সে
ডগরা মোহে কোন দিখাঈ।
ঠাড়ী কোঈ দেখতে আগনে অংগনসে,
জিন্‌হে কভী বাঁসুরী বুলাঈ।
ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ।
ডর নাহি কুচ্ছো, ডগরা না পুচ্ছো
বাঁসুরী সুনত কবীরা বঢ় জাঈ।
আজি বালাম বুলাবত আন্‌হর কে পারসে
কৌন বেসরম আজ তোর সাথ জাঈ॥

পথ আমি জানি না। সেই বাঁশরী যখন আমায় রাস্তায় বের করল, যখন বাঁশরী আমাকে পথে ডাক দিল, তখন রাত্রি ছিল অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন। আমার ভীত প্রাণ বলতে লাগল, "কে আমাকে পথ দেখাবে ?'

যে-সমস্ত পূর্ব-পূর্ব ভক্তেরা বশিষ্ঠ, নারদ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি যাঁরা বাঁশী শুনতে পেয়েছিলেন, তাঁরা নিজের-নিজের আঙিনার দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে আমাকে পথ বলে দেবে ? তাঁরা বললেন, যিনি

তোমায় এবং আমাদেরও বাঁশীতে ডাকছেন, তিনিই পথ বলে দেবেন। পথ জিজ্ঞাসা করো না। বাঁশী শুনে আজ বেরিয়ে পড়; সোজা চলে যাও। জীবন-বল্লভ অন্ধকারের পার হতে আজ তোমায় ডেকেছেন। প্রেমের মিলন-বাসরে তোমার সঙ্গে তার আজ গভীর মিলন হবে। কে এমন নির্লজ্জ আছে, আজ যখন তুমি প্রিয়তমের কাছে বাসর-ঘরে চলেছ, তখন সাথে-সাথে পথ দেখাবার জন্যে সেও সেখানে যাবে।

আজ রাত্রি বাদল অন্ধকার বাঁশী দিয়ে তিনি ডাকছেন। তিনি দিনে ডাকলে আলো দিয়ে ডাকতেন; কিন্তু রাত্রে ডেকেছেন যে, পথ দেখতে পাবে না, শুধু বাঁশী শুনে নির্জনে অন্ধকারে তাঁর প্রেম-স্বরূপের ভিতরে ডুবে যাবে।

যিনি গুরু তিনি এভাবেই পথ দেখাচ্ছেন। রামানন্দ শুধু আমার মনের মধ্যে এই ভাবটিকে সচেতন করে দিয়েছেন।

এর পরেই সেই পণ্ডিতটির সঙ্গে কবীরের যে প্রসঙ্গ হলো (কবীর পন্থীদের সাধনার শাস্ত্রে এইসব প্রসঙ্গকে 'বহস্' বলে)—কবীরের প্রেম সম্বন্ধে প্রসঙ্গের মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য 'বহস্'; এই প্রসঙ্গে কবীর বললেন যে, ভগবানকে প্রেম দিয়েই সাধনা করতে হবে। সেই পণ্ডিতটি জিজ্ঞাসা করলেন—যাঁকে প্রেম দিয়ে তুমি সাধনা করবে, তাঁর স্বরূপ কি? কোথায় তাঁর নিবাস? কেমন তাঁর প্রকাশ?'

কবীর বললেন—

ঐসা লো নহি তৈসা লো।
মেঁ কেহি বিধি কহো গম্ভীরা লো।
ভীতর কহুঁ তো জগময় লাজৈ, বাহর কহুঁ তো ঝুটা লো॥
বাহর ভিতর সকল নিরন্তর চিত অচিত দউ পীঠা লো।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর বাতন কহা জাঈ লো॥

তিনি কোন একটি জায়গায় আছেন, এ-কথা ভাবলে ভুল হবে। যদি বলি, তিনি এমন নয়, তিনি তেমন, তাহলে ভুল হবে। তিনি যে কেমন, তা আমি কি করে, কি কথা দিয়ে বুঝিয়ে বলব? এ বড় গভীর কথা। যদি আমি বলি যে, তিনি ভিতরে আছেন, তাহলে বাইরের বিশ্বজগৎ লজ্জায় মরে যাবে। যেমন, যদি কোন স্ত্রীকে তাঁর স্বামী চিনতে না পারেন, তাহলে সে স্ত্রীর তো আর লজ্জা রাখার জায়গা হয় না। তেমনি তিনি যদি বলেন, এই বাহিরের বিশ্বজগতে আমি নাই, তাহলে এত বড় বিরাট ব্রহ্মাণ্ড এক পল কাল কোন্

লজ্জায় বেঁচে থাকে ? যদি বলি, তিনি বাইরে আছেন, তাহলে আবার আমার অন্তরাত্মা লজ্জিত হয়—এবং সে-কথা মিথ্যাও হয়। বাহির এবং ভিতর সকলকে নিরন্তর করে তিনি এক করেছেন। বাহির ও অন্তর, অচেতন ও সচেতন তাঁর পাদপীঠ। তিনি দৃষ্ট এ-কথা বলতে পারি না, আবার তিনি অপ্রকাশিত এ-কথাও বলতে পারি না। তিনি অপ্রকাশিতও বটে আবার অগোচরও বটে ; বাক্যে ইহা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। তবে বাইরের আচার অনুষ্ঠানের ভিতর তাকে পাই না, এ-কথা বলতে পারি না, কিংবা পাই তাও বলতে পারি না। তিনি একটা উদাহরণ দিয়াছেন যে, জলে ভরা কুম্ভ জলের মধ্যে রেখেছি ; তার বাহিরেও জল, ভিতরেও জল। এমনি আমার বাহিরে ও অন্তরে তিনি বিরাজিত।

'জল ভর কুম্ভ জলৈ বীচ ধরিয়া বাহর ভীতর সোই।
উনকা নাম কহনকো নাহি দূজা ধোমা হোই ॥'

বাহিরেও তিনি ভিতরেও তিনি। তবে সব জিনিসেই যদি তিনি প্রকাশিত, তবে তিনি স্বতন্ত্র হয়ে প্রকাশিত হন-না কেন ? তিনি বাহির ও ভিতর উভয় স্থানই পূর্ণ করে আছেন, তাই আলাদা করে তাঁকে জানি না। তিনি বিশ্বের আত্মা, বিশ্বের জীবনেশ্বর, তাই তাঁর নাম নাই।

যদি কেহ তাঁর নাম দেয়, তবে তিনি আমাদের হতে আলাদা হয়ে যান। মানুষ নাম দিয়ে পরকেই ডাকে ; নিজেকে তো নাম দিয়ে কেউ ডাকে না। যেমন স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে না। নাম ধরলে স্বামী স্ত্রী হতে আলাদা হয়ে যান, কিন্তু স্ত্রী ও স্বামী যে এক। তাই তাঁর নাম ধরতে নাই। তিনি বিশ্বনাথ, বিশ্ব যদি তাঁর নাম নেয়, তবে তিনি যে বিশ্ব হতে আলাদা হয়ে যান। তিনি কি বাইরের আলাদা জিনিস্?

উনকা নাম কহনকো নাহি দূজা ধোখা হোই ॥

পণ্ডিতটি কবীরকে বললেন, 'এ-সম্বন্ধে যে-তত্ত্বটি আপনার মনে প্রত্যক্ষ হয়েছে, তা আপনি সকলের কাছে প্রচার করেন না কেন ?' তিনি বললেন, 'এভাবে ধর্মপ্রচার আমার কাজ নয়।' অতি তীব্র ভাষায় বলেছেন যে, জলের কলসী নিয়ে সকলকে 'জল খাও, জল খাও' বলে বেড়ানটা কারুর উপকার করা নয়।

'পানী প্যাবত ক্যা ফিরো ঘর ঘর সাগর বারি।
তৃষাবংত জো হোবৈগা পীবেগা ঝখমারি ॥'

আর এমন জল খাইয়ে ফিরবার দরকারই বা কি আছে? প্রত্যেকের অন্তরে-অন্তরে অন্তর রসের সাগর।

যেদিন পরমাত্মার জন্য তৃষ্ণা জাগবে, সেদিন সকলের নিজের মধ্যে যে অমৃতরস আছে, তৃষ্ণার দায়ে ঠেকে সে-জল পান করতেই হবে।

'পিবৈগা ঝখমারি।'

তৃষ্ণা জাগাও, অন্তরে তৃষ্ণা জাগাও। যেদিন প্রেম জাগ্রত হবে, সেদিন আপনি তৃষ্ণা আসবে, প্রেম জাগাও। এই প্রেম যে দিন জাগবে, সেইদিন বৈরাগ্যও আসবে; অথচ, সংসারের প্রতি যে বিরাগ, বিতৃষ্ণার নামান্তর, তা আসবে না। সংসারের মধ্যে কবীর প্রেমে পূর্ণ হয়ে থাকতেই বলেছেন। তিনি বলেছেন, সংসার আমার বাপের বাড়ি, ব্রহ্মধাম স্বামীর বাড়ি। স্বামীর বাড়িকে ভালোবাসতে হবে বলে সে বাপের বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ জন্মাতে হবে, এ-কথা ভেবো না। এই সংসারেই তাকে জানতে পেরেছি। স্বামীর বাড়ি না গেলে যেমন নারীর জীবন সার্থক হয় না, তেমনি পরমাত্মাকে না জানলে জীবাত্মার কোন সার্থকতাই হয় না। যে দিন স্বামীকে চিনেছি, সেদিন বাপের বাড়ির সকল আকর্ষণ সহজে ছেড়ে গেছে, বিদ্বেষ থেকে নয়, ঘৃণা থেকে নয়; এই প্রেমেরই বলে। এই প্রেমকে জাগ্রত কর। এই প্রেমের বলেই বালিকা মা হয় ।একটি ছোট বালিকা যে সন্ধ্যাতেই ঘুমিয়ে পড়ে, আজ সে মা হয়ে রাত দুটোতেও না-ঘুমিয়ে বসে আছে; কেন না তার ছেলে ঘুমুচ্ছে না। ভগবান এই প্রেমই সকলের মধ্যে দিয়েছেন। বালিকাকে শুধু মা করে দিয়েছেন; আর কোন উপদেশ দিতে হয় নি। অথচ শিশুর দাসীকে সহস্র উপদেশ দিয়েও, ঢের কথা বাকি থেকে যায় এবং পদে পদেই তার সেবার ক্রটি হয়ে যায়। মাকে বিধাতা শুধু প্রেম দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। প্রেম দিয়েছেন বলে আর কিছুই তাঁকে শেখাতে হয় নি। ভগবান তাঁর ভবিষ্যৎ সাধক শিশুদিগকে ঘরে-ঘরে মায়েদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। টাকা পাঠান নি, রসদ পাঠান নি, মায়ের হৃদয়ে শুধু প্রেম দিয়েছেন। এই প্রেমের বলেই মা কি তার নিজের সব সুখ ত্যাগ করতে পারবে? পারবে। স্বামীর জন্য নিজেকে পর্যন্ত তো এই প্রেমের-বলেই সে জ্বালিয়ে দেয়।

'সতী কো কৌন শিখাব তা হৈ
সঙ্গ স্বামীকো তন জারনা জী।
প্রেম কো কৌন শিখাবতা হৈ
ত্যাগমাহি ভোগকা পানা জী॥'

সতীকে প্রেম দিয়েই বিধাতা নিশ্চিন্ত হয়েছেন, স্বামীর জন্য তাকে যে পুড়ে মরতে হয় এ-শিক্ষা কে তাকে দিলে? ত্যাগের মধ্যেই যে ভোগকে পেতে হবে এই শিক্ষা প্রেমকে কে দিলে?

একটি মাত্র পংক্তিতে কবীর প্রেমের একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা (definition) দিয়েছেন। প্রেম কি? না 'ত্যাগের মধ্য দিয়া ভোগকে পাওয়া।'

প্রেমের এই মজা—সে ত্যাগ করে, অথচ ভোগও করে, সে কিছুই রাখে নি, অথচ সবই পেয়েছে।

ত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পরমানন্দ মেলে, তা যে কত গভীর, কত মধুর ও সুন্দর, তা কেবল সেই বৈরাগীই জানেন, যিনি বৈরাগ্য দিয়ে প্রেমকে গভীর ও মধুর করে ভোগ করছেন। ভগবান এই বৈরাগী—প্রেমের রহস্য জানেন, তাই বিশ্বে যেমন তাঁর প্রেমের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তেমনি সর্বত্র বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ রয়েছে।

এই প্রেমের মধ্যে কামনার স্থান নাই। যে-অমৃত দেবতার পানীয়, তা দানব এসে খেতে চাইলে হবে কি? সে অমৃতের আনন্দই ত সে জানে না।

'সুর পরকাস তঁহ রৈন কঁহ পাইয়ে
রৈন পরকাস নহি সুর ভাসৈ।
জ্ঞান পরকাস অজ্ঞান কঁহ পাইয়ে
হোয় অজ্ঞান তঁহ জ্ঞান নাসে॥
কাম বলবান তঁহ প্রেম কঁহ পাইয়ে
প্রেম জঁহ হোয় তঁহ কাম নাহীঁ।
কহেঁ কবীর যহ সও বিচার হৈ
সমঝ বিচার দেখ মাহীঁ॥

'সূর্য যেখানে প্রকাশিত সেখানে রাত্রি পাবে কেমন করে? রাত্রি যেখানে বিরাজমান, সেখানে সূর্য নাই। যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ, সেখানে অজ্ঞানের স্থান কই? অজ্ঞান যদি থাকে, তবে জ্ঞানকে পালাতে হয়। কাম যেখানে বলবান, সেখানে প্রেম কোথায় থাকে? প্রেম যেখানে বিরাজমান, কাম সেখানে নাই। কবীর বলেন, এই আমার সত্য সিদ্ধান্ত। এ-কথা আমি বাইরের থেকে বলছি না; অন্তরের মধ্যে বিচার করে দেখ, তুমি তোমার অন্তরেই এ-কথার সাক্ষ্য পাবে। বাইরে থেকে পাবার কোন দরকার নেই।'

[ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২৯, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০]

দাদূ

দুই

দাদূর বয়স যখন ২৯ কি ৩০ বৎসর তখন দাদূ ব্রহ্মসম্প্রদায় স্থাপন করেন। এই সময়েই তাঁর বাণী রচিত হইতে আরম্ভ হয় (ত্রিপাঠি-দাদূ-সাহিত্য—৪ পৃঃ)। ত্রিপাঠিজী বলেন—"যাহাতে জ্ঞানী অজ্ঞান, উচ্চ নীচ সকলের অনুকূল সরল একটি ধর্মের আদর্শ সকলের কাছে স্থাপিত হয় ইহাই ছিল দাদূর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। জীবনে যাহাতে কুরীতি ত্যাগ করিয়া সুরীতি সকলে গ্রহণ করে, সকল মানব যাহাতে সমানভাবে সকল জ্ঞানের অধিকারী বিবেচিত হয়, উচ্চ নীচ বলিয়া কৃত্রিম ভেদ যাহাতে দূর হয়, অপেক্ষাকৃত শক্তিহীনদের বঞ্চনা করিয়া লুব্ধ হইয়া যাহাতে কেহ প্রয়োজনের অধিক ধন সঞ্চয় না করে এই ছিল তাঁর মনের ভাব। এই রকম অনেক আদর্শ তাঁর মনে ছিল।" (ত্রিপাঠি-দাদূ-সাহিত্য-পৃঃ ৪)।

এইসব আদর্শের পরিপূর্ণতার জন্যই দাদূ তাঁর ব্রহ্মসম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। তাহাতে উপাসনার রীতি এমনভাবে প্রবর্তিত হইল যাহা অতি সরল অথচ অতিশয় উচ্চধরনের যেন মানুষ সেই সাধনায় পরমানন্দকে অতি সহজে পাইতে পারে। প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে সাধনার দ্বারা ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। (দাদূ-সাহিত্য পৃঃ ৪)।

সহজ ভাষাতে দাদূ বলিলেন,—"অহমিকা ত্যাগ করিয়া হরিকে ভজনা, ও তনু-মনের বিকার ত্যাগ, এবং সকল জীবের সঙ্গে মৈত্রী (নির্বৈর) এই হইল সার মত।"

আপা মেটৈ হরি ভজৈ তন মন তজৈ বিকার।
নির্বৈরী সব জীবসোঁ দাদূ য়হ মত সার॥
(দাদূ-দয়া নির্বৈরতাকো অঙ্গ-২)।

এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ের দাদূ কোন সাম্প্রদায়িক মতের বা সংস্কারের প্রতি পক্ষপাত করেন নাই। তিনি নির্ভয়ে সকল মানবের কল্যাণের জন্য সকল কুরীতি ত্যাগ করার উদ্যোগ করিলেন। পরমাত্মায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁর পরম শক্তির উপর ভরসা করিয়াই দাদূ আপন কর্তব্য করিয়াছেন। দাদূ বলিলেন,—

"যেদিন হইতে আমি সম্প্রদায় ছাড়িয়া অসাম্প্রদায়িক হইলাম, সকল লোকেই আমার উপর ক্রোধ করিতে লাগিলেন। সদ্‌গুরুর প্রসাদে আমার না হইল হর্ষ, না হইল শোক।"

দাদূ জব থৈঁ হম নির্পক্ষ ভয়ে সবৈ রিসানে লোক।
সদগুরুকে পরসাদ থৈঁ মেরে হরখ ন শোক ॥
(দাদূ-মধিকে-অঙ্গ-৫৯)।

লোকেরা দাদূকে বলিল, জগতে সেবা বা কাজ করিতে হইলেই কোন না কোন দলে থাকিয়া কাজ করা দরকার; তুমি কোন্ সম্প্রদায়ে থাকিয়া কাজ করিবে?

দাদূ উত্তর করিলেন—

দাদূ য়হ সব কিসকে পংথমৈঁ ধরতী অরু অসমান।
পানী পবন দিন রাতকা চন্দ্র সূর, রহিমান ॥...ইত্যাদি।
(দাদূ সাচকে অঙ্গ-১১৩)।

"এই যে ধরিত্রী আকাশ, জল, পবন, দিন, রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য, (ইহারা তো অহর্নিশ সদাই সবার সেবা করিয়া চলিয়াছে) ইহারা আছে কোন্ পন্থে, কোন্ সম্প্রদায়ে?

"দাদূ যে সব কিসকে হূরৈ রহে য়হ মেরে মন মাঁহি।"
(দাদূ সাচকে অঙ্গ-১১৬)।

"হে দাদূ, ইহারা সব কার অনুবর্তী হইয়া (কোন সম্প্রদায়ে) রহিয়াছে, এই প্রশ্নই আমার মনে।"

তখন নিজেই দাদূ তাহার উত্তর দিতেছেন—

"অলখ ইলাহী জগতগুর দূজা কোঈ নাঁহি ॥"
(দাদূ, সাচকে অঙ্গ-১১৬)।

"সেই অলখ ঈশ্বরই জগদগুরু, তিনি ছাড়া আর কেহ এই জগতে নাই (যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে)।" কাজেই ইহারা কোন সম্প্রদায়ে না থাকিয়াও তাঁহারই সেবক হইয়া আছে। এই সব কথা দাদূর ব্রহ্মসম্প্রদায় প্রকরণে ভাল করিয়া বলা যাইবে। তাঁহার এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ের সত্যগুলি হিন্দু মুসলমান দুই মতের ভাল-ভাল সাধকদের মধ্যেই স্বীকৃত হইয়াছে।

যদিও তিনি আত্মঘোষণা ও কর্মঘোষণার বিরোধী ছিলেন তবু এই সব উপলব্ধিতে যখন তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল তখন দাদূ কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া সাধনা ও জীবনের দ্বারা এই সত্যকে সর্বজনের গ্রহণের উপযোগী করিতে চাহিলেন। তখনই তিনি রাজপুতানার অন্তর্গত সাংভরে আসিয়া সপরিবারে

স্থির হইয়া বসিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। এইখানে বসিয়া ব্রহ্মসাধনার বিষয় দাদূ নির্ভয়ে প্রচার করিতে লাগিলেন। বন্ধুজনেরা বলিলেন, "দাদূ সত্য প্রচার করিতে হয় কর, কিন্তু সকলকে সব কথা বলা উচিত নয়। সমাজের মতিগতি বুঝিয়া চারিদিকের ভাবভঙ্গী বিচার করিয়া যাহাকে যতটুকু বলা উচিত তাহাকে ততটুকুই বল। অনেক স্থলে সম্পূর্ণ মৌনই থাকা উচিত।" কিন্তু দাদূ বলিয়া উঠিলেন, "সাচ্চা পথে যাইয়া সত্যেই স্বামীকে পাইবে।"

সাচে সাহিবকোঁ মেলৈ সাচে মারগি জাহ ॥

(সাচ কৌ, অঙ্গ-১৫৬)।

বন্ধুরা ভয় দেখাইলেন, "হে দাদূ, মুল্লা মৌলবী আছেন, গুরু ব্রাহ্মণ আছেন, পাণ্ডা মোহন্ত ও দর্গার পীরেরা আছেন, দিন-দিন তুমি ইঁহাদের স্বার্থে আঘাত করিতেছ। ইঁহারা কি তোমাকে ক্ষমা করিবেন? রাজা, রাণা, দেশের মীর মালিক সবাই দিন-দিন তোমার উপর বিরক্ত হইতেছেন। সাধারণের মধ্যে তোমার এই সব সত্য প্রচারের অর্থই হইল দিন-দিন তাঁহাদের শক্তি ক্ষয় হওয়া। এ-সব কথা ভাবিয়া দেখা উচিত।"

যে দাদূ একদিন আম্বেরের রাজা ভগবৎদাসের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

দাদূ বলি তুম্হারে বাপজী, গিনত ন রাণা রাব্।
মীর মালিক পরধান পতি, তুম বিন সবহী বাব্ ॥

(সুরাতন, অঙ্গ-৭৩)।

"হে পিতা, তোমার বলে, দাদূ না গণে কোন রাণা, না মানে কোন 'রাব্'; তুমিই আমার মীর, তুমিই মালিক, তুমিই প্রধান, তুমিই পতি, তুমি বিনা সবই বায়ুভূত (মিথ্যা)," সে দাদূ কি ভয় পাইবার পাত্র?

যে দাদূ ভগবানকে শুনাইলেন—

সব জগ ছাড়ে হাতথৈঁ তৌ তুম জিনি ছাড়হু রাম ॥

(দাদূ সুরাতন, অঙ্গ-৭৬)।

"সব জগৎ যদি আমাকে পরিত্যাগ করে তবু তুমি যেন আমায় ছাড়িও না," সে দাদূ কি মানুষের ভয়ে সঙ্কুচিত হইতে পারেন?

সত্য প্রচারে যদিও দাদূ নির্ভয় ছিলেন ও কাহাকেও রেয়াৎ করিয়া কথা কহিতেন না, তবু মানুষের প্রতি তাঁর ব্যবহার ক্ষমা ও প্রেমে পূর্ণ ছিল। দাদূকে যদি কেহ আঘাত বা নিন্দা করিত তাহাতে দাদূ ক্রুদ্ধ হইতেন না। সত্যের ও

ভগবানের নামে মিথ্যা দেখিলে তিনি দুঃখ পাইতেন। একদিন একজন লোক সাংভরে আসিয়া তাঁহাকে গালি দিল—

সাংভরিমৈঁ গালি দঈ গুর দাদূ কৌঁ আই।
তবহী সবদ য়ে উচ্চরয়ো ধরী মিঠাঈ পাই ॥
(পৃঃ ৪৯৯)।

দাদূ তাহাতে ক্রোধ না করিয়া তাহাকে যত্নপূর্বক গ্রহণ করিয়া মিষ্টান্নাদি খাওয়াইলেন। লোকেরা বলিল, "এ কি তোমার ব্যবহার?" দাদূ বলিলেন, "যে আমার নিন্দা করে সে আমার ভাই।"………"হে আমার নিন্দুক, তুমি যুগ যুগ বাঁচিয়া থাক, ভগবান তোমাকে প্রসন্ন করুন।"………

(রাগ গুণ্ড, পদ-৩৩১)।

একদিন সাংভরে এক মুসলমান হাকিম আসিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিল, তিনি ধীরভাবে বুঝাইলেন, "বিশ্বাসের পথের যাত্রী হও, অন্তরের শুচিতা রক্ষা কর, পূর্ণ প্রেমময়ের আজ্ঞায় নিত্যই হাজির থাক, অভিমান ত্যাগ করিয়া পশুভাব ও ক্রোধ দূর করিয়া সত্য চিনিয়া লও। দ্বৈতবুদ্ধি মিথ্যা সেখানে চলিবে না, জ্ঞান দিয়া সন্ধান করিয়া লও।"

(দাদূ, রাগ টোড়ী, পদ-২৮১)।

সাংভরি হাকমসৌঁ কহ্যৌ পদ য়হ দাদূ দেব্।
মানি বচন গহি নীতিকৌঁ করী গুরুকী সের ॥
(ত্রিপাঠি, স্বামী দাদূদয়ালকে সবদ, পৃঃ ৪৭৮)।

সাংভরে যখন দাদূ হাকিমকে এই পদ কহিলেন, তখন তাঁহার বচন মানিয়া তাঁর যুক্তি সে গ্রহণ করিয়া দাদূর সেবায় আসিয়া যোগ দিল।

গল্তা হইতে একদিন একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে দাদূ, তুমি যে সদ্গুরুর কথা বল তিনি কে? কোথায় তাঁর বাস, কি করিয়া তাঁকে পাওয়া যায়? কেমন করিয়া জীবনের দুঃখ দূর হয়?"

দাদূ বলিলেন, "হে সাধকগণ, বল, আর কি বলিবার আছে? ভগবানই সেই সদ্গুরু, আমরা তোমরা সবাই তাঁর শিষ্য। তাঁর কাছেই নিত্য থাক। আমার মাঝে তোমার মাঝে সেই স্বামীই বিরাজমান, আপন সত্য দ্বারা সেই পরম সত্যকে লাভ কর। তিনি আমার তোমার সঙ্গেই আছেন, নিকটেই আছেন—কেবল তাঁর হাতখানি ধর, তাঁর এমন চরণ-কমল ছাড়িয়া কেন ভবে ভাসিয়া বেড়াও?"

(দাদূ, রাগ রামকলী, পদ-১৮৪)।

গলতাথৈ জো আইয়া সাংভরি স্বামী পাস।
যা পদথৈ উত্তর দিয়ো উঠি গয়ে হোই উদাস॥
(ত্রিপাঠি, স্বামী দাদূদয়ালকে সবদ, পৃঃ ৪৩৫)।

গল্‌তা হইতে সাংভরে আসিয়া যে দাদূকে এই প্রশ্ন করিয়াছিল সে এই পদ শুনিয়া বৈরাগ্য লাভ করিয়া উঠিয়া গেল।

এখনকার মতো তখনও লোকে নানা বুজরুকিতে মানুষ ভুলাইত। মিথ্যা সাধুরা আসনের তলে কলসী পুঁতিয়া রাখিয়া তাহাতে প্রদীপ লুকাইয়া রাখিয়া রাত্রিকালে তাহারা লোককে সেই প্রচ্ছন্ন আলো দেখাইয়া বলিত যে ইহাই ব্রহ্মজ্যোতি—

কুংভ গাড়ী আসনতলে দীপক ধরি ঢকি মাহিঁ।
লোকনকূঁ কহি রাতিকূঁ ব্রহ্মজ্যোতি দরসাহিঁ॥
(ত্রিপাঠি, স্বামী দাদূদয়ালকে সবদ, পৃঃ ৪৭৮)।

নানা ভেদ বানাইয়া লোকে প্রচার করে 'পাইয়াছি' 'পাইয়াছি', অন্তরে তত্ত্ব না জানিয়াই যদি বলে তিনি আমাকে স্বীকার করিয়াছেন, অন্তরে প্রিয়তমের সঙ্গে পরিচয় বিনাই যদি লোকের মধ্যে নিজেকে প্রচার করিয়া বেড়ায় তবে লাভ কি?

এই কথাই আশ্চর্য হইয়া ভাবি যে ভণ্ডামী করিয়া কেমনে প্রিয়তমকে পাওয়া যায়? দাদূ বলেন, "যে আপনার 'অহং'কে মিটাইয়া ভগবানে রত হইয়াছে সে-ই তাঁহাকে পাইয়াছে।"

(দাদূ রাগ চৌড়ী, পদ-২৮৩)।

করাঘাত বা অতিপ্রাকৃতে অনাস্থা

একবার দাদূ ত্রিলোকসাহেবের সঙ্গে শাহপুরে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গের অনেকের মনে-মনে ইচ্ছা ছিল যে দাদূ যদি কিছু অসম্ভব কাজ (করাঘাত) দেখাইয়া নিজের অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রত্যক্ষ করান তবে বেশ হয়। দাদূ ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাতে কি দোষ হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দিলেন।

শাহপুরে দাদূ গয়ে লে গয়া সাহ তিলোক।
পরচাকী মনমৈঁ রহী, চলত দিখায়ে দোক॥
(ত্রিপাঠি, স্বামী দাদূদয়ালকী বাণী, পৃঃ ২৭২)।

দাদূ কহিলেন—

পর্চা মাঁগৈঁ লোগ সব কহৈঁ হমকোঁ কুছ দিখলাই।
সম্রথ মেরা সাঁইয়াঁ, জ্যুঁ সমঝৈঁ ত্যুঁ সমঝাই॥
(দাদূ, সমর্থাঙ্গ, অঙ্গ-২৭)।

"লোকেরা সব চায় পরিচয়, সবাই বলে 'আমাকে কিছু (অতিপ্রাকৃত শক্তি) দেখাও,' আমার প্রভু পরম শক্তিমান্, যেমন করিয়া বুঝাইলে ভাল হয়, তেমন করিয়াই তিনি বুঝান।"

দাদূর মত ছিল অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য এ-সব জিনিস অন্তরায়। মূলাধার ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এ-সব বাজে জিনিস মন হইতে দূর করিয়া ফেলিতে হয়। (দাদূ নিহকর্মী পতিব্রতা কৌ, অংগ-৫৯)। তবুও শিষ্যেরা অনেকে, পরে তাঁর যোগবল প্রমাণ করিতে কসুর করেন নাই। ব্যক্তিত্বের সাধনায় ও চরিত্রের বলে তিনি যে অন্যের হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেন তাহা বলাই বাহুল্য। কেহ বলেন রজ্জবজী বিবাহ করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় ভক্ত দাদূকে দেখিয়া তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাঁর বিবাহ-বেশ ত্যাগ করিয়া আপন ছোট ভাইকে সে-বেশ পরাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে পাঠাইলেন। সেই দিন হইতে রজ্জব যতিব্রত গ্রহণ করিলেন। এই আখ্যায়িকার সত্যতায় সন্দেহ আছে। কারণ দাদূর ধর্ম সাধনার আদর্শ অবিবাহিত যতির আদর্শ নয়। সেই ভাবের আদর্শ পরবর্তী শিষ্যদের আমলেই প্রচলিত হয়। দাদূভক্তদের মধ্যে প্রথিত আছে যে ধর্ম-সাধনায় দীক্ষা নির্জীব, নীরস, দীনহীন শুষ্ক পথ নহে। এ-পথে যে আসিবে সে বিবাহের বরের মতো প্রেমে, রসে, শোভায়, ঐশ্বর্যে পূর্ণ হইয়া আসিবে। রজ্জব এই সত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই কথা হইতেই রজ্জবজী সম্বন্ধে এই গল্পটি ধীরে-ধীরে রচিত হইয়া থাকিবে যে রজ্জব সদাই বিবাহবেশে সজ্জিত থাকিতেন। কেহ যদি বলিত, "রজ্জব, এত মার্জিত শুচি বেশভূষা কেন?" তবে রজ্জব বলিতেন, "আমার প্রিয়তমের সঙ্গে কি হীন, অশুচি বেশে মিলিত হওয়া শোভা পায়?" দাদূজী চিরদিনই সহজ প্রেম ভক্তির পথেই সাধনা করিয়াছেন। অতিপ্রাকৃত বুজরুকিতে তাঁহার আস্থার হেতু নাই। অথচ শেষে দেখি দাদূজীর নামেই তাঁহার পরবর্তী শিষ্যগণ নানা বুজরুকির অবতারণা করিয়া গুরুর মহিমা বাড়াইতে চাহিয়াছেন। তাই দাদূর কোন কোন বাণীর সঙ্গে এক-একটি 'করামাতের' (বুজরুকির) সম্বন্ধ শিষ্যরা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।

একবার নাকি চাতুর্মাস্য যাপন উপলক্ষ্যে বর্ষাকালে দাদূজী আঁধীগ্রামে ছিলেন। সেবার বর্ষা আর আসেই না, লোকেরা তাঁহাকে বহু অনুনয় করায় বর্ষা আসিল।

আঁধী গাঁর হি মাহি রহে জো দাদূ দাসজী।
বর্ষা বর্ষী নাহি, করি বিনতী বর্ষাইয়ো॥

(ত্রিপাঠীকৃত দাদূদয়ালজী বাণী, পৃঃ ৬২)।

সেই উপলক্ষ্যেই নাকি দাদূজী এই প্রার্থনাটি করেন—

আজ্ঞা অপরংপারকী, বসি অংবর ভরতার।
হরে পটংবর পহিরি করি, থরতী করৈ সিংগার॥
বসুধা সব ফুলৈ ফলৈ, পিরথী অনংত অপার।
গগন গরজি জল থল ভরৈ, দাদূ জৈ জৈ কার॥
কালা মুহঁ করি কালকা, সাঈঁ সদা সুকাল।
মেঘ তুম্হারে ঘেরি ঘণাঁ, বরসহু দীন দয়াল॥

(বিরহ, অঙ্গ-১৫৭-১৫৯)।

"অপার অসীমের আজ্ঞা। আকাশ ভরিয়া বিরাজমান স্বামী, তাই হরিত পট্টাম্বর পরিধান করিয়া ধরিত্রী করে শৃঙ্গার (সাজসজ্জা)। নকল বসুধা ফলে ফুলে শোভিত, অনন্ত অপার পৃথিবী; গগন গরজি জল স্থল উঠিল ভরিয়া, হে দাদূ, জয়জয়কার! কালের মুখে কালি দিয়া স্বামী আমার সদাই সুকাল; তোমার ঘরে তো পুঞ্জীভূত মেঘের রাশি, হে দীনদয়াল বর্ষণ কর।"

ইহা একটি চমৎকার প্রার্থনা। বুজরুকির সঙ্গে ইহাকে জুড়িবার কোন প্রয়োজন নাই। ইহা বিরহ অঙ্গের বাণী, ইহাতে দেখি অন্তরের প্রেমহীন নীরসতার প্রতিকার প্রেমধারার ব্যাকুল প্রার্থনায়। সকল চরাচর ভাসিল যাঁহার করুণা ধারায়, তাঁর প্রেম আশা করিয়া তাঁহার ভক্ত কেন মরিবে অন্তরাত্মার মধ্যে শুকাইয়া?

টৌক জনপদে নাকি মহোৎসব ছিল। দাদূজীও আছেন সেখানে, বহু ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসী উপস্থিত, ভোজন-সামগ্রী কম পড়িয়া গেল। তখন সবাই ধরিল দাদূজীকে। তিনি ভোগ লাগাইতেই সব ভাণ্ডার অক্ষয় হইয়া গেল। দাদূর শিষ্য টীলাজী নাকি এই রহস্য কেমন করিয়া হয় বুঝিতে চাহিলেন—

টৌঁকি পধারে মহোচ্ছব আপ লগায়ে ভোগ।
তব সিখ পূছী জব কহী, য়া সাখী যহ জোগ॥

প্রশ্নের উত্তরে দাদূজী নাকি বলিলেন—

দাদূ লীলা রাজা রামকী খেলৈঁ সবহী সংত।
আপা পর একৈ ভয়া ছুটি সবৈ ভরংত ॥

(সাধ কৌ, অংগ-৭৭) ॥

"অর্থাৎ প্রভু, ভগবানের লীলা, সকল সন্তজন করিতেছেন বিহার ; আত্মপর সব হইয়া গেল এক, বিনা-কিছুই সব অপূর্ণতা উঠিল ভরিয়া।"

এই বাণীটি বুঝিতে এইরূপ বুজরুকির তো কোন প্রয়োজন দেখি না। একবার তিনি জলের তীরে বসিয়া দৃঢ় বিশ্বাস প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাহাতে ভগবান তাঁহার দাসের বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহার কোলে নাকি একটি তরমুজ প্রেরণ করেন।

বংদৈঁ জল তট বৈঠি কৈ, কীন গাঢ় বিশ্বাস।
লহুঁ মতীরা গোদমেঁ, প্রভু ভেজে লখি দাস ॥

এই উপলক্ষ্যেই নাকি দাদূর বাণী—"হে দাদূ, পূরণকর্তাই করিবেন পূর্ণ, যদি চিত্ত থাকে যথাস্থানে। অন্তর হইতেই শ্রীহরি আনন্দে করিবেন সব উদ্বেল, সর্বত্র নিরন্তর বিরাজমান ভগবান।" (দাদূ, বেসাস, অংগ-১১)।

এই বাণীর সঙ্গে তরমুজের কোন সম্বন্ধ না থাকিলে কি কোন ক্ষতি আছে?

এক সময়ে নাকি দাদূজী এমন স্বরতি চালাইলেন যে তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সকলকে দেখাইলেন—

এক সমৈ কহুঁ স্বরতি চলাঈ।
অনংত কোটি ব্রহ্মংড দিখাঈ ॥

(জনগোপালকৃত জীবন চরিত্র, ৭, ৪২)

সেই উপলক্ষ্যেই নাকি দাদূজীর বাণী—

আদি অংতি আগৈ রহৈ, এক অনূপ দেব।
নিরাকার নিজ নির্মলা, কোঈ না জাণৈ ভেব ॥
অবিনাসী অপরংপরা, বার পার নহিঁ ছেব।
সো তূঁ দাদূ দেখিলে, উর অংতরি করি সেব ॥

(পরচা, অংগ-২৫৪, ২৫৫)।

অর্থাৎ, "আদি অন্ত সম্মুখে বিরাজিত এক অনুপম দেবতা, তিনি নিরাকার, নির্মল আত্মস্বরূপ, কেহই জানে না তাঁহার রহস্য ; তিনি অবিনাশী অসীম অপার,

সীমা পরিসীমা আদি অন্ত তাঁহার নাই, হে দাদূ, তাঁহাকে তুমি লও দেখিয়া, হৃদয়ের মধ্যে কর সেবা।"

ইহাতেই বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখাইবার কি দায় ছিল?

"একবার দাদূর কাছে নাকি দুই সিদ্ধপুরুষ লঘু দেহে আকাশে ভাসিয়া আসিলেন। তাহাতে দাদূ উপদেশ দিয়া কহিলেন, "ইহাতে আর কি সিদ্ধাই?"

গুর দাদূ পৈ সিদ্ধ দ্বৈ, আসে লঘু করি দেহ।
উপদেশত ভয়ে তিন্ হকো কহা সিধাঈ এহ॥

(দৃষ্টান্ত সংগ্রহ, চম্পারাম কৃত)।

তাহাতে নাকি দাদূ বুঝাইলেন—"এমন দীপ্তি অন্তরে সঞ্চয় কর যাহা প্রত্যক্ষ হয় না।" পরে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে দাদূজী নাকি আপন শরীর দীপ্যমান করিয়া শিষ্যদের দেখাইলেন! তাই নাকি দাদূর বাণী—

প্রাণ পব্ন জোঁ পতলা কায়া করৈ কসাই।
দাদূ সব সংসার মৈঁ, ক্যোঁ হি গহা ন জাই॥

(পরচা, অঙ্গ-১৯৯)।

নূর তেজ জ্যোঁ জ্যোতি হৈ, প্রাণ প্যংড য়োঁ হোই।
দৃষ্টি মুষ্টি আবৈ নহীঁ সাহিব কে বসি সোই॥

(পরচা, অংগ-২০০)।

অর্থাৎ, কায়াকে যদি পবনের মতো লঘু ও জ্যোতিতে দীপ্যমান করা যায় তবেই বুঝি সিদ্ধাই!

ইহা কি বুজরুকির কথা?

মধি কৌ অঙ্গে একটি বাণী আছে তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে দাদূজী নাকি একবার তাঁহার দেহকে মসজিদ করিয়া ও একবার মন্দির করিয়া দেখাইয়াছিলেন। মুসলমান বলিয়া তিনি দুইখানি হাত উঁচু করিয়া বলিলেন, "দেখ মসজিদ!" ও দুইখানি হাতে দুইদিকে ভূস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "দেখ মন্দির!" বাণীটি হইল এই—

যহ মসীতি যহ দেহরা সতগুর দিয় দিখাই।
ভীতরি সেবা বংদিগী, বাহরি কাহে জাই॥

(মধি, অঙ্গ-৫৪)।

"এই দেহই মসজিদ, ইহাই দেবালয়, সদ্গুরু দিলেন দেখাইয়া। ভিতরেই চলিয়াছে সেবা, প্রণতি, বাহিরে তবে আর কেন যাওয়া?"

এ তো আধ্যাত্মিক একটি গভীর সত্য। ইহার সঙ্গে বুজরুকির যোগ কি?

যথার্থ ধর্মজীবন এক কথা, বুজরুকি আর এক কথা। তাই যুগে যুগে যথার্থ সাধকরা ধর্মকে এই সব জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিতে প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছেন। দাদূ ও অন্যান্য ভক্তদের কথা হইতেই তাহা দেখান যাইতে পারে। "সুলতান মামুদ যখন দেবালয় সব ধ্বংস করিতেছিলেন তখন নাকি জৈনরা এক বুজরুকি করিলেন। তাঁহারা চৌদিকে চুম্বক রাখিয়া শূন্যে নিরবলম্ব করিয়া মূর্তি রক্ষা করিলেন।"

মহমূদ চাহে দেহুরা, জৈন রচ্যো পরপংচ।
চংবক চহুঁ দিসি গাড়ি কৈ, মূরতি অধর ধরি সংচ॥

ইহাতে দাদূ নাকি এই বাণী বলেন—

ধর‍্যা দিখাবৈ অধর করি কৈসৈঁ ঘন মানৈ?

(মায়া কৌ, অংগ-১৪৩)।

অর্থাৎ, "প্রতিষ্ঠিত বস্তুকে দেখায় যেন অপ্রতিষ্ঠিত নিরবলম্ব, তাহাতে ঘন কেমনে মানে?" ইহাতে তো বেশ বুঝা যায় তার এ-সব বিষয়ে বস্তুত আস্থা ছিল না। তাঁহার বুজরুকির সম্বন্ধে যে দুই-একটি গল্প আছে তাহাতে আমরা বরং তাঁহার তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধিরই পরিচয় পাই।

লোহরবাড়া নামে একটি গ্রামে ছিল দস্যুদেরই বসতি। তাহারা একবার মতলব করিল দাদূজী ও ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিবে, সঙ্গে যে-সব গৃহস্থ ও সজ্জন সাধুসঙ্গলোভে আসিবে তাহাদের তাহারা লুটিয়া লইবে। দাদূ ইহা বুঝিতে পারিয়া সেখানে নিমন্ত্রণই স্বীকার করিলেন না। এ-বিষয়ে তাঁহার নাকি এই বাণী—

খাড়া বূজী ভগতি হৈ, লোহরবাড়া মাঁহি।
পরগট পেড়াইত বসৈঁ তহঁ সংত কাহে কোঁ জাহিঁ॥

(মায়া কৌ, অংগ-৬৮)।

অর্থাৎ, "লোহরবাড়াতে যত কপট ভক্তি। প্রত্যক্ষ সব দুর্বৃত্ত দস্যুর যেখানে বাস, সেখানে সন্তজনেরা কেন বা যাইবেন?"

এই ঘটনাটি শিষ্যেরা একটা দাদূর অলৌকিকতার প্রমাণ রূপে ধরেন। কিন্তু ইহা তো সহজ সুবিবেচনার কথা।

এইসব অলৌকিকপনার উপর যে তাঁহার আস্থা ছিল না, তাহা তাঁহার বহু বাণীতেই বুঝা যায়। মিথ্যা ভেখ, মিথ্যা ভণ্ডামি এ-সব তাঁহার অসহ্য ছিল।

একবার দাদূ ভ্রমণ করিতে করৌলীতে গিয়াছিলেন—

করৌলীকে দেস মধি, রামত করণ কাজ।
স্বামীজী পধারে তহাঁ, নিকংদন কাল কে ॥

ভ্রমণ করার সময় চারিদিকে সবাই শুধু তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে ভক্তিভরে ঘোষণা করিতেন। এমন কি বালকেরাও 'দাদূ, দাদূ' করিত।

রামতি করতাঁ বালকাঁ দাদূ দাদূ ভাসি।

দাদূ বলিলেন, "সকলে কেন যে শুধু দাদূ দাদূ বলে, সকল ঘটের মধ্যে তো তাঁরই কীর্তি! আপন খুশিতে আপনি তারা এরূপ বলে, কিন্তু দাদূর কাছে কিছুই নাই।"

দাদূ দাদূ কহত হৈ, আপৈ সব ঘট মাঁহি।
অপনী রুচি আপৈ কহৈ দাদূ থৈঁ কুছ নাঁহি ॥

(সমর্থাই, অংগ-২১)।

একবার একজন সাধনার্থী আসিয়া দাদূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা নাকি যোগবলে সহস্রার হইতে অমৃতরস নিস্যন্দিত করাইয়া পান করেন?"

দাদূ কহিলেন, "অমৃতরস পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহা সাধুসঙ্গতির মধ্যে। লোকেরা সব কত-কত স্থানেই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া এই রস করে অন্বেষণ, কিন্তু আর কোথাও তো মিলিবে না এই রস।"

দাদূ পায়া প্রেমরস, সাধু সংগতি মাঁহি।
ফিরি ফিরি দেখৈ লোক সব, যহু রস কতহুঁ নাঁহি ॥

(সাধ কৌ, অংগ-৩৩)।

এই কথাই ভক্ত জয়মল পরে কহিলেন, "এই অমৃত না পাইবে পাতালে, না শশিসঙ্গে পাইবে আকাশে। প্রত্যক্ষ অমৃত যদি পাইতেই হয়, তবে জয়মল কহেন, তাহা পাইবে সাধুজনের সঙ্গতিতে।"

অমী পতাল ন পাইয়ে, না সসি সংগ আকাস।
প্রত্যখি অমী জু পাইয়ে, জৈমল সাধূ পাস ॥

সাধুসঙ্গতিতে তাঁহাদের কীর্তন চমৎকার জমিয়া উঠিত। তাহাতে এক এক সময় সুন্দর নৃত্যও চলিত। গুজরাতে কাঠিয়াওয়াড়ে ভজনী সাধুদের মধ্যে এইরূপ মন্দিরার তালে অতি মনোহর নৃত্য ও মন্দিরার বাদনকলা আছে। না দেখিলে তার চমৎকারিত্ব বুঝান অসম্ভব। দাদূ এইজন্য একবার গুজরাতে একজন শিষ্য সাধুকে একটু ভঙ্গী করিয়া লিখিয়া পাঠান কিছু মন্দিরা পাঠাইতে।

"গুরু দাদূ গুজরাত হইতে মন্দিরা আনাইলেন। তখন এই সাখীটি লিখিয়া দিয়াছিলেন, শুনিয়া ধীর শিষ্য তাহা আনিয়াছিলেন।"

গুর দাদূ গুজরাত থৈঁ মঁগরায়ে মংজীর।
তব য়হ সাখী লিখ দঈ, সুনি লায়ে শিখ ধীর।

সাখীটি এই—"ভগবদ্‌ভক্ত সাধুর হাতে সুরকে বাঁধিয়া উত্তম বাজে এমন যে বস্তু তাহা খুঁজিয়া লইও, শীঘ্র এখানে পাঠাইয়া দিও।"

দাদূ বাংধে সুর নরায়ে বাজৈঁ এহ্‌রা সোধি রু লীজ্যো।
রাম সনেহী সাধু হাথে, বেগা মোকলৈ দীজ্যো ॥

(পারিখ, অংগ-২৩)।

একবার নারায়ণা গ্রামে মেখ্‌ বখ্‌নাজী হোলির উৎসবে বসন্তের গান গাহিতেছিলেন। তখন দাদূ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, "সকল বসন্ত উৎসবই ব্যর্থ যদি স্বামীর সঙ্গ প্রিয়তমের সঙ্গ না মেলে। এমন শোভা সৌন্দর্য্য সবই তবে বৃথা।" "এমন দেহ যাঁর রচনা, তাঁর গুণগান কর।"

"ঐসা দেহ রচী রে ভাই। রাম নিরঞ্জন গারো আঈ ॥"

ইহা শুনিয়াই বখনার ঘন পরব্রহ্মের প্রতি ফিরিল।

(দাদূপন্থী সম্প্রদায় কথা, হিন্দী সাহিত্য-২য় পৃঃ)।

ভগবানের মধ্য দিয়া সর্বমানবের সঙ্গে যোগ

রাজ্জব দাদূকে বলিলেন, "তুমি আগে মানুষের সঙ্গে খুব মেলামেশা করিতে। এখন সে-সব ছাড়িয়া দিয়া এক ভগবানকে লইয়াই দিনরাত আছ। মানুষ কি হেলার জিনিস! দাদূ কহিলেন, "মানুষকে যে যথার্থভাবে চায়, সর্বমানবের সঙ্গে যে সত্যভাবে মিলিতে চায়, তাহাকে ভগবানের মধ্যেই সকল মানুষকে পাইতে হইবে। প্রভুকে পাইলেই সকলকে পাইবে, কারণ তাঁহাতেই সবাই মিলিতে পারে। তাঁহার মধ্যে সকলকে দেখিতে পাইলেই যথার্থভাবে সকলকে দেখা হয়, তিনি যদি (কেন্দ্রস্বরূপ) রহেন তবে সবাই (মিলিত হইয়া) রহে, নহিলে কেহই নাই।" "সর্বসুখ আমার স্বামী, সর্বমঙ্গল ও সর্বআনন্দ; আমার স্বামী সেই পরমানন্দকে ভেটিলেই, হে দাদূ সব স্বজন মিলিবে। আর কোথাও যাঁহার মন না মজিয়া এক এই ভগবানেই মজিল সেই একরসের মাধুর্য্যেই যাহার মন হইল পরিতৃপ্ত, হে দাদূ, তিনিই তো মানুষ।"

(নিহকরমী পতিব্রতা, অঙ্গ-১-২০)।

দাদূ যখন আমেরে ছিলেন তখন অদূরে এক যোগীর স্থান ছিল। তিনি দিনে বাহির হইতেন না, মাঝে-মাঝে গুহার মধ্যে থাকিয়া সিঙ্গা বাজাইতেন। একদিন গুহার মধ্য হইতে সিঙ্গা আর বাজিল না, সবাই বুঝিল যোগী মরিয়া গিয়াছেন—

গুরু দাদূ আবের থে ঢিগ জোগীকে থান।
ইক দিন সীংগী না বজী মরিগৌ জোগী জান॥

তখন দাদূ কহিলেন, "সিঙ্গারনাদ যে বাজিতেছে না, সে যোগী গেলেন কোথায়? যিনি মঢ়ীতে (মঠ কুটিরে) থাকিতেন এবং রসভোগ করিতেন তিনি আজ গেলেন কোথায়?"

(দাদূ কালকৌ, অঙ্গ-২১)।

দেহ গুহার মধ্যে দেহী যোগীরও কথা ইহাতে স্থচিত করা হইয়াছে।

একদিন আমেরে সেখ ফরীদজীর সঙ্গে দাদূর ধর্ম-প্রসঙ্গ চলিতেছিল, তখন দাদূ এই প্রার্থনা ভগবানের উদ্দেশে উচ্চারণ করিলেন—

"তুমি বিনা সকল সংসার রসাতলে ডুবিয়া যাইতেছে। হে প্রভু, হাতে ধরিয়া বিশ্বজনকে উদ্ধার কর, আশ্রয় ও অবলম্বন দাও; দাহ জ্বালা লাগিয়া জগৎ জ্বলিতেছে। সংসার ভরিয়া ঘটে ঘটে এই জ্বালা, আমার চেষ্টায় কোনো প্রতিকারই হয় না, তুমি প্রেমরস বর্ষণ করিয়া এই জ্বালা জুড়াও। হে মন, প্রভু বিনা জীব সব অনাথ, প্রভুই উদ্ধার করিতে পারেন, সবাই যেন প্রভুর শরণাপন্ন হয়। হে ভগবান, মরণের পথে কাহাকেও যাইতে দিও না।"

গরক রসাতল জাতহৈ, তুম বিন সব সংসার।
কর গহি কর্তা কাঢ়িলে, দে অবলংবন অধার॥
দাদূ দৌঁ লাগি জগ পরজলৈ ঘটি ঘটি সব সংসার।
হম থৈঁ কছূ ন হোত হৈ, তুম বররি বুঝারণহার॥
দাদূ আত্মজীব অনাথ সব, করতার উবারৈ।
রাম নিহোরা কীজিয়ে জিনি কাহূ মারৈ॥

(বিনতী, অংগ-৫৮—৬০)।

(প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪২)

বিজয়কালী ভট্টাচার্য

তুলসীরামায়ণে অধ্যাত্মতত্ত্ব

তুলসীরামায়ণের অধ্যাত্মতত্ত্ব মুখ্যত ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইয়াছে। ইহার বীজ প্রধানত অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইলেও অধ্যাত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ ব্যাপারে তুলসীদাস নিজস্ব পথ অবলম্বন করিয়াছেন। মূল ইতিবৃত্তাংশে বাল্মীকি রামায়ণের সহিত অধ্যাত্ম রামায়ণের অনেক কিছু সঙ্গতি আছে। তুলসীরামায়ণেও তেমনি আছে। আবার তুলসীদাস দ্বৈতবাদের ভিত্তিভূমিতে অদ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে অদ্বৈতবাদের দ্বৈত ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তুলসীরামায়ণের রামকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সগুণরূপে মায়া, মনুষ্যাকারে মানুষের সুখ-দুঃখ বিনাশের জন্য আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে। ফলে রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অথবা চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের তত্ত্বগত জটিলতা তুলসীরামায়ণে নেই। সকল ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় নামের প্রাধান্য দেওয়া হইলেও তুলসী তাহা সহজ সরল ভাষায় করিয়াছেন, যাহা সহজে ভক্তের মনে রেখাপাত করে। যথাযথভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ত্যাগ করিয়া রামের জীবনচরিতকে যথাযথ বিশ্লেষণ করিলে নির্গুণ ব্রহ্মরূপী রামের সগুণ মূর্তিকে অনুভব করা যায়। নির্গুণ ব্রহ্ম মানুষের জীবন-চরিতের মাঝে সগুণ হয় ইহার মধ্যে বাস্তব ভেদ নাই। সর্বত্যাগী শিব হইয়া এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিলে তবে এই অভেদ জ্ঞান পরিপক্ক হয়। রামের যে নৃপরূপে অবস্থিতি, তাহা বাস্তবিক পক্ষে সাধারণ চক্ষুতে মনুষ্যোচিত বহু ত্রুটির সন্ধান দেয়, যার জন্য সতীর ও ভরদ্বাজের সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু কাকভুষুণ্ডির বা যাজ্ঞবল্ক্যের সন্দেহ ছিল না। এই তত্ত্ব বহু পরীক্ষার পরে শিব ভবানীকে বুঝাইয়াছিলেন এবং কাকভুষুণ্ডি ও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা শুনিয়াছিলেন।

তুলসীদাস পরম ভক্তের দৃষ্টিতে রামের এই নির্গুণ তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মানুষের অভিমান ও ভগবৎসৃষ্ট মায়া-স্বরূপে রামকে চিনিতে দেয় না। বাস্তবিক অভিমানের অতীত হইলে এবং সর্বতোভাবে মন অবিদ্যামুক্ত হইলে তখন ভগবানের করুণা যথাবিধি বর্ধিত হয় এবং সগুণ রামে নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গ ও রামনাম জপই এই উদ্দেশ্যে প্রধান অবলম্বন। ক্রোধাদি রিপু ও মায়া দ্বৈতবুদ্ধি আনে। মায়াবিবশ হইয়াই মানুষ ঈশ্বরকে জীব বলিয়া ভুল করে। অসাধুসঙ্গ, পরনিন্দা প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরকে স্বরূপে বুঝা

যায় না। বিষয়বুদ্ধিতে মন আসক্ত থাকে বলিয়া ঈশ্বরকে স্বরূপে উপলব্ধি করা যায় না। সাধারণ জীব শোক, হর্ষ, ভয়, প্রীতি, বিয়োগ প্রভৃতি রোগে অহরহ ভুগিতেছে। ফলে ঈশ্বরানুভূতি বা আত্মসুখ তাঁহাদের দুষ্প্রাপ্য হয়। তাই শিব হইয়া রঘুপতি কথা শুনিলেই তবে সগুণ রাম নির্গুণের রূপ ধারণ করে। তুলসীর অধ্যাত্মতত্ত্বের এই সহজ ও সরল রূপ যাহা তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন এমন সহজ ও সরল ব্যাখ্যা কোন গ্রন্থে নাই।

বাল্মীকি রামায়ণে রামকে প্রজাপতিসম, বীর্যে বিষ্ণুসদৃশ বলা হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডে তাঁহাকে ভগবান নারায়ণ ও পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে রামকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে। তাঁহাকে পরম পুরুষরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তিনি মায়ারূপে প্রকাশ্যমান জগৎ—তাহাই হইল প্রকৃতি, চুম্বক-প্রস্তরের নিকট লৌহের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সমীপবর্তী হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের সীতাই যেন প্রকৃতি, পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিয়া সৃষ্টি ক্রিয়া চলে। পুরুষবাচক দেবতার সহিত রামের সমন্বয় করিয়া নারদ প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব অধ্যাত্ম রামায়ণে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের অব্যক্ত ও মহান্ এবং অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তাপস দৃষ্টিতে এবং জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতত্ত্বে ব্যাখ্যা অগস্ত্যমুখে অরণ্যকাণ্ডে রামের নিকট করা হইয়াছে। বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, স্বয়ংপ্রভা সুগ্রীব, বালি, হনুমান, নারদ, মন্দোদরী, ব্রহ্মা, ভরদ্বাজ, কৌশল্যা—সকলেই অধ্যাত্ম রামায়ণে রামকে পরমব্রহ্ম বলিয়াছেন অথবা বিষ্ণু ও নারায়ণের সমপর্যায়ে আনিয়াছেন। বিরিঞ্চি, প্রজাপতি, শিব প্রভৃতি তাঁহার গৌণরূপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনিই মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদিরূপে অবতীর্ণ হন। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন। এই যাবতীয় সৃষ্টি মায়াসৃষ্ট। সত্ত্ব, রজ, তম, গুণদ্বারা ইহা সকল কল্পে সাধিত হয়। রাম এ-সকলের অতীত। অদ্বৈতবাদের এই দ্বৈতব্যাখ্যা অধ্যাত্ম রামায়ণ করিয়াছেন।

তুলসী এই তত্ত্বকে সহজতর ও সরলতর ভাষায় সর্বজনবোধ্য তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করিয়া ভক্তিমার্গের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যাতে নির্গুণতত্ত্বও বাদ যায় নাই। রামায়ণ বহু দেখা যায় তুলসী বলিয়াছেন। জৈনগণ লিখিত কানাড়ি ভাষায় পম্পা রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, ভুষুণ্ডি রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণান্তর্গত রামগীতা, যাহা পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল, তাহারই উল্লেখ অন্যভাবে তিনি করিয়াছেন।

এই রামচরিতমানসের ইতিবৃত্তাংশ মূল বাল্মীকি রামায়ণ আশ্রয় করিয়া

লিখিত হইলেও ইহার বীজ—'শিব রামভক্ত' —এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া তিনি পুস্তক রচনা করেন। এই তত্ত্ব তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে প্রধানত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার রামচরিতমানসে ও অধ্যাত্ম রামায়ণে শিবতত্ত্ব মুখ্যত একপ্রকার। তবে অধ্যাত্ম রামায়ণের এই বিবৃতি অতি সংক্ষিপ্ত আকারে সূতমুখে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা তাঁহার বক্তা হইলেও সেখানে হরপার্বতী-সংবাদ রূপে সমগ্র পুস্তক লিখিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের যে উপক্রমণিকাধ্যায় তাহাই রামচরিতমানসের বীজ। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া তুলসীদাসের লেখনীতে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

নারদ মূল বাল্মীকি রামায়ণে আছেন, অধ্যাত্ম রামায়ণে আছেন আবার তুলসীরামায়ণেও আছেন, কিন্তু সকল স্থানে তাঁহার রূপ ঠিক একভাবে দেখান হয় নাই। তুলসীর নারদ পরম ভক্তরূপে রামচরিতমানসের বহু উপাদান প্রদান করিয়াছেন হরপার্বতী-বিবাহে তিনি ঘটকালি করিয়া অঘটন ঘটাইয়াছেন। আবার শিবের কথা অগ্রাহ্য করিয়া অভিমানদৃপ্ত হইলে বিষ্ণু ছলনা করিয়া তাঁহার অভিমান চূর্ণ করিয়াছেন। নারদও তুষ্ট ভক্তের ন্যায় গুরুকে প্রতিশোধ দিয়া তাঁহার ভক্তিতত্ত্ব রক্ষা করিয়া ধরাধামে তাঁহার সেবক হইতে চাহিয়াছেন। পাঠকগণ তুলসীদাসের অপূর্ব রচনাশৈলী নারদ-বর্ণনায় পড়িয়া মোহিত হইবেন এবং অপূর্ব শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। তুলসীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা তদানীন্তন মোগল সম্রাট আকবর ও তাঁহার রাজস্বসচিব তোডরমল্লকেও তাঁহার অনুরাগী করিয়াছিল। অদ্বৈতবাদী দণ্ডী সন্ন্যাসী মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় ও তাঁহার রামচরিতমানসকে অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রামচরিতমানস পড়িয়া তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—

আনন্দকাননে হ্যস্মিন্ জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমর-ভূষিতা।

'কাশীরূপ আনন্দ-কাননে ভ্রমণশীল যে তুলসীবৃক্ষ তাহা স্বয়ং তুলসীদাস, তাঁহার রামচরিতমানসের কবিতা হইল সেই তুলসীবৃক্ষের মঞ্জরী, আর সেই মঞ্জরীতে শোভা পাইতেছেন রামরূপী ভ্রমর।'

(রামচরিতমানস, প্রথম খণ্ড)

ডঃ আহমদ শরীফ

সুফী তত্ত্ব ও দর্শন

স্রষ্টা স্বীকার করলেই তাঁর সঙ্গে স্বতই একটা সম্পর্ক-চেতনা জাগে। আর তার থেকে আসে 'ভয়-ভরসার' অনুভূতি এবং তজ্জাত দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি। এ-দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধির প্রসারে ও বিকাশে বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-আদর্শ, আচার-আচরণ, শাস্ত্র-সমাজ প্রভৃতি হাজারো স্বেচ্ছাবৃত নিয়ম-নিগড় গড়ে উঠে।

আদিম অজ্ঞ অসহায় আত্মপ্রত্যয়বিরহী মানবকে সর্বপ্রাণবাদী হতে হয় জীবন-জীবিকার ভয়-ভরসা বশেই। জীবনপথের বাঁকে-বাঁকে জীবন ও জীবিকার সমস্যা ও নিরাপত্তা-চেতনা তাদেরকে ক্রমে-ক্রমে জাদুবিশ্বাসে, টোটেম-টেবু সংস্কারে পুষ্ট করে তোলে। অজ্ঞ-অসহায় মানুষের রহস্য চিন্তা ও জিজ্ঞাসা কাল্পনিক তত্ত্বে নিবৃত্তি খোঁজে। আর আত্মপ্রত্যয়ী বুদ্ধিমান সন্ধান করে তথ্য। সে মানুষ চিরকালই দুর্লভ।

মানুষের মন-মননের কালিক বিকাশের ও জনবল বৃদ্ধির ফলে হাতিয়ারের বিবর্তন ও উৎকর্ষ ঘটে, সে-সঙ্গে জীবিকা-পদ্ধতির আর প্রতিবেশ-চেতনারও ঘটে পরিবর্তন। তার ফলেই মানুষের তত্ত্বচিন্তাও পরিবেশের অনুগত হয়ে নবরূপ ও রূপান্তর লাভ করে। এভাবেই ক্রমবিকাশের ধারায় সর্বপ্রাণবাদ, জাদুবিশ্বাস ও টেবু-টোটেম স্তর অতিক্রম করে দেববাদী, প্রেতবাদী, সর্বেশ্বর-বাদী, দেহবাদী হয়ে অবশেষে একেশ্বরবাদী কিংবা নাস্তিক হয়েছে মানুষ।

স্বীকার করতেই হবে অজ্ঞ ও অক্ষমের জিজ্ঞাসাই কল্পনার জনক। এ-কল্পনা থেকেই আবার ভয়-ভরসাপ্রবণ মানুষের সংস্কারের উদ্ভব। আর সংস্কার অনপনেয় হলেই তা বিশ্বাসরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। অন্য কথায় জ্ঞানবিহীনতাই বিশ্বাস, আর বিশ্বাসকে যুক্তিযোগে প্রমাণের প্রয়াস পুতুলকে প্রাণীরূপে স্বীকার করারই নামান্তর মাত্র।

প্রাণে বাঁচার জন্যে যেমন খাদ্য দরকার, তেমনি মনে বাঁচারও অবলম্বন চাই। বাঁচতে হলে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার আশ্বাস, রোগে-বিপদে দৈব শক্তির ভরসা এবং ব্যক্তিক-জীবনে জনশক্তির সহায়তা প্রয়োজন। এ-প্রয়োজন-চেতনা থেকেই মূলত সবকিছুর উদ্ভব। অতিক্রান্ত আদিম স্তরের ও সভ্যতার মধ্যস্তরের মানুষের ভাব-ভাবনার একটি দিকই আমাদের আলোচ্য বিষয়। গোত্রীয়-জীবনে জনবল বৃদ্ধির ও হাতিয়ারের উৎকর্ষের ফলে মানুষ যখন জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বনির্ভর ও নিশ্চিন্ত, আর তার ফলে মননপ্রবণ, তখন

সে জগৎ ও জীবনের, সৃষ্টির ও স্রষ্টার রহস্য অনুধাবনে হয় নিরত। জীবনের তাৎপর্য-সন্ধিৎসা তাকে দেহ সম্বন্ধেই সচেতন করে তোলে। এই যে পরিবর্তনশীল নশ্বর দেহ, তার মধ্যে যে-চেতনা সঞ্চরমান তার স্বরূপ কি! সে-সূত্রেই আকাশ ও মাটির সবকিছুই তার মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে—তাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

দেহাধারে স্থিত ঐ অনন্য, অসামান্য নিরাকার অপরূপ যে-চেতনা তার রহস্য জানবার, বুঝবার জন্যেই দেহাধার-রহস্যভেদ করা প্রয়োজন। দেহের অন্ধি-সন্ধি বুঝবার জন্যে শুরু হলো কায়াসাধন—দেহতত্ত্ব সন্ধান। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার স্বরূপ জানা হলো আবশ্যিক। প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব এরই প্রসূন। এটিই পরবর্তী কালের সাংখ্যদর্শন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লোকায়ত মৈথুনতত্ত্ব—যা ঔপনিষদিকও। কায়াসাধন-পদ্ধতি, তথা কায়াকে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনার ও রাখার প্রক্রিয়ার নাম যোগ। দেহ ও চেতনার সমন্বয়ে তৃতীয় শক্তি সৃষ্টির অনুশীলনে প্রযুক্ত হলো আরো এক পদ্ধতি, তার নাম তন্ত্র। এ-সবই অষ্ট্রিক-মঙ্গোলের মানস-প্রসূন—জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনার ফসল। সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র ও লোকায়ত মৈথুনতত্ত্ব ছিল আদিতে দেহাত্মবাদ ও নাস্তিক মত।

আর্য-ব্রাহ্মণ্য যুগে এ-সব তত্ত্বের ও শাস্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে এবং এ-সব সর্বভারতীয় শাস্ত্রের মর্যাদায় উন্নীত হয়। বৌদ্ধ যুগে এ-সব মত আরো সূক্ষ্ম দার্শনিক তাৎপর্য লাভ করে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ও সাধক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটায়—মন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজযানী-যোগী-তান্ত্রিক-শ্রাবক-সন্ন্যাসী-সহজিয়া-বাউল সম্প্রদায়ের কালিক উদ্ভবের মূলে রয়েছে ঐ সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র-মৈথুনতত্ত্বের কালিক রূপান্তর।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় যোগ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, তাই বৌদ্ধ চার-চক্র বা কায় ব্রাহ্মণ্য ষটচক্রে পরিণতি পায়। বিলুপ্ত-প্রায় বৌদ্ধ থেকে দীক্ষিতের সংখ্যাধিক্যের দরুণ বাঙলার মুসলিম সমাজে বৌদ্ধ চতুর্চক্রই প্রাধান্য পায়।

কোরআনের ইসলামে অধ্যাত্মতত্ত্ব তেমন গুরুত্ব পায় নি। 'রব' (প্রভু) ও আব্‌দ্ (বান্দা) তথা উপাস্য-উপাসক তত্ত্বই সেখানে মুখ্য। আল্লাহ্ প্রতি অনুগত থেকে আল্লাহ্ নির্দেশিত বিধি-নিষেধ মেনে চললেই বান্দা তথা মানুষ নিষ্পাপ তথা অনুগত ও কর্তব্যনিষ্ঠ বলে পুরস্কৃত হওয়ার কথা। কিন্তু ইসলাম সিরিয়ায়, ইরাকে, মিশরে, ইরাণে ও মধ্য-এশিয়ায় প্রচারিত হওয়ার পরেও সেখানকার ইহুদী, খ্রীস্টান, মানী, মজ্‌দকী, গ্রীক, বৌদ্ধ ও সর্বেশ্বরবাদী হিন্দুর মরমীয়াবাদের প্রভাব-পুষ্ট পূর্বপুরুষের সংস্কার নবদীক্ষিত মুসলিমের মর্মমূলে থেকে যায়। ফলে দেহ, আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে তাদের উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত চেতনা

অল্পকালের মধ্যেই প্রবল হতে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকেই সূফীমতের উন্মেষ হতে থাকে—কুফার আবু হাশিম (মৃঃ ১৬২ হিঃ), ইব্রাহিম আদহম (মৃ ১৬২ হিঃ), ফজিল আযাজ (মৃঃ ১৮৮ হিঃ), মারুফ কর্খী, দাউদতায়ী (মৃঃ ১৬৫ হিঃ), হাসান বসোরী, রাবিয়া বসোরী প্রভৃতির মধ্যেই বৈরাগ্য ও আল্লাহ-প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এর ফলেই জুনজুন মিশরী (মৃঃ ২৪৫/৪৬ হিঃ), জুনাইদ বাগদাদী (মৃঃ ২৯৭ হিঃ), বায়জীদ বিস্তামী (মৃঃ ২৬০ হিঃ), আবু হোসেন বিন মনসুর হল্লাজ (মৃঃ ৩০৯ হিঃ), আস্ শিবলী (মৃঃ ৩০৯ হিঃ) আবু সৈয়দ (মৃঃ ১০৪৯ খ্রী) প্রমুখ বৈরাগ্য-প্রবণ পরমাত্মার সান্নিধ্যকামী ও আত্মা-পরমাত্মার স্বরূপ সন্ধানী অদ্বৈত-বাদী সূফীদের আবির্ভাব ঘটে। এ-মতবাদের সমর্থনে কোরআনের কয়েকটি আয়াতের গূঢ় তাৎপর্যও আবিষ্কৃত হলো। ফলে সূফীবাদ ইসলামের তৃতীয়-শতকের প্রথমার্ধেই ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃতি পেল। ইসলাম ছিল দ্বৈতবাদীমত অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার সত্তায় পৃথক। আর সূফীরা হলেন বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী তথা আত্মা-পরমাত্মারই খণ্ডাংশ। এ তত্ত্ব কোরআন-উক্ত তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। একে কোরআন-সম্মত বলে চালিয়ে দেয়া হলো, আর একটি তত্ত্ব যোগ করে—তা হলো, আল্লাহ্র নুরে মুহম্মদ সৃষ্টি এবং তাঁর নুরে জগৎ সৃষ্ট। কোরআন-হাসিদ পন্থীরা গোড়ার দিকে মনসুর হল্লাজ সিহাবুদ্দীন সোহরওয়ার্দী, ফজলুল্লাহ প্রভৃতিকে নির্যাতিত ও হত্যা করলেও পরে সূফী মতকে কোরআন অনুগ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। যদিও সূফীর সংখ্যা দুনিয়ায় আজো বেশি নয়। কালক্রমে কোরআন-হাদিসের শরীয়ৎ ও সূফীর মারিফৎ সাধনার আদি ও অন্ত্যন্তর বা মার্গরূপে বিবেচিত হয় এবং বৌদ্ধ প্রভাবে পীরবাদ বা গুরুবাদ বিশেষ গুরুত্ব পায় ও জনপ্রিয় হয়। বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্বের প্রভাবে সূফী যেমন পরিণামে পরমাত্মায় আত্মবিলুপ্তি করে, তেমনি বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্বের প্রভাবে ফানাতত্ত্বে অহং-এর বিলোপে আস্থা রাখে। প্রথমটির নাম বাকাবিল্লাহ, দ্বিতীয়টির নাম ফানাফিল্লাহ।

সূফীমত বলতে কোন অভিন্নমত ছিল না গোড়া থেকেই। বিভিন্ন সূফীর উপলব্ধ তত্ত্ব শিষ্যপরম্পরায় বিকশিত ও বিকৃত হয়ে অনেক সূফীখান্দানের বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়েছে কালে-কালে।

ভারতে বিভিন্ন সূফীমতের উপর স্থানিক প্রভাব কালক্রমে গভীর ও ব্যাপক হয়েছে। মদারিয়া, কলন্দরিয়া ও নকশীবন্দিয়া মতবাদে ও সাধনতত্ত্বে ভারতীয় দেহতত্ত্ব ও যোগের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। তারা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী, কুণ্ডলিনী শক্তি, মণিপুর আর অনাহত, আজ্ঞাচক্র প্রভৃতিও স্বীকার করে।

দেহে ষড়রঙের জ্যোতিকে নির্বর্ণ জ্যোতিতে পরিণত করাই তাদের লক্ষ্য। এটি শিব-শক্তি মিলনজাত সচ্চিদানন্দের কিংবা বৌদ্ধ সহজানন্দের আদলে পরিকল্পিত। পরবর্তী শাত্তারিয়া ও গাওসিয়া প্রভৃতি সূফীমতও ভারত-উদ্ভূত। সাধনায় সৃষ্টিতত্ত্ব, কায়াতত্ত্ব, বীর্যতত্ত্ব, গর্ভতত্ত্ব, জন্মতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, শ্বাসতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব, মৃত্যুতত্ত্ব প্রভৃতির জ্ঞান হয়েছে আবশ্যিক। কামরূপের ভোজ বর্মণ রচিত 'অমৃতকুণ্ড'ই এক্ষেত্রে এদের অনুসৃত আদি গ্রন্থ। বারো শতকেই গৌড়-লখণোতিতে এ-গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়, পরে আর একবার আরবীতে এবং ফারসীতেও অনূদিত হয়

ভারতীয় যোগ-চর্যা ও কিছু তন্ত্রাচার গ্রহণ করলেও ভারতীয় সূফীরা আরবী ফারসী পরিভাষা প্রয়োগ করে তাকে ইসলামী আবরণ দেওয়ার চেষ্টা গোড়া থেকেই করেছেন। বজ্র বা বীর্যকে শির কুণ্ডলিনী শক্তি প্রভৃতিকে তনতলতিফ্, তন কসিফ্, তন ফানি, তনবাকাউ, ষড়পদ্ম জ্যোতিকে লতিফা, নির্বাণকে ফানা, অদ্বৈতসিদ্ধিকে বাকা এবং ধ্যানকে মুরকিবাহ্, জপকে যিক্‌র বিভিন্ন স্তর ও স্থিতিকে মোকাম-মঞ্জিল রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ আত্মতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বের অনুরূপ হচ্ছে আম্বরী, সম্বুরী, মুজাওয়ারী ও নিলুফারী দীলতত্ত্ব। আবার সূফীদের প্রভাবও পড়েছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবে, বৈষ্ণব সহজিয়ায় ও বাউলমতে। বৈষ্ণবের আখড়া (খানকা) গান (সামা), নৃত্য (হালকা) কীর্তনের আসর (দারা) দশা (হাল) প্রভৃতি সূফীচর্যার অনুসৃতি। সূফী সাধনার চারটি স্তর—শরীয়ৎ, তরিকৎ, হকিকৎ ও মারিফৎ—প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধি ও রাবিতা, মুরাকিরা ও ফানাফিশ শেখা (গুরুতে আত্মসমর্পণ) প্রভৃতিতে অনুসৃত। আল্লাহ্‌কে বৌদ্ধ শূন্যের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন কোন কোন সূফী :

> দেখিতে না পারি যারে তারে বুলি শূন্য।···
> সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
>
> (জ্ঞান প্রদীপ—সৈয়দ সুলতান)

বামাচারী যোগ-সাধনাও বাঙালি সূফীর স্বীকৃতি পেয়েছে :

পরকীয়ার সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস (জ্ঞান-সাগর—আলি রেজা)। কায়া সাধনের তত্ত্ব রয়েছে বলে বাঙলার মুসলিমের কাছে নাথ সাহিত্য অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ভারতীয় যোগ-তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে দেশী সূফীতত্ত্বের ও চর্যার আরো অনেক মিল রয়েছে।

বাঙলায় যোগ-তন্ত্র প্রভাবিত অনেক সূফীগ্রন্থই রচিত হয়েছে: যেমন ষোল শতকে ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয়, অজানা লেখকের যোগকলন্দর, মীর সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান-প্রদীপ—জ্ঞান-চৌতিশা, হাজী মুহম্মদের সুরতনামা বা নুরজামাল, শতেরো শতকে মীর মুহম্মদ সফীর নুরনামা, শেখ চান্দের হরগৌরী সম্বাদ ও তালিবনামা, নিযাজের যোগকলন্দর, আব্দুল হাকিমের চারিমোকাম-ভেদ ও শিহাবুদ্দীননামা, শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয়, আঠারো শতকে আলিরজার আগম ও জ্ঞান-সাগর, বালক ফকিরের জ্ঞান-চৌতিশা, মোহসীন আলির মোকাম-মঞ্জিল কথা, শেখ জেবুর আগম, শেখ মনসুরের সির্নামা, উনিশ শতকে রমজান আলীর আত্মব্যক্ত, রহিমুল্লাহর তনতেলাওত ও সিহাজুল্লাহর যুগীকাচ প্রভৃতি রচিত। যোগচর্যানির্ভর অধ্যাত্ম তত্ত্বের ও সাধনার কথাই এসব গ্রন্থে আলোচিত। এসব গ্রন্থে অমৃতকুণ্ডের প্রভাবও অবিরল। এসব গ্রন্থে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেহতত্ত্ব এবং সূফীর ফানা-বাকা, বৌদ্ধ শূন্য-নির্বাণ এবং বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্ব প্রভৃতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রত্যয়গুলো বর্ণিত হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, মোক্ষতত্ত্ব ও মৃত্যুতত্ত্ব এসব গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। এসব গ্রন্থে ইসলামী ও বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বচিন্তার ও সাধনতত্ত্বের অসঙ্গত ও অসমঞ্জস মিশ্রণও প্রকট।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন মানুষই উদাসীন থাকতে পারে না। জীবন-ভাবনা ও জগৎ-রহস্য তাকে জন্মকাল থেকেই বিচলিত রাখে। তার মনের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা সে তার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে চরিতার্থ করার প্রয়াসী। যে-কোন জিজ্ঞাসার মনোময় উত্তর খোঁজা ও তৃপ্তিকর একটি সিদ্ধান্তে পৌছান তার পক্ষে তার আত্মার আরামের জন্যে আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এই অর্থেই মানুষ মাত্রই দার্শনিক। কিন্তু আদ্যিকালের ভয়, বিস্ময় ও কল্পনাপ্রবণ অজ্ঞ মানুষ স্থূল বুদ্ধি ও মোটা কল্পনা দিয়ে জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা এবং বিশ্ব-নিয়মের কার্যকারণ সম্পর্কে যে-সব মীমাংসায় ও সিদ্ধান্তে উপনীত হল, কচিৎ উপলব্ধির চমকপ্রদ কিছু দীপ্তি থাকলেও তার মধ্যে তথ্য যেমন বিরল, চিন্তা ও যুক্তির স্থূলতা এবং অসারতাও তেমনি প্রকট।

সব মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, রুচি-কৌতূহল এক রকমের নয়। এক মাপেরও নয়। তাই মানুষের রহস্য-চেতনা এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ লাভ করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে, গোত্রে গোত্রে ও শাস্ত্রে শাস্ত্রে তাই মানুষের তত্ত্ববুদ্ধি বহু ও বিচিত্র হয়ে প্রকাশ ও বিকাশ পেয়েছে। বহু যুগের বহু মানবের অনবরত প্রয়াসে ও মননশক্তির উৎকর্ষে এবং

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কিত তত্ত্বচিন্তা কয়েকটি বিশেষ সূত্রে সংহত হলেও, তা কখনো সর্ব-মানবিক কিংবা সর্বসম্মত তত্ত্বের মর্যাদা পায় নি। কখনো পাবেও না হয়তো। তাই দর্শন মাত্রই বিতর্কিত ও তর্কসাপেক্ষ বিষয়। সীমিত শক্তির ইন্দ্রিয় দিয়ে অতীন্দ্রিয়ের ধারণা কখনো পূর্ণ ও নির্ভুল হতে পারে না। তাই দর্শনে তথ্য ও তত্ত্ব বিমিশ্র হয়ে অভিন্ন সত্য হয়ে উঠে না। দার্শনিক যুক্তিও তাই প্রায়ই একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। অদৃশ্যকে কথা দিয়ে দৃশ্যমান করা, অধরাকে বাক্‌চাতুর্যে ধরা, অবোধ্যকে যুক্তি দিয়ে বোধগত করা, পুতুলে হাত-পা-চোখ বসিয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার দাবি করার নামান্তর মাত্র। তবু জীবন-চেতনা ও জগৎ-জিজ্ঞাসা মানুষ মাত্রেরই স্বভাবজ বলে মানুষ রহস্য আবিষ্কার প্রয়াসে চির অক্লান্ত। কেননা, ক্ষণে ক্ষণে সে অনুভব করে—জীবনের মূল রয়েছে কোন এক রহস্যলোকে, গতি হচ্ছে এক অদৃশ্য জগতে এবং সম্ভাবনা তার বিপুল ও অনন্ত। তাই অসীমের সীমা খোঁজা, অজানাকে জানা, অদৃশ্যকে দেখা তার চির অসাফল্যে বিড়ম্বিত মায়াবী আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত। অকূলে কূল পাবার, অসীমের সীমা খোঁজার, অরূপের রূপ দেখার আকুলতা প্রকাশেই এর সার্থকতা। কেননা, এতেই আত্মার আকৃতি আনন্দময় প্রয়াসে নিঃশেষ হবার সুযোগ পায়। ইরানী কবির জবানীতে জগৎ হচ্ছে একটি ছেঁড়া পুথি, 'এর আদি গেছে হারিয়ে, অন্ত রয়েছে অলেখা। কাজেই এর আদি-অন্তের রহস্য কোন দিনই জানা যাবে না। তবু অবোধ মন বুঝ মানে না, তাই ঘরও নয়, গন্তব্যও নয়, পথে নেমে, পথ চলে পথের দিশা খুঁজে, পথ-বাড়ানোর ক্ষ্যাপামি তাকে পেয়ে বসে। এই মোহময়ী মরীচিকাই দিগন্তহীন আকাশচারিতার আনন্দে অভিভূত রাখে। জীবনে এই আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ্ত আবেগ, এই আনন্দিত অভিভূতিই যথার্থ লাভ। কেননা, বিবেকের বোধনে, আত্মার উৎকর্ষসাধনে ও বিকাশে এবং শ্রেয়সে উত্তরণে এই ভাব-চিন্তা ও অনুভব-উপলব্ধিই পুঁজি।'

জগৎ ও জীবনের নিয়ামক ও তাৎপর্য সন্ধান করতে গিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে ভূত-প্রেত, দত্যি-দানা, জীন-পরী, দেবতা-অপদেবতা, হুর-গন্ধর্ব-অপ্সরা, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির হাজারো বিশ্বাস সংস্কার সমন্বিত ইমারত। এর মধ্যেই নিশ্চিত বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত সুস্থিরতায় সুস্থ জীবনধারণের আশ্বাসে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য উপভোগ প্রয়াসী। এমনি করে জীবনকে অজানা থেকে অসীমতায় প্রসারিত করে মানুষ তার যৌথ-জীবনে ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ-স্বাচ্ছল্য কামনা করেছে। তারই ফলে বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। গড়ে উঠেছে জাত-ধর্ম-রাষ্ট্র,

আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে ঈর্ষা-অসূয়া-ঘৃণা, প্রীতি-সেবা-ত্যাগ। মানুষ হয়েছে ইষ্ট ও অরি। বহু যুগের বহু মানুষের সাধনায় ও দ্বন্দ্বে-মিলনে মানব সমাজ আজকের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। যদিও সব মানুষের ওসব সমাজের বা গোত্রের উত্তরণ সমপর্যায়ের নয়। আদিম আরণ্য-মানব যেমন রয়েছে, তেমনি প্রাগ্রসর মানুষেরও অভাব নেই। তার কারণ, সব মানুষের প্রতিবেশ ও মনন-শক্তি সমভাবে বিকাশ-পথ পায় নি। স্থূল চিন্তার স্বাক্ষর আজো তাই প্রকট। বিশেষ করে শাস্ত্রীয় চিন্তার স্থূলতা ও সংস্কার থেকে অধিকাংশ মানুষ মুক্ত নয় বলে মানবভাগ্য ও তার জীবন-জীবিকার যন্ত্রণা, তার শাসন-পেষণ-শোষণের বিকার আজো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষও রয়েছে পূর্ববৎ।

তবু মানবভাগ্যের নিয়ামক নিয়ন্তা হিসেবে দর্শন ও দার্শনিকের ভূমিকা কখনো গুরুত্ব হারাবে না। মানব-প্রগতি চিরকালই তত্ত্বচিন্তার প্রসূন হয়ে থাকবে। কেননা, মানুষ বাঁচে প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে। এবং এ-দুটোই জন্মে চিত্তলোকে। এগুলো যুক্তিজাত নয়, বাঁচার গরজপ্রসূত। জন্ম-মৃত্যুর পরিসরাতীত অনন্ত জীবন-তৃষ্ণাই মানুষকে প্রত্যয়ী ও প্রত্যাশী রাখে। জ্ঞান-শূন্যতায় বিশ্বাসের উদ্ভব, বিশ্বাসের পোষক কল্পনা ও আত্মপ্রত্যয়বিরহী দুর্বলের ভয়-ভরসা, কাজেই যুক্তি-প্রমাণ নয়—অনুভূতিপ্রসূত বিশ্বাস-সংস্কারই তত্ত্ব সাহিত্যের একাধারে প্রাণ ও পোষ্টা।

মোজাম্মেল হক

কোরবানী কাহিনী

কোরবানী মুসলমান জগতের একটি প্রধান ধর্মক্রিয়া। এই ক্রিয়া লইয়া কয়েক বৎসর হইতে ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে কিরূপ ভয়ানক অনর্থোৎপত্তি হইতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু কোন সূত্র হইতে যে, এই ইসলামিক ধর্মানুষ্ঠানটির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বোধহয়, অনেকেই অবগত নহেন।

অনেক দিনের কথা—ইসলাম ধর্মগুরু হজরত মোহাম্মদের জন্মগ্রহণের আড়াই হাজার বৎসরের পূর্বের ঘটনা। তাঁহার পূর্বপুরুষ ধর্মাত্মা হজরত ইব্রাহিম একদা নিশীথকালে স্বপ্নযোগে দেবাদেশ পাইলেন—'ইব্রাহিম! আমার সন্তোষ বিধানার্থ কোরবানী কর।' স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, ইব্রাহিম জাগ্রত হইলেন। তিনি দৈবাদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন এবং প্রভাতেই তাহা সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়া চিন্তিতচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগলেন। দেখিতে দেখিতে নিশাবসান হইল, তখন ইব্রাহিম অবিলম্বে প্রাভাতিক উপাসনা সাঙ্গ করিয়া, প্রফুল্ল মনে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিশ্ব-স্রষ্টার উদ্দেশে একশত উট কোরবানী করিলেন।

উষ্ট্র উৎসৃষ্ট হইল। দৈবাদেশ পালন করিলেন ভাবিয়া ভক্ত ইব্রাহিমের আর চিন্তা রহিল না। তিনি নিরুদ্বেগে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রভাত ক্রমে মধ্যাহ্নে—মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে পরিণত হইল। দিনমণি অস্তাচলগত হইলেন। রজনীর অন্ধকার ধরণী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। জীবগণ সুকোমল নিদ্রার কোলে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। তাপস ইব্রাহিমও যথাকালে বিশ্ব-পিতার নামোচ্চারণ করিয়া শয়ন করিলেন। গভীর রজনীতে আবার সেই স্বপ্ন!—সেই প্রত্যাদেশ!—'ইব্রাহিম, কোরবানী কর।' সাধুবর চমকিত হইয়া উঠিলেন। ভয় ও ভাবনায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল—হৃদয় নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দৈবাদেশ পালনে ত্রুটি ঘটিয়াছে—কোরবানী গৃহীত হয় নাই। তিনি সেই ত্রুটির, সেই অপরাধের ক্ষলন-মানসে প্রভাতে উঠিয়া অপার ভক্তিভরে প্রার্থনার সহিত আবার যথাশাস্ত্র শত উট কোরবানী করিলেন। দ্বিতীয়বার উট কোরবানী করিয়া পয়গম্বর ইব্রাহিম ভাবিলেন, হয়তো এবার তাঁহার প্রার্থনা দয়াময় বিধাতা শ্রবণ করিয়াছেন, কোরবানী গৃহীত হইয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য! তৃতীয় রজনীতেও নিদ্রাভিভূত হইবামাত্র আবার সেই প্রত্যাদেশ!

তখন নিদ্রিত অবস্থাতেই ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'প্রভু! হে আমার সর্বজ্ঞ বিধাতঃ! তুমি এ অধম দাসের কার্য, প্রাণ, মন ও হৃদয়ভাব সকলই দেখিতেছ, সকলই বুঝিতেছ। কিন্তু অজ্ঞান আমি, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, আমি কি করিয়া তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব।' এই করুণ প্রার্থনায় তখনই স্বপ্নাদেশ হইল, 'ইব্রাহিম! তুমি এ মরজগতে আমা অপেক্ষা যাহাকে প্রাণের অধিক ভালোবাসো, যাহার প্রফুল্ল মুখ-কমল দেখিলে তোমার স্নেহের সাগর উথলিয়া উঠে, হৃদয়ে আনন্দ স্রোত সহস্রধারে বহিয়া যায়, যাহার মধুমাখা বাক্য শুনিলে তোমার প্রাণ জুড়ায়, তুমি তোমার সেই প্রিয়তম পুত্রকে আমার উদ্দেশে কোরবানী কর।'

কি অদ্ভুত স্বপ্ন! কি অপূর্ব প্রত্যাদেশ! কেহ জীবনে এরূপ রহস্যময় ভীষণ স্বপ্ন তো কখন দেখে না। ইব্রাহিম জাগ্রত হইলেন। প্রতিবেশী জনগণ জাগিল, সকলেই আপনাপন কর্তব্যসাধনে ব্যস্ত হইল; কিন্তু সাধুবর ইব্রাহিম আজ অন্যমনস্ক। তিনি বিস্মিত—ভীত ও চমকিত। সতত স্বপ্নের কথা তাহার অন্তরে জাগিতেছে, কিন্তু কাহারও নিকটে সে-কথা ব্যক্ত করিতেছেন না। ভাবিতেছেন, 'প্রিয়তম পুত্রকে স্বহস্তে নিধন, কি নিষ্ঠুর আদেশ! কিন্তু এ প্রভুর আদেশ! বিধাতার অনুজ্ঞা! ইহা তো লঙ্ঘন করিবার নহে। এ আদেশ তো একতিল এদিক-ওদিক হইবার নহে, অতএব কিসের পুত্রস্নেহ! কিসের মায়া-মমতা! আর বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন, আজই এ আদেশ প্রতিপালন করিব। হায়, আজ যদি আমার শত পুত্র থাকিত, তবে তাহাও প্রভুর নামে উৎসর্গ করিয়া জীবন সার্থক করিতাম।' ধর্মবীর ইব্রাহিম এইরূপ চিন্তা করিয়া কর্তব্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার হৃদয় ধর্মবলে বলীয়ান হইয়া উঠিল, তাহার প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে কি যেন এক স্বর্গীয় জ্যোতির তরঙ্গ খেলিতে লাগিল।

ধর্মাত্মা ইব্রাহিম প্রতিদিন কাষ্ঠ-সংগ্রহের জন্য পুত্রের সহিত জঙ্গলে গমন করিতেন। আজও অভ্যাসমত চলিলেন। কিন্তু আজ বাড়তি সঙ্গে একখানি শাণিত ছুরি; পিতা অগ্রে, পুত্র পশ্চাৎ ধীরে ধীরে যাইতেছেন। পাপমতি শয়তান সকল সময়েই সৎকার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। সে সময় বুঝিয়া হজরত ইব্রাহিমের সমীপবর্তী হইল এবং আত্মীয়তা দেখাইয়া কত কৌশলে কুহক-জাল বিস্তারপূর্বক তাহাকে পুত্রবধ করিয়া কোরবানী করিতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য হইল না; মহামতি ইব্রাহিম 'দূর হ দুরাচার' বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

দুরাত্মা শয়তান পিতার নিকট বিফল মনোরথ হইয়া স্বীয় ভাবে পুত্রের

নিকট উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, এস্‌মাইল শিশু, তাহাকে সহজেই ভুলাইয়া কার্য-উদ্ধার করিতে পারিবে। তাই সে মহানন্দে হজরত এসমাইলকে কহিল, 'বালক! তুমি কোথায় যাইতেছ?' তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি পিতার সহিত কাষ্ঠ আনিতে যাইতেছি। আমরা রোজ রোজ কাষ্ঠ লইয়া আসি।' ইহা শুনিয়া শয়তান স্নেহকোমল বাক্যে কহিল, 'বালক! আজ এ গমন কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য নহে। তোমার পিতা তোমাকে হত্যা করিবেন বলিয়া লইয়া যাইতেছেন। শাণিত ছুরি দেখিতে পাইতেছ না কি?' শুদ্ধমতি এসমাইল ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, 'তুমি কি বলিতেছ? পিতা কি কখন পুত্রকে হত্যা করিতে পারেন? তিনি আমাকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন, স্নেহ করেন, আমাকে চক্ষের আড়াল করেন না। জগতে কোনো পিতা আপন পুত্রকে মারিয়াছে, শুনি নাই। আমি তোমার এ অন্যায় কথায় বিশ্বাস করি না।' তখন শয়তান আসিয়া বলিল, 'বালক! তোমার অন্তর নির্মল ও সরল। তাই তুমি সরল কথায় বলিতেছ। কিন্তু তুমি জান না, তোমার পিতা কি আপন ইচ্ছায় তোমাকে বধ করিতে লইয়া যাইতেছেন? খোদার হুকুম হইয়াছে, তাই তোমাকে কোরবানী করিতে লইয়া যাইতেছেন।'

এই কথা শ্রবণে সুবুদ্ধি এস্‌মাইল আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তাহার বদনে এক অপূর্ব জ্যোতির বিকাশ হইল। তিনি দেহের স্তরে স্তরে, প্রাণের ভিতরে কি যেন অনির্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'আল্লার আদেশে আমার কোরবানী! এতদপেক্ষা সুখের ও সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? তাই যদি হয়, তবে ধন্য আমার পিতা-মাতা; ধন্য হইব আমি। আমি অকাতরে হাসিতে হাসিতে আমার অকিঞ্চিৎকর জীবন সেই জীবনদাতা বিধাতার নামে উৎসর্গ করিব।' শয়তান দেখিল, এ তো সামান্য বালক নহে, ইহার নিকটেও ভণ্ডামি খাটিল না; তখন সে বেগতিক দেখিয়া ম্লানমুখে অদৃশ্য হইল।

এদিকে ইব্রাহিম যাইতে যাইতে মনে করিলেন, 'পুত্রের অজ্ঞাতসারে কৌশলে বা বলপ্রয়োগে তাহাকে কোরবানী করা সঙ্গত নহে। তাহাতে আমার কর্তব্য প্রতিপালিত হইবে বটে, কিন্তু পুত্রের পরীক্ষা তো হইবে না? পুত্র পিতৃ-অনুগত ও প্রভুভক্ত কিনা, তাহা তো জানা যাইবে না? অতএব তাহাকে গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ করিয়া বলাই উচিত। যদি সে প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া লয়, যদি সে প্রভুরই নামে জীবন দেয়, তবে পিতা-পুত্র উভয়েই ধন্য হইব—প্রভুর নিকটে পুণ্যভাগী হইব। আর যদি সে অবাধ্য হয়, তবে আমার কবল হইতে

পালাইবে কোথায় ? আমি হৃদয় দৃঢ় করিয়াছি, বুক পাষাণে বাঁধিয়াছি, আমি এই বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা তাহাকে সবলে ধরিয়া কোরবানী করিয়া দৈবাদেশ পালন করিব। আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার নহে।

ধর্মপ্রাণ ইব্রাহিম এইরূপ চিন্তা করিয়া হজরত এসমাইলকে স্নেহ-গদ্গদ স্বরে স্বপ্ন-ভাষিত বিধাতৃ-আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। সহিষ্ণুতার অবতার শুদ্ধমূর্তি এস্‌মাইল তাহা শ্রবণমাত্র হাস্যবদনে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, 'পিতঃ! ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ? যাঁহার দেহ, যাঁহার প্রাণ, তাঁহাকেই দিব, তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিব, ইহা যে পরম প্রীতিপ্রদ সংবাদ। আপনি এ শুভ কার্য শীঘ্র সম্পাদন করুন, আর ক্ষণবিলম্ব করিবেন না, প্রভুর আদেশ সত্বর পালন করাই অনুগত ভৃত্যের কার্য। হায়, আজ যদি আমার সহস্র প্রাণ থাকিত, তবে সেই জীবনদাতা বিধাতার নামে সেই সহস্র প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতাম।' ধর্মপ্রাণ এস্‌মাইল ইহা বলিয়া আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইলেন, চিন্তা বা ভয়ের লেশমাত্র তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল না।

এক্ষণে সেই মহা-পরীক্ষার সময় উপস্থিত! পিতা হইয়া স্নেহাধার পুত্রের গলে তীক্ষ্ণধার ছুরি চালাইবেন, এক্ষণে সেই লোমহর্ষণ, সেই ভীষণ শুভ-মুহূর্ত আসিল। কিন্তু পিতা-পুত্র উভয়ে নির্ভয়-চিত্ত—সৎসাহসে উদ্দীপ্ত! কোরবানী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পিতা বলিলেন, 'বৎস! প্রস্তুত হও, এই নিভৃত স্থানই দৈবাদেশ-পালনের প্রশস্তক্ষেত্র।' পুত্র অকাতরে বলিলেন, 'পিতঃ! আমি প্রস্তুত হইয়া আছি। কিন্তু আপনার সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমার নির্বাণোন্মুখ জীবনের অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে শান্তির সহিত মরিতে দিউন। আপনি প্রথমত আমার হস্তপদ বন্ধন করুন, যেন আমি ছুরিকাঘাতে ক্ষণিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া হস্তপদ সঞ্চালনে শুভকার্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া অভিশপ্ত না হই; দ্বিতীয়ত কোরবানীকালে আমার মুখ মৃত্তিকার দিকে স্থাপন করিবেন; কেননা, আমার মুখদর্শনে স্নেহবশে পাছে আপনার হস্ত অবশ হইয়া পড়ে। আর একটি কথা—শেষ কথা, পিতঃ! আমার স্নেহময়ী—আমার অভাগিনী জননীর চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম প্রদান করিবেন।'

হজরত এস্‌মাইল ইহা বলিয়া নীরব হইলেন। তাঁহার বদন প্রশান্ত, স্ফূর্তিযুক্ত হৃদয় স্থির, ধীর, গম্ভীর। মহামতি ইব্রাহিমও তদবস্থাপন্ন। তিনি বুক পাষাণে বাঁধিয়াছেন, মায়া-মমতার ডোর ছিন্ন করিয়াছেন। অচিরে সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন; পুত্রবাক্য সঙ্গত মনে করিয়া তিনি প্রথমেই এস্‌মাইলের হস্তপদ দৃঢ় রূপে বন্ধন করিলেন এবং তাঁহাকে মৃত্তিকামুখী করিয়া স্থাপন করিয়া, দণ্ডায়মান

হইলেন। এইবার বুঝি সব যায়, সব ফুরায়, কোমল দেহের শোণিত-স্রোতে ধরা ভাসিয়া যায়! ধর্মোন্মত্ত ইব্রাহিম অস্ত্র গ্রহণ করিলেন, উজ্জ্বল শাণিত অস্ত্র বিদ্যুদ্বৎ চমকিয়া উঠিল। মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষের পলক পড়িতে-না-পড়িতে, ভক্ত-বর ইব্রাহিম সেই তীক্ষ্ণ ছুরি সেই কমনীয় কোমল কণ্ঠের উপরে যেই সবলে চালাইতে উদ্যত হইলেন, অমনি দয়াময়ের আসন টলিল, তাঁহার ভক্তের পরীক্ষা হইল, ভক্তের হৃদয়বল, প্রভুভক্তি কিরূপ, তাহা পরীক্ষিত হইল। তখনই প্রত্যাদেশ হইল, 'ইব্রাহিম! নিরস্ত হও, তোমার প্রাণাধিক পুত্রের বন্ধন উন্মোচন কর। তুমি কঠোর-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, জগতে তোমার প্রেম-ভক্তির তুলনা নাই, তুমি আমার স্বপ্নাদেশ পালন করিয়া পুণ্যের এক উজ্জ্বল দ্বার উদ্ঘাটন করিলে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম। আমি স্বর্গ হইতে একটি দুম্বা প্রেরণ করিলাম, তুমি তাহাই কোরবানী করিয়া তোমার সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপন কর।'

ইব্রাহিম চমকিত হইয়া স্থিরনেত্রে, উর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইল, বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। তিনি স্থির অচঞ্চল, যেন প্রস্তর-প্রতিমা, মুখে কথা নাই, হাতের অস্ত্র হাতেই ধৃত রহিয়াছে। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি মায়াময় বিধাতার অপূর্ব মহিমায় মুগ্ধ হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে পুত্রের বন্ধন মুক্ত করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। ইত্যবসরে দেখিলেন, অদূরে একটি হৃষ্টপুষ্ট শ্বেতবর্ণের দুম্বা আসিতেছে। তিনি হৃষ্টচিত্তে তখন সেই দুম্বাটি গ্রহণ করিয়া, লীলাময় জগৎ-স্রষ্টার জয়োচ্চারণ করিতে করিতে কোরবানী-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ভক্তের নিকট ভক্তি-পরীক্ষায় ভগবানকেও হার মানিতে হইল। ধর্মপ্রাণ ইব্রাহিম আপনার পরম স্নেহের ধন পরমেশ্বরের আদেশে কোরবানী করিতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া জগতে ঈশ্বর-ভক্তির অপূর্ব উদাহরণ চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা হইতেই ইস্‌লাম জগতে কোরবানী ব্রত প্রবর্তিত হইয়াছে। কত কাল হইল, ধর্মপ্রাণ ইব্রাহিম ও তাঁহার ধার্মিক পুত্র পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু আজও লোকে তাঁহাদের এই করুণ কাহিনী স্মরণ করিয়া ও তাঁহাদের প্রদর্শিত ধর্মানুষ্ঠান করিয়া, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকেন।

[ভারতবর্ষ, আষাঢ়-অগ্রহায়ণ ১৩২১]

ইব্রাহিম খাঁ

মহরম

প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বে ইসলাম-রবি হজরত মহম্মদের প্রিয়তম দৌহিত্র মহাত্মা হোসেন অনুচরবর্গের সহিত কারবালা প্রান্তরে হৃদয়ের পবিত্র রক্তে মহরমের স্মরণীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। এ দুর্বল লেখনীতে সেই পবিত্র মহরমের পুণ্য-চিত্র অঙ্কিত করা অসম্ভব।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে, হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর, তদীয় প্রবর্তিত নির্বাচন-প্রথানুযায়ী পর্যায়ক্রমে হজরত আবুবকর, হজরত ওসমান খলিফা নির্বাচিত হইয়া, ইসলামের ধর্মরাজ্য শাসন করেন। হজরত ওসমানের মৃত্যুর পর হজরত মহম্মদের জামাতা হজরত আলী খলিফা নির্বাচিত হন, কিন্তু মারিয়ার কূটচক্রে অল্পকাল পরেই তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া, জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্মানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। ইহার কিছুদিন পরে মসজিদে প্রার্থনা-কালে এক দুর্বৃত্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়। তিনি তদানীন্তন মোস্‌লেম জগতে জ্ঞান, বীরত্ব, ধর্মানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং কর্তব্য-পরায়ণতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার অশেষ গুণবতী ভার্যা হজরত মহম্মদের দুহিতা বিবি ফাতেমার গর্ভে তাঁহার হাসান এবং হোসেন নামক দুই পুত্র জন্ম-গ্রহণ করেন। এদিকে হজরত আলীর অবসর গ্রহণের পর মারিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধি কামনায় দামেস্কে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান এবং তথায় আপনার বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া, মৃত্যুকালে পূর্ব-অনুসৃত নির্বাচন-প্রথার বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। অপরিণত বয়স্ক যুবক এজিদ বিপুল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া মদগর্বিত, স্বেচ্ছা-চারী, সুরাপায়ী, কুক্রিয়াসক্ত এবং ধর্মকর্মে উদাসীন হইয়া পড়েন। মদিনার লোক তাঁহাকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া মহাত্মা হাসানকে উক্ত গৌরবান্বিত পদে বরণ করেন এজিদ কৌশলে কালকূট সাহায্যে হাসানের বধ-সাধন করেন এবং হোসেনের বিনাশের জন্য এক বিপুল ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেন। এই হোসেন বধ-লীলা মহরম মাসে সংঘটিত হয়—ইহারই নাম 'মহরম'।

হোসেন এজিদের প্ররোচনায় অনুচরবর্গের সহিত কারবালায় উপস্থিত। কারবালা এক বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তর, তাহার একদিকে এক বিজন অরণ্য, সম্মুখে ফোরাত (ইয়ুফ্রেটিশ) নদী, পূর্ব ও দক্ষিণে প্রান্তর-সীমা গগন-সীমায় মিশিয়াছে। শিবির সংস্থাপনান্তে পথশ্রান্ত তৃষাতুর অনুচরগণ চতুর্দিকে জলের অন্বেষণে ছুটিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সকলে ফিরিয়া আসিয়া হতাশভাবে

হোসেনের নিকট নিবেদন করিল—'অদূরে কোরাত ভিন্ন আর কোথাও জল নাই, কিন্তু সে-কোরাত এজিদের বিপুল বাহিনী ঘিরিয়া রাখিয়াছে ; বিনা যুদ্ধে একবিন্দুও জল দিবে না।'

জলাভাবে হোসেন-পরিবারে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। আজ কি সানুচর হোসেন কারবালা প্রান্তরে দুর্বল রমণীর ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া পিপাসায় প্রাণ-ত্যাগ করিবেন ? না, দুর্বৃত্ত এজিদের সঙ্গে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া, সমর-শয্যা গ্রহণ করিবেন ? কে যুদ্ধ করিয়া জল আনিবে ? অনুচরগণের মধ্যে ওহাব নামে এক যুবক ছিলেন ; তাঁহার তেজস্বিনী মাতা জ্বালাময়ী ভাষায় যুদ্ধ করিয়া জল আনিতে পুত্রকে উত্তেজিত করিলেন। আরব-জীবনে প্রকৃতির প্রভাব বড় বেশি। আরব-চরিত্র জননী-জন্মভূমির চরিত্রে বড় অনুপ্রাণিত। পথিক ! তুমি আরবের প্রান্তর-বক্ষে দাঁড়াইয়াছ ? দেখ দেখি কি সুন্দর দৃশ্য ! উর্দ্ধে অনন্ত উদার নির্মল নীলিমা-সাগর, চতুর্দিকে অনন্ত উদার শ্বেত বালুকা-সাগর ; সেই সাগর বহিয়া ধীরে মুক্ত হাওয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য মধ্য-গগনে আসিল ; ঐ দেখ, তোমার পদতলের বালুকাকণা অগ্নিকণায় পরিণত হইয়াছে ; ঐ দূরে খর্জুর-তলে গিয়া একটু দাঁড়াও। এই ত আবার সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, আকাশে চাঁদ উঠিল, কৌমুদী স্নাত আরবের শুভ্র শীতল বক্ষে স্নিগ্ধ সমীরণ আনন্দে পাগল হইয়া ছুটিয়া খেলা করিতে লাগিল। এখন একবার আরব-জীবন পর্যালোচনা কর ; ঐ মুক্তবায়ুর ন্যায় স্বাধীন, ঐ অনন্ত আকাশের ন্যায় দিগন্ত-ব্যাপী বালুকা-সাগরের ন্যায় উদার—মহৎ, তেজস্বিতা এবং প্রতিহিংসায় ঐ নিদাঘ সূর্য-তাপিত বালুকারাশির ন্যায় অগ্নিময়, স্নেহ-প্রেম-ভক্তিতে ঐ চন্দ্র-করোজ্জ্বল আরব-রজনীর ন্যায় স্নিগ্ধ-মনোরম। আজ এজিদের পাপ ষড়যন্ত্রে প্রভু-পরিবারের বিপদে ওহাব-জননীর হৃদয় অগ্নিময় বালুকা-সাগরের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে তিনি ওহাবকে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে দেন নাই প্রভু-পরিবারের বিপদমোচনের মহৎব্রতে যুদ্ধযাত্রীর আবার যুবতী স্ত্রীর মুখদর্শন কেন ? ওহাব যুদ্ধে গেলেন ; যাহা হইবার তাহাই হইল—কিছুক্ষণ পরে ওহাবের রক্তাক্ত দেহ লইয়া শিক্ষিত অশ্ব শিবিরে ফিরিল। ওহাবের মাতা পুত্রের মৃতদেহ কোলে লইয়া, ঘন ঘন চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন, 'বাছা ! আজ তুই প্রভুর জন্য বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়েছিস্—আজ তোর জননীর দুধের ঋণ শোধ হয়েছে।' তৎপরে বীরাঙ্গনা পুত্রের তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তাহার শোণিত অঙ্গে মাখিতে মাখিতে যুদ্ধে ছুটিলেন এবং কতিপয় বিপক্ষ সৈন্যের সংহার করিয়া শহীদ হইলেন। আর একটি এইরূপ পরের মঙ্গল-বেদীতে

প্রাণ-প্রিয়তর পুত্রকে বলিদান করিয়াছিলেন, মহত্ত্ব ও শৌর্যের লীলা-নিকেতন রাজপুতানার এক দেবী প্রতিমা ধাত্রী আপনার শিশুপুত্রকে বক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া, শোণিত-লোলুপ শার্দূলাধিক-হিংস্র আততায়ীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া প্রভু-পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

কাসেম বীর সাজে সজ্জিত হইয়া, হোসেনের নিকট যুদ্ধের অনুমতি চাহিতে আসিয়াছেন; কাসেম—মহাত্মা হোসেনের একমাত্র পুত্র, উদীয়মান যোদ্ধা, কন্দর্প-কান্তি, পিতৃব্য এবং মাতার চক্ষুর মণি। যে অমূল্য রত্ন হাসেন মৃত্যুকালে হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আজ কোন প্রাণে হোসেন সেই শিশু-যোদ্ধাকে এজিদের সৈন্য-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আদেশ দিবেন? হোসেন পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছেন, আর নবোন্মেষিত যৌবন-গর্বিত বিক্রান্ত কাসেম অগ্নিময়ী ভাষায় হোসেনকে যুদ্ধানুমতি দানে উত্তেজিত করিতেছেন। অবশেষে, হোসেন কাসেমকে তাঁহার মাতার অনুমতি লইতে আদেশ করিলেন। কাসেম বহু অনুনয়ে মাতার অনুমতি লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় হোসেন তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া কহিলেন, 'কাসেম! মৃত্যুকালে তোমার পিতা সখিনার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে কহিয়াছিলেন—আমিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, তুমি অশ্ব হইতে অবতরণ কর; আজ যুদ্ধে যাইবার পূর্বে আমার স্বর্গীয় ভ্রাতার নিকট যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, তাহা পূর্ণ করিব।' সখিনা—হোসেনের কন্যা—অতুল রূপসী, ততোধিক গুণবতী। যথারীতি বিবাহের আয়োজন হইল। সেই জ্বলন্ত মরু-প্রান্তরে পিপাসায় আসন্ন মৃত্যুমুখে বিবাহ হইবে! কি আয়োজনই বা হইবে? তথাপি বিবাহ হইল, কিন্তু সে-দৃশ্য যে দেখিল তাহারই হৃদয় মুগ্ধ হইল। ইতিহাসে এইরূপ আর একটি বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়; সে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তস্থিত একটি দ্বীপের এক মহামনা স্বাধীনতার উপাসকের করুণ-কাহিনী। সমুদ্রতীরে বদ্ধাবস্থায় বীরের প্রাণ-সংহারের জন্য কতিপয় সৈন্য একসঙ্গে বন্দুক তুলিয়া ধরিয়াছে, এমন সময় এক রমণী আলুথালু বেশে আসিয়া মৃত্যুপথ-যাত্রীর সঙ্গে বিবাহের অনুমতি চাহিল—রমণী অপরাধীর বাগদত্তা। সেই সমুদ্রতীরে মুক্ত আকাশতলে দুইজনের বিবাহ হইল এবং পরমুহূর্তে স্বদেশভক্তের প্রাণ শত্রুর গুলিতে অনন্তে মিলাইয়া গেল। এই দুই অভাগার বাসরশয্যা ঘটে নাই—এই দুই অভাগিনীর নয়নকোলে বিবাহের আনন্দাশ্রু দেখা দেয় নাই, যদি দিয়া থাকে ত পরমুহূর্তে বৈধব্যের শোকাশ্রুর সঙ্গে মিশিয়াছে।

বিবাহান্তে কাসেম যুদ্ধে চলিলেন; কাসেমের মাতা কহিলেন, 'কাসেম, যুদ্ধে

যাইবার পূর্বে তোমার স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া যাও।' কাসেম বিদায় লইতে গেলেন। সখিনার আয়ত-নয়নে তুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কাসেম কহিলেন, 'সখিনা, আমাদের বিবাহ কেবল ইহকালের জন্য নয়, মৃত্যু এ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না। আজ যদি আমার বাসরশয্যার পূর্বে শত্রুসংগ্রামে ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হয়, তবে তুঃখ কি সখিনা? মৃত্যু ত বীরের কাছে স্বর্গের সোপান।' সখিনা নীরব। কাসেম আবার কহিলেন, 'ঐ শোন, শত্রুগণ রণবাদ্য বাজাইতেছে আরবের বীরকেশরী হজরত আলীর পৌত্র, মহাত্মা হাসেনের পুত্র, তোমার স্বামী কাসেম কি এই রণবাদ্য শুনিয়া শিবিরে স্থির থাকিতে পারে?' সখিনার অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নদ্বয় বিভাসিত হইল; বীরজায়া গ্রীবা ঈষদুন্নত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যুদ্ধানুমতি প্রদান করিলেন।

কাসেম যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া হাঁকিলেন, 'যাহার জীবনের অসাধ হইয়াছে, সে আমায় যুদ্ধ দাও।' কেহ আসিল না। তখন এজিদের প্রধান সেনাপতি ওমর, প্রথিতনামা যোদ্ধার নিকট গিয়া কহিলেন, 'বর্জক! তুমি ভিন্ন কাসেমের সম্মুখীন হইবার কেহ নাই।' বর্জক তুচ্ছতার হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'সেনাপতি মহাশয়, আপনার আদেশ অবহেলা করি এমন শক্তি নাই; কিন্তু এ-দাস জীবনব্যাপী সংগ্রামে যে-জগৎজোড়া যশ অর্জন করিয়াছে, তাহা মুহূর্তে এই বালক-সংগ্রামে বিসর্জন দিবে, এই কি আপনার বিচার? আমার বীর্যবন্ত চারিপুত্র আছে; যে-কাহাকেও আদেশ করুন, বালকের শির লইয়া আসিবে।' বর্জকের প্রথম পুত্র যুদ্ধে গেল; ওমর ও বর্জক দেখিলেন, কাসেমের অসিতলে অচিরেই সে জীবন বিসর্জন দিল। দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধে আসিল, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর তাহারও মস্তক ভূমি চুম্বন করিল। তৃতীয় পুত্র গেল, তাহারও ঐ দশা; চতুর্থ পুত্রেরও ঐ একই। এইবার ক্ষুধিত শার্দূল উঠিল; সেনাপতির আদেশ চাহিল না, আদেশের অপেক্ষাও করিল না, নীরবে কাসেমের সম্মুখীন হইয়া কহিল, 'কাসেম! আমি রুশ, শাম, ইরাণ, আরবে যুদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু তোমার মত তরবারধারী দেখি নাই। তুমি আমার চক্ষের সম্মুখে আমার চারিটি পুত্রকে হত্যা করিয়াছ—সেজন্য তুঃখ করি না; তোমার মত একজন উদীয়মান যোদ্ধা যে আমার হাতে নির্বাণ পাইবে, এই তুঃখ হইতেছে।' কাসেম কহিলেন, 'আমার এই তুঃখ হইতেছে যে, তোমার ন্যায় পুত্র-শোকাতুর ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধের অঙ্গে আমায় বজ্র-প্রহরণ নিক্ষেপ করিতে হইবে।' বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হইল—উভয়েরই অশ্বদেহ ফেন উদ্গীরণ করিল, উভয়েরই বীরবপু শোণিতাপ্লুত হইল, রক্তরঞ্জিতা বিজয়লক্ষ্মী একবার

কাসেমের দিকে, একবার বর্জকের দিকে মস্তক হেলাইতে লাগিলেন। সহসা একবার এজিদের বিস্মিত সৈন্যদল দেখিল, কাসেমের তরবারির আঘাতে বর্জকের ছিন্নশির ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল!

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া ওমর, কাসেমের বিরুদ্ধে দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কাসেম অশ্ব-বল্গা দন্তে ধারণ করিয়া যুগপৎ অসি ও বর্শার সাহায্যে সেই সৈন্যসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাসেম মানুষ, মানুষের যাহা সাধ্য, তাহা করিয়া তিনি শহীদ হইলেন। নবীবংশের উদীয়মান গৌরব রবি অকালে অস্তাচলে গমন করিল, আরবের অভিমন্যু কৈশোরে সমরশয্যা গ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ হোসেন বধ। হোসেনকে বুঝিতে হইলে তাঁহার যুদ্ধে গমনের পূর্বের একটি কথা বলিয়া লইতে হয়। হোসেনের এক দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান ছিল। কয়েকদিনের দারুণ পিপাসায় মাতৃস্তনে দুগ্ধ শুকাইয়া গিয়াছিল; বালকের ক্ষুধা নিবারণ দূরে থাকুক, পিপাসা নিবারণ হইতে ছিল না। সে পুনঃ পুনঃ মাতৃস্তন মুখে দিয়া, দুধ না পাইয়া কাঁদিতেছিল। শিশুর আকুল ক্রন্দন মাতার হৃদয়ে শেলের অধিক বিদ্ধ হইল। তিনি শিশুকে কোলে লইয়া আসিয়া, তাহার জন্য এজিদ সৈন্যের নিকট কিঞ্চিৎ জল প্রার্থনা করিতে হোসেনকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে হোসেন শিশুকে কোলে লইয়া, এজিদ সৈন্যের নিকট যাইয়া বলিলেন, 'ভাইগণ, আমরা তোমাদের শত্রু—আমাদিগকে পিপাসায় হত্যা কর; কিন্তু এই নির্দোষ দুধের শিশুর ছাতি আজ পিপাসায় ফাটিয়া যাইতেছে; একবার উপরের দিকে চাহিয়া, খোদাকে স্মরণ করিয়া, একবিন্দু জল দ্বারা এই শিশুপুত্রের প্রাণ রক্ষা কর।' অনেকক্ষণ সকলে নীরব রহিল, পরে এক পাষাণ হৃদয়-যোদ্ধা 'এই শিশুর পিপাসা নিবারণ করিতেছি' বলিয়া, এক তীর নিক্ষেপ করিল, তীর বালকের বক্ষ ভেদ করিয়া হোসেনের বাহুতে বিদ্ধ হইল—বালক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। হোসেন নীরবে শিবিরে ফিরিয়া নির্বিকার-চিত্তে শান্ত, স্থির, অকম্পিত কণ্ঠে স্ত্রীকে কহিলেন, 'এই শিশু নাও, বেহস্তের অমৃতধারে তাহার পিপাসার চির নিবৃত্তি হইয়াছে।' তাঁহার নয়নে অশ্রুকণা নাই, বদনে বিষাদ-চিহ্ন নাই, বক্ষে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস নাই, কণ্ঠে শোক-কম্পন নাই। স্বাধীনতার উপাসক শিশোদীয়-কুল-সূর্য প্রতাপসিংহ রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, মুক্ত আকাশতলে, অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্বতে, কন্দরে বাস করিয়া পঞ্চবিংশবর্ষ দুর্দ্ধর্ষ মোগলের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছিলেন; অভুক্ত শিশুপুত্রের সম্মুখ হইতে যখন বন্য পশু-ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়ায় শিশু ক্রন্দন করিয়াছিল, তখন সেই করুণ-ক্রন্দন গর্বিত প্রতাপের

কুলিশ-কঠিন দুর্জয়-প্রতিজ্ঞা শিথিল করিয়া দিয়াছিল; মুহূর্তের জন্য শোকাভিভূত হইয়া, প্রতাপ আপনার পবিত্র-ব্রত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয় বীর অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রে বীরপুত্রের রক্তরঞ্জিত দেহ দেখিয়াছিলেন, তখন তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া শত্রুসংহারে তাঁহার ভীষণ গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ প্রবোধ-বাক্যে সেই উদ্যত বজ্র দমন করেন। সাহনামার প্রধান নায়ক ভুবনবিশ্রুত বীর রোস্তম শত্রু-প্ররোচনায় বীরপুত্র সোহরাবের বধ সাধন করিয়া, ভূমিতে লুটাইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। ইউরোপ-ত্রাস বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ন পুত্র-লাভাকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হইয়া, প্রেমময়ী যোসেফাইনের পবিত্র-পরিণয়সূত্র ছিন্ন করিয়া, দ্বিতীয় দ্বার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবের বীর পুণ্যশ্লোক হোসেন বিদীর্ণ হৃদয় শিশুপুত্রকে বক্ষে লইয়া থাকিয়াও সে-বক্ষে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিতে দেন নাই।

হোসেন যুদ্ধে চলিয়াছেন। তিনিই শেষ যোদ্ধা। স্বীয় জীবন উৎসর্গের পূর্বে আর কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে দেন নাই। তিনি এতক্ষণ পাষাণে বক্ষ বাঁধিয়া মূর্তিমান ধৈর্যের ন্যায় নীরবে এই নিষ্ঠুরতার অভিনয় দেখিয়াছেন। যুদ্ধে যাইবার পূর্বে তিনি সকলকে একত্র ডাকিয়া, অনেক উপদেশ দিলেন, 'শত্রুহস্তে পড়িয়াও যথাসাধ্য আত্মসম্মান রক্ষা করিও, বিপদে পড়িয়াছ বলিয়া ভগবানে দোষারোপ করিও না, তাঁহার নামামৃতই বিপদে তোমাদের অক্ষয়-কবচ, কখনও কাঁদিও না, কাঁদিলেও যেন তাহা অন্যে না শোনে, জয়নাল আবদীনকে যুদ্ধে যাইতে দিও না, তাহার দ্বারা জগতে পূজনীয় মাতামহের পবিত্র-রক্ত রক্ষা পাইবে; এজিদের নিকট হয়ত তোমাদের অনেক অত্যাচার সহিতে হইবে, তাহা ধৈর্য সহকারে সহিও, ধার্মিকের নিকট বেহস্তের দরজা খোলা।' এজিদের সৈন্যরা হোসেনের পরাক্রম অবগত ছিল, যাহারা অনবগত ছিল, তাহারা কাসেমের যুদ্ধ দেখিয়াছিল, কেহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আসিতে সাহস করিল না। হোসেন অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'এজিদের সঙ্গে বা তাহাদের সঙ্গে তাঁহার কোন শত্রুতা নাই, এজিদ অন্যায়রূপে তাঁহার পরিবারকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন। তাহারা সকলে তাঁহার ভাই; পূজনীয় মাতামহ এই পবিত্র সম্বোধনে সকল জাতিকে এক ধর্মপতাকার তলে সমবেত করিয়াছিলেন; এখনও তাঁহাকে নিরাপদে যাইতে দিলে, তিনি সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া, সপরিজনে মদিনায় চলিয়া যান।' সমস্ত সৈন্য নীরবে রহিল—কেহ কোন উত্তর করিল না।

* কিশোর বয়স্ক জয়নাল আবদীন তখন কাতর ছিলেন। এজিদ হোসেনের পরিবারকে বন্দী করিয়া লইয়া তাঁহাকে বধ করেন নাই। তাঁহার বংশধরগণ এখন মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ অভিজাত সৈয়দ।

অগত্যা হোসেন তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। আমরা হোসেনের বীরত্ব বর্ণনা করিব না; এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাঁহার অসির সম্মুখে এজিদের বিরাট সৈন্যদল টিকিল না। হোসেন একবারে কোরাতের জলে গিয়া নামিলেন। স্ফটিক স্বচ্ছ জল, বুকে নিদারুণ পিপাসা—ইচ্ছা হইল এক নিঃশ্বাসে নদীর সমস্ত জল পান করিয়া ফেলেন। অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া, মুখের নিকট জল তুলিলেন, এমন সময় পরিজন এবং অনুচরবর্গের কথা মনে পড়িল—তীরবিদ্ধ শিশুর কথা মনে পড়িল; যেন শহীদগণের ও শিবিরস্থ রমণীগণের পিপাসা-বিবর্ণ মুখ তাঁহার অঞ্জলিস্থ স্বচ্ছ জলে বিম্বিত হইয়া উঠিল। হোসেন কি এতই কৃতঘ্ন, এতই স্বার্থপর, জীবনের লালসা কি তাঁহার এতই প্রবল যে, সকলকে ছাড়িয়া সে একা পিপাসা নিবারণ করিবে? অঞ্জলিস্থ জল নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া তীরে উঠিলেন। তখন হোসেনের মন আর ইহজগতে নাই। তিনি আকাশে নয়ন ন্যস্ত করিয়া, ধীরে ধীরে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে অঙ্গের সমস্ত যুদ্ধসাজ খুলিয়া ফেলিলেন। প্রিয় অশ্ব দুলদুল প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতে লাগিল। এজিদের সৈন্যেরা সবই দেখিতে ছিল। অবশেষে কয়েকজন সাহসী যোদ্ধা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, দূর হইতে হোসেনের শরীরে তীর নিক্ষেপ করিল—একটি—না আরও একটি তীর আসিয়া, হোসেনের পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিল; হোসেন তাহা জানিতেও পারিলেন না; তখনও তাঁহার দৃষ্টি আকাশেই বদ্ধ। সহসা হোসেনের হাত সেই রক্তে পতিত হইল; চাহিয়া দেখিলেন—সত্যরক্ত। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন অদূরে আততায়ী দণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকটি তীর আসিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিল; তিনি ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কোমর নামক এক অর্থলোভী 'তোমার মস্তকের মূল্য লক্ষ টাকা' বলিয়া লম্ফ দিয়া আসিয়া, তাঁহার বুকে চাপিয়া বসিয়া খঞ্জর বাহির করিল। হোসেন বলিলেন, 'ভাই, তুমি আমার বন্ধুর কাজ কর, শীঘ্র আমায় বধ কর; আর দেখ, আমার গলায় তুমি খঞ্জর বসাইও না, ঐ স্থানে পূজনীয় মাতামহ মুররবী মহম্মদ আমায় স্নেহ করিয়া চুম্বন করিতেন ওখানে তোমার খঞ্জর বসিবে না; তুমি আমার ঘাড়ে খঞ্জর চালাও, একেবারে মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইবে।' কোমর হোসেনের নির্দেশানুযায়ী কার্য করিয়া, ছিন্ন মস্তক লইয়া, লক্ষ টাকার পুরস্কার লোভে এজিদের নিকটে ছুটিল। মহরম পর্ব শেষ হইল।

এইরূপে ত মহরম শেষ হইল; কিন্তু কারবালার সেই ভীষণ মুহূর্তগুলি অনন্ত মুহূর্ত হইয়া রহিল। আজিও জগতের বিভিন্ন স্থানে বিরাট মুসলমান—

সমাজে কারবালার অভিনয় চিরপরিচিত; আজিও মোস্‌লেম-ললনাগণ সখিনার বিলাপ গাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন। সেদিন দেখিলাম, এক পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা সখিনার করুণ গান গাহিতেছে। আজিও ধার্মিক মুসলমানগণ মহরম-মাসে দশদিন রোজা রাখেন এবং নামাজ ও কোরাণ পাঠ প্রভৃতি ধর্মকার্যে সময়ক্ষেপ করেন—পথে-ঘাটে সহস্র সহস্র মুসলমান বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে 'হা হোসেন—হা হোসেন' বলিয়া বিলাপ করেন। যতদিন জগতে মুসলমান থাকিবে, ততদিন মহরম থাকিবে। মহরমের এ-পূজা শোক-পূজা নয়—মনুষ্যত্বের পূজা, বীর-পূজা, করুণার ভীষণ মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; হোসেন পরিজনের সহিত পিপাসায় মরুবক্ষে প্রাণবিসর্জন করিয়াছিলেন, কেবল এই জন্য মহরম স্মরণীয় নহে, ইহার পশ্চাতে এমন কিছু আছে যাহা মানুষ ভুলিতে পারে না—তাহা মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, ধর্ম। যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত চেঙ্গিজ খাঁ রক্তগঙ্গা বহাইয়াছিলেন, নাদির নরমেধ-যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন, শতাব্দী-ব্যাপী ক্রুসেতে ধর্মের নামে ইয়ুরোপ যে অভিনয় করিয়াছিলেন, আজও সভ্যতা গর্বিত ইয়ুরোপের বুকের উপর যে লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতার অভিনয় হইতেছে, সে নিষ্ঠুরতার নিকট কারবালার ঘটনা সমুদ্রে জলবিন্দু। তথাপি, এ সমুদ্রকে ভুলিতে পারা যায়, কিন্তু এ বিন্দুকে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। নিষ্ঠুরতার সংবাদমাত্রই সহৃদয় মনুষ্যত্বের দ্বারে আঘাত করে; কিন্তু সে নিষ্ঠুরতার পশ্চাতে মহত্তর কিছু না থাকিলে, তাহার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যত্বের আহ্বান বন্ধ হইয়া যায়। কারবালার ঘটনা কেবল নিষ্ঠুরতার ঘটনা নয়। নিষ্ঠুরতার সকল কোলাহল ডুবাইয়া, তথায় এক মনুষ্যত্বের ধর্মের সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল; যুগে যুগে মানব সেই সুরে সুর মিলাইবে।

[ভারতবর্ষ, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ-১৩২১-২২]

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

বাউলদের মানবধর্ম

বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতিপংক্তির বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্রভার-মুক্ত মানবধর্মই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাই সমাজের কোনো বাঁধন মানেন নাই। তবে সমাজ তাঁহাদের ছাড়িবে কেন? তখন তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোনো দায়িত্ব নাই।' বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্ত, অর্থাৎ পাগল। আর তাঁহারা বলেন, 'মনে করিও, যেন আমরা সামাজিক হিসাবে মরিয়াই গেছি।' মৃতের কাছে তো কোনো সামাজিক দাবি চলে না। তাই বাউলদের সাধনায় আর এক অঙ্গ হইল 'জ্যান্তে মরা'। সুফীদের মধ্যেও এইজন্য 'দিয়ানা' (পাগল) নাম লইয়া একদল সাধক মুসলমান শাস্ত্রের প্রচণ্ড দাবি এড়াইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যেও 'ফিলা-ফনা' বা জ্যান্তে মরা আছে। হয় নিজেদের পাগল বলিয়া নয় তো বা মৃত বলিয়া তাঁহারা সমাজের সব বাঁধন অস্বীকার করিয়াছেন।

কত কালের এই বাউলমত ও বাউলিয়া সাধনা? এই কথায় দেখি বাউলেরা বলেন, 'আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল সহজ নিত্য মানব-সত্যের উপরে। কাজেই যত কাল মানব, তত কাল এই সহজ বাউলিয়া মত। বেদ পথ তো সেদিনের। তাহাই তো কৃত্রিম। ঋষিরা সেইদিন তাহা রচনা করিয়াছেন। বাউলিয়া সহজ মতই অনাদি-কালের। বেদের আদি আছে।'

তবু বেদ হইতে প্রাচীনতর শাস্ত্রবদ্ধ ধর্ম-বাণী তো জগতে আর নাই। সেই বেদে বাউলিয়া মতের পরিচয় কেন পাওয়া যাইবে? আর বেদই কেন বা তাহার যাগ-যজ্ঞ ছাড়া অন্য কথার ভার বহন করিবে? তবু তখনকার দিনেও যদি যাগ-যজ্ঞের মতামত ছাড়া মানবধর্মের সাধনাও কিছু থাকিয়া থাকে তবে বেদের মধ্যে কচিৎ দুই-এক স্থলে সেইসব সত্যেরও আভাস মিলিতে পারে।

বেদসংহিতায় মানবধর্মের তত্ত্ব

এখানে আর্য বেদপন্থীরা আসিয়া যাগ-যজ্ঞ চালাইয়াছেন। আর্যেতর সব মতবাদীরা তাঁহাদের অহিংসা বৈরাগ্য তপশ্চর্যা প্রভৃতিও চালাইয়াছেন। বেদপন্থী বা আর্যেরা বলিলেন, স্বর্গের জন্য সকাম যাগ-যজ্ঞ ছাড়, স্বর্গ-কামনাও বিড়ম্বনা। প্রার্থনা লইয়া দেবতাদের দিকে চাহিয়ো না। যাগ-যজ্ঞ নিষ্ফল। মানবের মধ্যেই সব সত্য নিহিত, মানবকে ছাড়িয়া ধর্মের জন্য বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। বিশ্বের সার সত্য এই মানব-সত্য। অনেক পরে

বেদের শেষ ভাগে ও উপনিষদে এইসব মতবাদও ক্রমে একটু একটু করিয়া স্বীকৃত হইল।

মানবের অন্তরের যে পুরুষ তিনি ভগবান্। অন্তরের প্রেম দিয়াই তাঁহাকে পাওয়া যায়। বাহ্য শাস্ত্রের ভার বৃথা তবে বহন করা কেন? মানব-কায়ার মধ্যেই তো ব্রহ্মাণ্ড। এই ভাণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডসিদ্ধি মিলিবে। এইসব কথা তো আর্যেতর সাধনার কথা।

ধর্ম সাধনার প্রধান তিন পথ। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেম। কর্মে বাহিরেই বেশি যাইতে হয়, কাজেই কর্ম হইল বাহ্য বা গৌণ পথ; জ্ঞান তাহার চেয়ে অন্তরঙ্গ, তাই জ্ঞান হইল কর্ম হইতে আরও ভালো পথ। প্রেমই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, কাজেই প্রেমই সাধনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বা মুখ্যতম পন্থা। প্রেমের আদি-অন্ত এই মানুষে। তবেই এই প্রেম সাধনায় মানুষের তুল্য মহিমা আর কিছুতেই নাই।

জ্ঞান ও কর্মের পথে শাস্ত্র ও লোকাচার অনেকটা সহায়তা করিতে পারে। প্রেমকে পথ দেখাইবার মত শাস্ত্র বা লোকাচার কই? তবে এক প্রেমিককে দেখিয়া অন্যের প্রেম জাগিতে পারে। সেই হিসাবে প্রেমের পথে গুরুরা তাঁহাদের জীবনের আদর্শ ও সাধনা দেখাইয়া সাধনায় কতকটা সহায়তা করেন। আসলে সাধকদের অন্তরের মধ্যস্থ আদর্শ মানস-গুরুই এই প্রেম-সাধনার আসল গুরু। বাহিরের গুরু ও সাধুরাও এই পথে সহায়। তাই তাঁহারাও নমস্য।

বাউলরা বলেন, 'সাধনার ক্ষেত্র, উপাস্য ভগবান্ এবং গুরু যখন আমাদেরই অন্তরের মধ্যে, তখন নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। যে ভগবান্ আমার অন্তরে নাই তাঁহাকে দিয়া আমাদের কি হইবে?

যিনি বাহিরের জগতের ঈশ্বর তাঁহাকে তো কখনো জানিই নাই, তাঁহাকে চিনিই না। তিনি আমার প্রেমের বস্তু হইবেন কেমন করিয়া? তাঁহাকে দিয়া আমাদের কী লাভ হইবে? প্রেম দিয়া তাঁহাকে অন্তরে পাইতে হইলে অন্তরকে সদা শুদ্ধ রাখিতে হইবে। কাজেই সব মিথ্যা বিদ্বেষ দূর করিয়া মৈত্রীতে আপনাকে নির্মল কর। তখন মনের মানুষ দেখা দিবেন, তখন তাঁহাকে প্রেম করা সম্ভব হইবে।'

'বিশ্বকায়ার সঙ্গে মানবকায়ার সমতা না করিলে বিশ্বনাথ এই সংকীর্ণ কায়াতে বিহার করিবেন কেমন করিয়া? তাই আপনাকে বিশ্বের মতো অসীম ও ব্যাপ্ত করা চাই। নহিলে ব্রহ্মসংকোচ-দোষ হয়। তাই সাধনা করিতে গিয়া অসীম শূন্যে ধ্যানকে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। শূন্য সমাধিই হইল খ-সম সমাধি। তাহাই 'খ-সম', অর্থাৎ আকাশবৎ। খ-সম-তত্ত্ব যখন 'খসম' অর্থাৎ প্রিয়তম

হইয়া উঠিবে তখনই তাহার মর্ম বুঝিতে পারিবে। তাহাই সহজ সমাধি। আপন কায়ার সহায়তায় কর্মে-রূপে-যোগে-ধ্যানে-প্রেমে ক্রমে এই সীমাহীন সাধনার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। অতএব কায়াযোগই সার সাধনা।'

'গুরুর সহায়তায় এই পথে অগ্রসর হইলে সকল বাহ্য বন্ধন আপনি ঘুচিয়া যায়. সাধক স্বাধীন ও মুক্ত হয়। তখন বাহ্য-পূজা-অর্চনার প্রয়োজন আর থাকে না। মূর্তি, প্রতিমা, তীর্থ, দেবালয়, শাস্ত্র-বিধি প্রভৃতি নানা কৃত্রিমতার দাসত্ব ঘুচিয়া যায়।'

'বাইরের বেদকে বিদায় দিলেই অন্তরের বেদ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই 'অন্তর-বেদ' মানিলে বাহিরের শাস্ত্রের প্রয়োজন আর থাকে না। পূজা-রোজা নিয়ম-নেমাজ সবই ঘুচিয়া যায়। জাতি-বর্ণ প্রভৃতির ভেদবুদ্ধিরও অবসান হয়। ইহারও নাম কায়াগত সহজ বেদ। এই বেদই বিশ্বের আকাশে নানারূপে নিরন্তর মূর্তিমন্ত ও ধ্বনিত।'

বাউলেরা বলেন, 'এইসব মতই সহজ বা অনাদি মত। বেদেরও পূর্বে ইহা ছিল। খুঁজিলেই নাকি দেখা যাইবে যে, বেদেও ইহার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। দেখা যাইবে, যাগযজ্ঞওয়ালা বেদপন্থীরাও ক্রমেই এই পথে আগাইয়া আসিতেছেন।'

বৈদিক যুগ ও মধ্যযুগের সাধকদের কথা বলা হইয়াছে। যুগে যুগেই নানা সাধনার মরমী-বাণী দেখা গিয়াছে। এইবার বাংলার বাউলদের আপন কথা বলা যাইতে পারে। সকলেই জানেন, বাউলেরা শাস্ত্রাচার ও লোকাচার মানেন না, মানেন শুধু রস ও ভাবের পথ। পণ্ডিতেরা সত্য খোঁজেন গ্রন্থের মধ্যে, বাউলেরা খোঁজেন মানুষের মধ্যে। মানব-জমীন তাঁহারা পতিত রাখেন না।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে আছে (পৃ-১৭১) বাউলদের আদিগুরু মহাপ্রভু চৈতন্য। কিন্তু মহাপ্রভুর বহু পূর্বেই বাউলিয়া মত ও বাউলদের নাম পাই। বাউলমতে দেহেই সর্ববিশ্ব অবস্থিত। বিশ্বনাথই এই দেহমন্দিরের দেবতা। তাই কথা আছে—

যা আছে ভাণ্ডে
তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।

সর্বতীর্থ, সর্বসাধনা এই দেহেরই মধ্যে। এই পথের পথিক লোকসমাজে লোকধর্মকে মানিলেও অন্তরে তাহা মানেন না।

লোকমধ্যে লোকাচার
সদ্‌গুরু মধ্যে একাচার॥

ইহারা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই বেশবাস পরিধান করেন। ঝুলি লাঠি ও কিশ্‌তী (দরিয়াই নারিকেলের ভিক্ষাপাত্র) লইয়া বাউলিয়ারা বাহির হন ও সর্বকেশ রক্ষা করেন। বিগ্রহ ইহারা মানেন না বা উপবাস ব্রতাদি করেন না এবং বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রও মানেন না। ইহারা দেহতত্ত্বের গান করেন। ইহাদের 'দেহ-সাধনায় চারি চন্দ্রের ভেদ' অতি গোপনীয় ব্যাপার এবং তাহা অতি বীভৎস। তাঁহারা বলেন—

কারে বোলবো কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥

কিন্তু চার চন্দ্রভেদও কায়িক ব্যাপার। তাহা হইতেও উচ্চতর ভাব-সাধনা-ওয়ালা বাউল আছেন। বাউলদের দেহতত্ত্বের গানের কিছু নমুনাও উপাসক সম্প্রদায়ে আছে; যথা—

সহজ মানুষ আলেকলতা
আলেকে বিরাজ করে, বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা?
আলেকে প্রেমের কোলে, পেতেছে বাঁকা নলে
ত্রিবেণীর জলে উজান চলে, বহিছে সর্বদা।

ন্যাড়া সহজিয়া কর্তভজা প্রভৃতি সবাই আপনাকে বাউল বলেন। আবার বাউলদের মধ্যেও বহু ভাগ-বিভাগ আছে। তাঁহাদের সবারই আদি বীরভদ্র বা চৈতন্য মহাপ্রভু বলা চলে না। নানা আকারে বাউল মতের অনুরূপ সাধনার ধারা এদেশে যে চলিয়া আসিতেছে তাহা পূর্বেও দেখা গিয়াছে। মহাপ্রভু এবং তাঁহার সঙ্গীরা অনেক সময় বাউল বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিয়াছেন। কাজেই বুঝা যায়, বাউলদের তাঁহারাও জানিতেন।

বাউলদের বাহিরেও বাউলিয়া মতের বহু লোক এবং সাধনা আছে। তাঁহাদের বাণীতে, গানে ও রচনায় তাহা দেখা যায়, আবার বাউলদের মধ্যেও অবাউল অনেক আছে। বাউল-ভাব হইল অন্তরের সত্য। বাহিরের এই ভাগ-বিভাগে ইহার পরিচয় দেওয়া চলে না।

বাউলিয়া মতেও জীব ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা উপনিষদে বেদান্তেও পাই। বেদান্ত বলেন, জ্ঞান বিনা এই জীব বদ্ধ থাকে। জ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়।

বাউলেরা স্বর্গের সুখ চাহেন না। চাহেন মুক্তির পরমানন্দ। বাউলেরা বলেন, মুক্তি হইল প্রেমের চিন্ময় প্রকাশ। এই মুক্তি লাভ করিলে ব্রহ্মের সকল ঐশ্বর্য সাধক আপনিই পায়, যদিও কিছুই পাইবার তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

বাউলেরা মানুষই জানেন। তাঁহাদের মতে স্বর্গের অমৃতের চেয়ে পৃথিবীর এই প্রেমরস মহত্তর। তাই প্রেমামৃত প্রার্থী দেবতারাও পৃথিবীতে জন্মিয়া মানুষ হইতে চাহেন—

প্রেম আমার পরশমণি তারে ছুঁইলে রে
কাম হয় রে সেবা।
তাই গোলক চায় যে ভূলোক হতে মানুষ
হৈতে চায় যে দেবা॥

আমাদের প্রেম সীমাবদ্ধ। ভগবৎ-প্রেম বিশ্বব্যাপী। আমাদের প্রেম যখন বিশ্বব্যাপী হইবে তখনই প্রেম হইবে শুদ্ধ ও ভাগবত। তখন সাধকও ভগবানের মতই প্রেমময় হইয়া যাইবেন।

জ্ঞান হইতে প্রেম মহত্তর। তাই নারীবর্জনে লাভ কি? প্রেমহ।ন শুধু নর বা নারী সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। প্রেমে যুক্ত-মুক্ত হইলেই নর-নারী পূর্ণ-স্বরূপ হইতে পারে। তবে কামে সেই যোগ ঘটে না। কামের বলে একে অন্যকে গ্রাস করিলে আর যোগ হইল কৈ? একে অন্যকে যে বিশুদ্ধ প্রেমে পরিপূরণ করিবে তাহা কামের রাজ্যের কথা নহে। তাহার জন্য চাই নর-নারী উভয়েরই অন্তরের মুক্তভাব। এই মুক্তভাব সমাজের বাহ্য বিধিতে মেলে না। তাই বিধি-মার্গে বাউলিয়াদের আস্থা নাই। লোকাচার শাস্ত্রাচার কিছুই এই পথে কোনো সাহায্য করিতে অক্ষম।

বেদ-শাস্ত্র হইতে প্রেম মহত্তর। বেদের পরোয়া বাংলাদেশ কমই করিয়াছে। তাই বাংলার পণ্ডিতের বাণীতেও দেখি, 'সর্বজনকণ্ঠধৃতা বেদবাণী তো বেশ্যার মত'—কণ্ঠে কেন ধৃতা ক্ষণং ন কুতুকাদ্ বেশ্যাঙ্গনেব শ্রুতিঃ।

(হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব, উপক্রমণিকা)

শাস্ত্রের চেয়ে বাউলের নিঃশব্দ মরম-কথা মহত্তর। প্রাণহীন শাস্ত্র অপেক্ষা মানবীয় প্রেম অনেক বেশি সত্য।

বাউল মতে তীর্থ-ব্রত, বিগ্রহ-মন্দির, যাগযজ্ঞ-উপবাস কিছুতেই কিছু হয় না। কায়াকে ক্লেশ দিয়াও লাভ নাই। বরং কায়াকে শ্রদ্ধা করিলেই সর্ব সত্যের সাক্ষাৎ মেলে। কায়ার তত্ত্ব শ্রদ্ধাভরে সন্ধান করিতে হয়।

সমাজের নিয়মে আমরা পরস্পরের ব্যবহার করি বটে, কিন্তু কেহ কাহারও 'মর্ম' জানি না। কাজেই সমাজবিধি মানিয়া লাভ নাই; নর-নারীর বন্ধনের মধ্যে অধ্যাত্মযোগ ছাড়া আর কোনো বন্ধন থাকিলে তাহা সত্য নহে। সেই অধ্যাত্ম যোগেরই প্রকাশ হইল আমাদের প্রেমে।

অধ্যাত্ম সত্যের দীক্ষা মিলিতে পারে সদ্‌গুরুর কাছে। কিন্তু গুরু তো একজন নহেন। চিরদিনই যত জনই আমাদের চেতনা দেন ততজনই গুরু। একদিনে তো জীবনের দীক্ষা সমাপ্ত হয় না। দিনের পর দিন দীক্ষা চলে। দিনের পব দিন যেমন জীবন অগ্রসর হয়, তেমনি দীক্ষাও অগ্রসর হয়। জন্মও চিরন্তন লীলা, তাহা একদিনে সিদ্ধ হয় নাই ; অথর্ববেদ বলেন—দিনের পর দিন তোমার জন্মলীলা অগ্রসর হউক—

নবো নবো ভবসি জায়মানঃ।

বাউলেরা বলেন, জীবনের সার অমৃত হইল তাহার প্রেম ও প্রেমের ব্যাকুলতা ; প্রেম কোনো তত্ত্ববাদ নহে। তাহাবই Physical পথ হইল কায়াসাধন। চারি চন্দ্রেব ভেদ প্রভৃতি স্থূল কায়াসাধনও সেই চিন্ময় পথ নহে। আসলে আপনার মধ্যে বিশ্বের পরিচয় এবং যোগও এক চিন্ময় ব্যাপার। ইহাকে বাহ্যরূপে পরিণত করিতে গেলেই বিপদ্। চারি চন্দ্রের ভেদ হইল তন্ত্রের ও যোগশাস্ত্রের দাসত্ব। তাহাতে অনুরাগ-পথের কি আছে ?

ভক্তিকে চৈতন্যচরিতামৃত বৈধী ও রাগানুগা এই দুই ভাগ করিয়াছেন (মধ্য ২২ খ)। ভক্তির এইরূপ শাস্ত্রীয় ভাগও 'ফুলের বনে জহরীর' পরখের মত।

ভক্তিকে বুঝাইতে গিয়া ভারতীয় সাধনা যে পথ ধরিয়াছে, তাহাতে অতিশয় সাহসের পরিচয় পাই। ভগবান্‌কে পাইতে হইলে তাঁহার কোনো না কোনো ভাবরূপ তো মনের মধ্যে আসা চাই। তাঁহাকে আমরা কখনো প্রভুভাবে, কখনো পিতা-মাতাভাবে, কখনো বন্ধুভাবে বা প্রিয়ভাবে বুঝিতে পারি। ইহাকে মানবীকরণ বা Anthropomorphism বলিয়া পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইলেও বাউলেরা সাহসের সহিত বলিলেন, এইসব মানবীয় ভাবে ছাড়া তাঁহাকে আর ভাবিব কোন্ ভাবে ?

ভগবানের সৃষ্টির হয়তো অনন্ত ঐশ্বর্য ও স্বরূপ। কিন্তু আমাদের তো পাঁচটি মাত্র ইন্দ্রিয়। তাই হয় তাহাকে চক্ষু দিয়া, না হয় কর্ণ দিয়া, নয় তো ত্বক্ দিয়া অথবা রসনা দিয়া পাই। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-রূপে ছাড়া আর তো অনুভবের কোনো পথ নাই। ভগবান্‌কেও ঠিক তেমনই শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর এই পঞ্চভাবে ছাড়া পাই কেমনে ? মানবীয়ানার (Anthropomorphism-এর) ভয় না করিয়া এই কথা ভারতীয় সাধনা সাহসের সহিত বলিয়াছে। তবে সর্বভাব হইতে আরও শ্রেষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠভাব হইল মধুরভাব।

মধুর বা প্রেমের ভাবের সাধনায়ও মিলন হইতে বিরহেই চিন্ময় প্রকাশ

গভীরতর হয়। কারণ সম্মুখে থাকিলে আমরা অনেক সময় মর্ম বুঝি না। অথর্বের সেই কথা মনে পড়ে—

অংতি সংতং ন জহাতি অংতি সংতং ন পশ্যতি।

অর্থাৎ 'যতক্ষণ নিকটের রতন না হারাই, ততক্ষণ তাহাকে অনুভব করা বা 'দেখা' যায় না। একটু দূরত্ব দরকার।' তাই পূর্ণব্রহ্ম আপনার মধ্যে আপনি পূর্ণ হইলেও আপন পরিচয় পান নাই। ভগবান্‌ও আপনাকে সৃষ্টির পূর্বে আপনি পান নাই। কারণ নিজেকে নিজে পাওয়া যায় না। আপনাকে একবার 'পর' (objective) করিয়া আবার 'আপন' করিতে হয়। তাই একতত্ত্বকে বাধ্য হইয়া দুই হইতে হয়। ইহাতেই কেহ দেখেন 'অদ্বৈত', কেহ দেখেন 'দ্বৈত'। জ্ঞানে এই দ্বৈতাদ্বৈত বিরোধ ঘোচে না, ঘোচে প্রেমে। কারণ প্রেমে দুইকেই চায় এবং দুইকে এক করে। বাউলেরাও বলেন—

নিত্য-দ্বৈতে নিত্য-ঐক্য প্রেম তার নাম।

এই জন্যই প্রেমই অরূপ ভগবান্ আমাকে দিলেন রূপ এবং প্রেমেই আবার সেই অরূপ ডুবিয়া ধন্য হইবেন সর্বরূপের মধ্যে।

পরকে আপন করিতে পারে এবং ভেদের মধ্যে মধুর অভেদকে সাধন করে বলিয়াই প্রেমের মহত্ত্ব। আপন হইতে ভিন্নকে স্বীকার করিবার শক্তি একমাত্র আছে প্রেমের। যেখানে পূর্বেই অধিকার আছে সেখানে স্বীকার করার মধ্যে প্রেমের মহত্ত্ব কিছুই বুঝা যায় না। যে 'আমার' নয় তাহাকে 'আমার' বা আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেই তো প্রেমের প্রেমত্ব। এই কারণেই সমাজ যাহাকে আমার নিজস্ব (possession) করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে গ্রহণ করার মধ্যে প্রেমের গৌরব কি? যে-জন আমার নয়, সমাজ-বিধি অনুসারে যাহাকে দাবি করিতে পারি না, তাহাকে পাইতে পারিলেই প্রেম। সেইরূপ আমার অধিকারের বাহিরে অথচ আমার প্রার্থনীয়াই হইল পরকীয়া।

আসলে সমাজের সহিত বিরোধ ঘোষণার জন্য বা সমাজ-নীতি দলনের জন্য বাউলদের 'পরকীয়া' কে প্রার্থনা করা নহে। অপরকে চাওয়া হয় শুধু প্রেমের মহত্ত্ব বুঝিতে। আপনাকে আপন করার মধ্যে প্রেমের প্রেমত্ব কৈ? লোহাকে সোনা করিলেই তবে পরশমণি। পরকে আপন করিতে পারিলেই তবে প্রেম। প্রেমের মহত্ত্বের প্রমাণ করিতে হইলে চাই 'পরকীয়া'; স্বকীয়ার উপর তো অধিকার আছেই। স্বকীয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা-জয়জনিত প্রেমের সার্থকতা নাই। সেই সার্থকতা আছে পরকীয়ার ক্ষেত্রে। তাই পরকীয়া না হইলে প্রেমের কোনো অর্থই থাকে না। যেখানে সমাজবিধির সঙ্গে প্রেম-সাধনার

একটা বড় বিরোধ আছে, বাউলেরা সেখানে প্রেমের দায়ই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ ধর্ম ও সমাজবিধি না থাকিলে গার্হস্থ্য চলে না।

সাধারণত ফকির হইলেও বহু বাউল গৃহস্থ আছেন। সমাজবিধি না মানিলে গৃহস্থনীতি কেমনভাবে চলে? তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 'তোমরা তখন কর কি?' বাউল গৃহস্থ বলেন, 'বিধি বা মন্ত্রের দ্বারা আমরা অধিকার সাব্যস্ত করি না। বিধিকে সাময়িকভাবে স্বীকার করিয়া আমরা দেহের কাছে দেহ রাখিয়া সংসারযাত্রা চালাইয়া যাই। তারপর যদি কখনও ভগবানের কৃপায় তাহাকে প্রেমেতেও পাই, তবেই জীবনকে ধন্য মনে করি। সে সৌভাগ্য মন্ত্রের জোরে বা সমাজবিধিতে হয় না। ভগবানের বিশেষ কৃপা থাকিলে সে সৌভাগ্য ঘটে—হয়তো সারা জীবনে তাহা না ঘটিতে পারে। তবে মনে করিতে হইবে জীবন বৃথাই গেল।'

এইখানেই বাউলদের এক বড তত্ত্বের কথা বলা গেল। আর হইল তাহাদের প্রকৃতিভাবে, সখীভাবে আরাধনার কথা। প্রকৃতিভাবের অর্থ কি? জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম এই তিন পথে সাধনা। জ্ঞান ও কর্মে আমরা দিনের পর দিন ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে যে শিক্ষা পাই এবং স্বীকার্যকে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া স্বীকার করি (অর্থাৎ ইহা indirect)। প্রেমে হঠাৎ স্বীকার করিতে হয়। যখন অন্তরাত্মা জাগে তখন একদিনে আপনাকে উৎসর্গ (surrender) করিতে হয়। পুরুষের পথ জ্ঞানে ও কর্মে এইরূপ 'ক্রমে-ক্রমে'। নারীর পথ প্রেমের। তাহাতে 'ক্রম' নাই—একেবারে 'তৎক্ষণাৎ' (immediate)। পুরুষ বিবাহ করিয়া ক্রমে স্ত্রীকে চেনে। নারীকে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই সব ছাড়িয়া পতির নূতন সংসারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। পিতা সন্তানকে ক্রমে ভালবাসিলেও ক্ষতি নাই। ছয় মাসও তিনি প্রতীক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু মা তাঁহার সন্তানকে জন্মমাত্র স্বীকার না করিলে সৃষ্টি অচল হয়। জীবধর্মে (Biologically) নারীকে সবুর করিবার সময় বিধাতা দেন নাই। তাই নারীদের 'বে-সবুরী'র মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। তবুও নারীর এই 'বে-সবুরী'-কে না মানিয়া রহিলে চলিবে কেন? ইহা যে তাঁহার জীবধর্ম (Biological fact)।

পুরুষ যখন তাহার জ্ঞানে ও কর্মে 'ক্রমে ক্রমে' অনন্ত অসীমের দিকে অগ্রসর হয়, তখন পরদা সরাইতে সরাইতে হয়তো মানবজন্মই শেষ হইয়া যায়। তবু পরদার আর শেষই হয় না। ইহাই কার্লাইল দেখাইয়াছেন তাঁহার 'সারটার রিসার্টাসে'। অনন্ত অসীমের কত পরদা সরাইয়া তাঁহার স্বরূপ পাইবে, তাই

ভ্রান্ত সাধক তখন নারীর মত একমুহূর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। তাহা সম্ভব হয় প্রেমে। নারীর হইল সেই প্রেমের ধর্ম। তাই মহাপ্রভুর মত লোকও আপনার অপার জ্ঞানে অকৃতকার্য ও হয়রান হইয়া সখীভাবে প্রকৃতিভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। এইখানেও বাউলদের একটা বড় তত্ত্ব।

বাউলদের মধ্যে 'পুথ্যা' (পুঁথিয়া) ও তথ্যা (real) এই দুই রকম আছে। পূর্বেই 'পুঁথিয়া' বাউল তত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছি Post-Chaitanya Sahajia Cult পুস্তকে। আর 'অপুঁথিয়া' বাউলদের সবচেয়ে ভাল পরিচয় দিয়াছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-মহা-সভায় (১৮ ডিসেম্বর, ১৯২৫) অভিভাষণের এবং (১৯৩০ সালে) হিবার্ট বক্তৃতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তরুণ বয়সেই বাউলদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁহার 'বৈষ্ণবী'র কথা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই ইহা জানেন। তাঁহার জমিদারীর শিলাইদহ পরগণার কাছেই লালন ফকিরের স্থান। লালনের বিশাল একটি প্রতিভা ছিল। তাঁহারই অনুরাগী কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (ফকিরচাঁদ বাউল)। হরিনাথের অনুরাগীরা বাউল না হইলেও সবাই কৃতী—তাঁহাদের মধ্যে রাজসাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রের নাম সুপবিজ্ঞাত। যে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রতত্ত্ব অনুবাদ করিয়া আর্থার এভেলন ধন্য হইলেন সেই বিদ্যার্ণবও হরিনাথের অনুরাগী। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে গুরুস্থানীয় জলধর সেনও হরিনাথেরই আপনজন।

লালনের শিষ্যধারার একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে ডাক-হরকরা। তাঁহার নাম ছিল গগন। তাঁহার গান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার Hibbert বক্তৃতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে॥ ইত্যাদি

লালনের স্থান ছিল কুষ্টিয়ার নিকট। তিনি জন্মতঃ ছিলেন হিন্দু, পরে সিরাজ সাঁই নামে মুসলমান ফকিরের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তাঁহার সাধনাতে দুই ধর্মেরই যোগ দেখা যায়—এই ধারার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। বাউলদের গানে আছে—

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন॥

গুরু যে তোর বরণ-ডালা, গুরু যে তোর মরণ-জ্বালা
গুরু যে তোর হৃদয়-ব্যথা, (যে) ঝরায় দু'নয়ন।
কারে প্রণাম করবি মন ?

বাউলরা সবাই নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোক। কিন্তু দৃষ্টির গভীরতায় ও প্রকাশের অপূর্বতায় অতুলনীয় ইঁহাদের শক্তি। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইঁহাদের গান দেখিয়া বলেন—'এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য এত অল্প কথায় এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমার তো ইঁহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়।' তিনি নিঃসঙ্কোচে ইঁহাদের গান তাঁহার দর্শন সভার অভিভাষণে এবং হিবার্ট বক্তৃতায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং নম্রভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। নানাস্থানে নানাভাবে এইসব বাউলদের প্রতি তিনি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা সর্বদা প্রকাশ করিয়াছেন।

[বাংলার বাউল—১৯৪৯ খ্রীঃ লীলা বক্তৃতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (সংক্ষেপিত)]

অক্ষয়কুমার দত্ত

বিবিধ লোকায়ত ধর্ম

আউল

ইহাদের আর একটি নাম সহজ কর্তাভজা। প্রকৃতি সাধন-বিষয়ে অনেকানেক সম্প্রদায়ের অনেকরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু বোধ হয়, কোন সম্প্রদায় এ বিষয়ে ইহাদের ন্যায় উদার ভাব অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহাদের পরমার্থ সাধন কেবল দুই একটি নিজ প্রকৃতি সহবাসে পর্যাপ্ত হয় না, কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদিগের সাধন-সম্প্রদানে নিয়োজিত হইয়া থাকে। ফলত ইহারা কিরূপ সরল-মতাবলম্বী, তাহা কি বলিব? শুনিয়াছি, আপনার প্রকৃতিকে অন্যদীয় সংসর্গে অনুরক্ত দেখিলেও কিছুমাত্র ঈর্ষা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। প্রত্যুত ওরূপ অনুষ্ঠান আপন মতানুগত সহজ-সাধনের অঙ্গীভূত বলিয়াই অঙ্গীকার করে।

বাউল ও ন্যাড়ারা যেরূপ শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ-লোমাদি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয়, ইহারা সেরূপ করে না ; ঐ উভয়ই ক্ষৌরী হইয়া থাকে। ৪০/৪৫ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতার শ্যামবাজারে রঘুনাথ নামে একজন আউল ও তাহার কতকগুলি শিষ্য ছিল। এক্ষণে এ সম্প্রদায়ী লোক এ প্রদেশে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিথল-ভক্ত

মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিথল-ভক্ত নামে একটি সম্প্রদায় আছে। গুজরাট, কর্ণাট ও ভারতবর্ষের মধ্যখণ্ডেও এই সম্প্রদায়ী অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আর একটি নাম বৈষ্ণবীবীর। ইহাদের উপাস্য দেবতার নাম পাণ্ডুরঙ্, বিথল ও বিথোক। ইহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব ইহাদিগকে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হয় না। দক্ষিণাপথে ভীমা নদীর দক্ষিণ তীরে পান্‌চারপুরে ঐ বিথলদেবের একটি মন্দির আছে।

ভক্তবিজয়, পাণ্ডুরঙ্গমাহাত্ম্য, হরিবিজয় প্রভৃতি ইহাদিগের অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে। ইহাদিগের মত ও ধর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত ঐ সকল গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুণ্ডলিক নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া উল্লিখিত আছে। বোধ হয়, খ্রীস্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন।[১] এই সম্প্রদায়ীরা উপাস্য দেবের প্রতি উপাসকের প্রীতিকে উপাসনার প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করে এবং উপাস্য-উপাসকে পরস্পর প্রেম-বিনিময় হয়, এইরূপ

বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া ব্যবস্থা দেয় না বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকে। ঐ বৈরাগীরা আরক্ত-পীত বস্ত্র পরিধান করে এবং ঐ বর্ণের পতাকা গ্রহণপূর্বক উপাস্য দেবতার নামোচ্চারণ করিতে করিতে পর্যটন করিয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ের মতে পান্‌চারপুরই প্রধান তীর্থ। এই নিমিত্ত ইহারা কহে, যাহারা পান্‌চারপুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করে, তাহাদের হীরক পরিত্যাগ করিয়া বালুকারাশি গ্রহণ করা হয় অথবা গো-দুগ্ধ পরিহারপূর্বক দ্বারে দ্বারে গিয়া তণ্ডুলোদক ভিক্ষাকরা হয়। অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও ললাটে দুটি শ্বেতবর্ণ উর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করিয়া থাকে। এদেশীয় গোস্বামীরা শিষ্যদিগের উপরে যেরূপ প্রবলতর শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছেন এবং ধনাগমের নিমিত্ত যাদৃশ সুকঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহাদের সে প্রকার কিছুই নাই।

অন্যান্য অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ীরা বেদ ও ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রতি যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, এ সম্প্রদায়ীরা সেরূপ করে না, বরং ইহাদের গ্রন্থে ঐ উভয়ের প্রতি উপহাস-বাক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। প্রত্যুত, কোন কোন মহোৎসবের সময়ে বর্ণবিচার পরিহারপূর্বক সকলেই সকলের অন্নগ্রহণ করিয়া থাকে। অদ্যাপি জগন্নাথ ক্ষেত্রের ন্যায় পান্‌চারপুর স্থিত দেব-মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ঐরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধের এবং জৈনেরা যেমন পরেশনাথের পদাঙ্কের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, ইহারাও সেইরূপ আপনাদের স্বধর্ম-সংক্রান্ত মহাজনদিগের কল্পিত পদাঙ্কের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। বস্তুত, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের যদি কখনও সামঞ্জস্য হইয়া থাকে, তবে এই বৌদ্ধ-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল।

সাহেবধনী

এরূপ প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামের বনে একজন উদাসীন বাস করিত। ঈশ্বরাধনায় ও পরোপকার সাধনে তাহার বিশেষরূপ অনুরাগ ছিল। বাগাড়ে-নিবাসী রঘুনাথ দাস, দোগাছিয়া নিবাসী দুঃখীরাম পাল এবং হিন্দু-মতাবলম্বী অপর কয়েক ব্যক্তি ও একজন মুসলমান তাহার শিষ্য হয়। ঐ উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নামও সাহেবধনী হইয়াছে।

বোধ হয়, ইহারা কর্তাভজা সম্প্রদায়েরই শাখা-বিশেষ। যেমন ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মূলগুরু রামশরণ পাল, সেইরূপ ইহাদের মূলগুরু দুঃখীরাম পাল। ঐ পালের পুত্র চরণ পাল ঐ সম্প্রদায়ের মত বিশেষরূপে প্রচার করিয়া অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ পালেরা গোপজাতীয়।

ইহারা কোন বিগ্রহের উপাসনা করে না; বরং বিগ্রহ ও মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি বিশেষ বিদ্বেষই প্রকাশ করে। ইহাদের উপাসনার স্থানের নাম আসন। ঐ আসন একখানি চৌকি মাত্র। ঐ চৌকিতে পুষ্পমালা দেওয়া থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবারে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোক ঐ আসন-স্থানে সমাগত হইয়া পরমার্থ সাধন করে। তথায় তাহারা আপনাদের প্রস্তুত করা পরমান্ন এবং যবনাদি নানা জাতি প্রদত্ত মানসিক ভোগেব সামগ্রী আসনের নিকট নিবেদন করিয়া দিয়া নিবেদিত দ্রব্য পরস্পবের মুখে অর্পণ করে। ইহাকেই পরমার্থ সাধন কহে। অধিক রাত্রি হইলে, ঐ সকল দ্রব্য সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করে এবং আপনাদের মতানুযায়ী সঙ্গীতাদি করিয়া উপাসনা সমাপন করে।

এ সময়ে অনেক রোগী ঐ স্থানে আগমন করে এবং রোগমুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে মানসিক করিয়া যায়। সম্প্রদায়-গুরুর প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা যাহারা রোগ হইতে মুক্ত হয়, তাহারা ঐ পূর্বকৃত মানসিক আনিয়া উপস্থিত করে। ইহাতে সংবৎসরে অনেক অর্থ সংহীত হয় এবং সেই অর্থ দ্বারা চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপে ইহাদের একটি মহোৎসব হইয়া থাকে।

ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করেন না; কি হিন্দু, কি মুসলমান সকল জাতিকেই স্বসম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করে। হিন্দুদিগকে 'ক্লীং দীননাথ দীনবন্ধু' এবং মুসলমানদিগকে 'দীনদয়াল দীন-বন্ধু' এই মন্ত্র উপদেশ দিয়া থাকে। কিছুদিন হইল, চরণ পালের মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পুত্র তদীয় আসনের অধিকারী।

ন্যাড়া

প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র· এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি ঢাকা-প্রদেশে গিয়া অশেষবিধ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনপূর্বক ন্যাড়া মত সংস্থাপন করেন। কেহ কেহ কহেন নিত্যানন্দ তাঁহাকে স্বমত-বহির্ভূত দেখিয়া ত্যাজ্যপুত্র করাতে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্বক বীরভূমে গিয়া অবস্থিত হন।

বাউলদের ন্যায় এ সম্প্রদায়েরও প্রকৃতিসাধনই প্রধান ভজন এবং ঐ সাধন

বাউলদিগেরই অনুরূপ। ইহাদেরও মতানুসারে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মানব-দেহের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন; যথা-বিহিত করণ অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের সাধনা করা কর্তব্য; একাদশীর উপবাসাদি দ্বারা পরমাত্মাকে ক্লেশ দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে। ইহাদের বিগ্রহ-সেবা নাই।

এ সম্প্রদায়ের লোকেরা বহু-দেশে তাম্র অথবা লৌহের একটা কড়া রাখে, অন্যান্য বৈষ্ণবদের ন্যায় ডোর, কৌপীন ও বহির্বাস ব্যবহার করে এবং তিলক ও মালাও ধারণ করিয়া থাকে। ঐ মালার মধ্যে স্ফটিক, পলা ও শঙ্খাদির মালা সন্নিবেশিত করিতে দেখা যায়।

ইহারাও ক্ষৌরী হয় না; শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ-লোম প্রভৃতি রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া বান্ধিয়া রাখে। শরীরে যথেষ্ট তৈল মর্দন করে, গাত্রে খেল্কা, পিরাণ অথবা আল্‌খেল্লা দেয় এবং ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, মুখে হরিবোল অথবা বীর অবধূত বলিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানাবর্ণের চীর-সমূহ একত্র সংযুক্ত করিয়া আল্‌-খেল্লা প্রস্তুত করে এবং গাত্রে ঐ আল্‌খেল্লা ও মস্তকে টুপী দিয়া ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিতে যায়। ঐ আল্‌খেল্লার নাম চিন্তা-কন্থা। শুনিতে পাই, প্রকৃতি-সাধন সংক্রান্ত কোন কোন গুহ্য পদার্থে উহার কোন কোন চীর রঞ্জিত করা হয়। উহার এমন মহিমা যে, বাবাজীদের সঙ্গে কথা-বার্তা হইয়া থাকে।

দরবেশ

সনাতন গোস্বামী এই সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি দরবেশ অর্থাৎ ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া গৌড়-বাদশাহের নিকট হইতে পলায়ন করেন এবং কাশীধামে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মতাবলম্বী হন। তিনি দরবেশ-বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, কতকগুলি বৈষ্ণব তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে ঐ বেশ ধারণপূর্বক একটি পৃথক্ সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে।

ইহারা নামে দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইলেও প্রকৃতি-সহবাসে নিবৃত্ত নহে। প্রত্যেকে এক একটি প্রকৃতি রাখে এবং বাউল ও ন্যাড়াদের মতানুরূপ প্রণালী-বিশেষ অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়া থাকে। ইহারাও বিগ্রহ সেবা করে না। গাত্রে একটি আল্‌খেল্লা অর্থাৎ দীর্ঘাকার পিরাণ দেয় এবং ডোর ও কৌপীন ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের অন্যান্য বেশ ও বেশবিন্যাস বাউল ও ন্যাড়া-দিগেরই অনুরূপ। ইহাদের মতানুসারে লোকাচার অবলম্বন করা তাদৃশ

আবশ্যক নহে, অবশ্য অনেককে গলদেশে মালাধারণ করিতে এবং ঐ মালার মধ্যে স্ফটিকাদি সন্নিবেশিত করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কাষ্ঠের মালা একেবারেই পরিত্যাগ করে ; বজ্রফল, স্ফটিক, প্রবাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া মালা প্রস্তুত করে এবং সেই মালা ধারণ পূর্বক ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া থাকে। ঐ মালার নাম তস্‌বিমালা। ন্যাড়া ও বাউলেরাও কেহ কেহ ঐ তস্‌বিমালা সঙ্গে রাখে এবং মধ্যে মধ্যে দুগ্ধ ও গঙ্গা-জলে অভিষিক্ত করিয়া থাকে।

দরবেশরা সর্বদা 'দীনদরদী' নাম উচ্চারণ করে এবং একাদশীর উপবাসাদি কঠোর নিয়ম পালনে বিরত থাকে।

দরবেশ শব্দটি পারসীক, বাউল দরবেশ প্রভৃতির ধর্ম-সঙ্গীতের মধ্যে আল্লা খোদা, মহম্মদ প্রভৃতি মুসলমান দেবতা ও মহাজনদিগের নাম সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তবু সকল সম্প্রদায়ের মত প্রবর্তন-বিষয়ে মুসলমান-ধর্মের কিঞ্চিৎ কার্যকারিত্ব আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

"কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান ? মিল্‌জুলকে কর
সাঁইজীকা কাম ॥"

ছয়

সাঁই

সাঁই ও দরবেশ প্রায় একরূপ। বিশেষ এই যে, সাঁইয়েরা কখন কখন নিতান্ত লোক-বিরুদ্ধ কর্ম করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহারা মুসলমান, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলেরই অন্ন ভোজন করে এবং সুধা-পান, গোমাংস-ভক্ষণ প্রভৃতি হিন্দু-মত-বিরুদ্ধ অশেষবিধ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলে।

(ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ)

মণীন্দ্রমোহন বসু

সহজিয়া ধর্মমত

সহজ ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার অদ্ভুত ধারণা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করাই সহজ ধর্মের এক মাত্র বিশেষত্ব, এবং সহজিয়ারা কদাচারী। তান্ত্রিকগণের সম্বন্ধেও অনেকে অনুরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন; অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে যাঁহারা এই সকল ধর্ম অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরও অভাব নাই। তাঁহারা যে ভ্রষ্টাচারের লোভে এই সকল ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই রূপ ধারণা যে নিতান্তই অসঙ্গত, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ঐ সকল ধর্মের মধ্যে এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যাহা পণ্ডিত এবং সাধকগণের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহার সন্ধান করিতে হইলে ধার্মিকদের বিচার না করিয়া এই সকল ধর্মের গূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হয়।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার কতকগুলি অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে মূর্তি পূজাই হিন্দু ধর্মের প্রকৃষ্ট বিশেষত্ব, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র এবং সাধকগণ এই কথা স্বীকার করেন না। দেবতা পূজা ত দূরের কথা, উপনিষদ্ একমাত্র ব্রহ্মকেও জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এবং নিরাকার প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। উপনিষদে দেবতারা ঈশ্বর নহেন, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী মাত্র। সাংখ্যবেদান্তাদি হিন্দু দর্শনেও দেবতার পরিকল্পনা বিকাশ লাভ করে নাই। পুরাণাদিতে দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ লোকের জন্য। শ্রেষ্ঠ সাধকগণের জন্য নহে। হিন্দু সাধকেরা জানেন যে তাঁদের সাধনার উদ্দেশ্য বাহিরের কোন দেবতার পরিতুষ্টি সাধন নহে, কিন্তু নিজেকে জানা, নিজের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করা, অথবা নিজেকে দেবোপম করিয়া "সোঽহম্," 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি নীতি বাক্যগুলির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করা। 'নিজেকে জান' ইহাই হিন্দুসাধনার সারমর্ম। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ কেবলমাত্র এই সকল তত্ত্ব প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন্ নাই, নিজেকে জানার বিবিধ পন্থাও তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞান-যোগ, রাজযোগ, হঠযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া সাধকগণ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, ইহাই নানাপ্রকার যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন। সহজিয়ারাও এইরূপ আত্মোপলব্ধির প্রয়াসী। অমৃতরসাবলী গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে। (১৫৮ পৃষ্ঠা)

অন্যত্র—

সহজ জানিতে সাধ লাগে চিতে
সহজ বিষম বড়।
আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিহ দড় ॥—১৫৯ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ পিরিতি বা প্রেমমার্গ অনুসরণ করিয়া সহজিয়ারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করেন। ইহাই তাঁহাদের সাধনার অনন্য সাধারণ বিশেষত্ব।

নিজেকে জানার অর্থ—(১) নিজের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা, (২) আত্মার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করা। শরীরের মধ্যে বিবিধ নাড়ী চক্রাদির সংস্থান কল্পনা করিয়া তাত্ত্বিকগণ শরীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সহজিয়ারা তান্ত্রিক মত অনুসরণ করিয়া তদনুরূপ নাড়ী এবং চক্রের স্থানে সরোবরাদির কল্পনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহারা মূলত তান্ত্রিকগণের নিকট স্বামী, যদিও সরোবরের পরিকল্পনায় তাঁহারা কিছু নূতনত্বের সন্ধান দিয়াছেন। সহজিয়া মতে—

আপন শরীর তত্ত্ব জানে যেই জন।
সেই ত পরম যোগী শাস্ত্রের বচন ॥

অথবা—

নিজ দেহ জানিলে আপনে হবে স্থির।

ইত্যাদি

শরীরকেও এইরূপে সাধনার বিষয়ীভূত করা হইয়াছে, কিন্তু আত্মার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে তাঁহারা এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাণ উপনিষদাদিতে বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম (তিনি যে নামেই অভিহিত হন না কেন) সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ত্রিগুণাতীত, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় ইত্যাদি। এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয়, এবং নানারূপ জটিল যুক্তি-তর্কের সাহায্যে ইহা হৃদয়ঙ্গম করাও অতীব কষ্টকর। অতিশয় তীক্ষ্ণধী না হইলে এই তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করা যায় না। কিন্তু সহজিয়ারা এই জটিলতম বিষয়টি যথাসম্ভব সহজ করিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সর্বপ্রধান তত্ত্ব এই যে ঈশ্বর স্বভাবত প্রেমময়, আর পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া জীবাত্মাও উত্তরাধিকার সূত্রে এই প্রেমের প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। অতএব হৃদয়ে প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত

করাইয়া তাহার অসীম ব্যাপ্তি সমাধা করিতে পারিলেই মানবের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। রাগানুগভজন দর্পণে আছে—"সহজ ভজন এই শব্দের অর্থ এই যে জীব অনুচৈতন্য স্বরূপ আত্মা। প্রেম আত্মার সহজ ধর্ম। যে ধর্ম যে বস্তুর সহিত একত্র উৎপন্ন হয় তাহা তাহার সহজ।" এই জন্য সহজিয়ারা জ্ঞানযোগ মার্গাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রেমের পন্থাই মূলত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্মে যেখানে জ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেখানেও তাহা প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—শুষ্ক জ্ঞানমার্গ তাঁহারা অনুসরণ করেন নাই।

সহজিয়া মতে রূপ, প্রেম ও আনন্দ, সম-অনুভূতি সাপেক্ষ, এবং পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। অমৃতরত্নাবলীতে আছে যে প্রেমের গণ্ডীর মধ্যে রসের অবস্থিতি, তাহা হইতে রূপের উৎপত্তি হইয়াছে, আনন্দও তজ্জাত। অতএব সহজিয়ারা রসকে মূলত অবলম্বন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন, এ জন্য তাঁহারা রসিক বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা রূপধর্মীও বটেন, এ জন্য সহজ ধর্মের অপর নাম রূপধর্ম। প্রকৃত রসিক না হইলে রূপের সত্তা অনুভব করা যায় না, এবং আনন্দেরও উদ্ভব হয় না। অতএব যাঁহারা রসিক নহেন, তাঁহারা সহজ ধর্মে প্রবেশ করিতে পারেন না। হৃদয়ের স্থায়িভাবগুলি বাহ্য উত্তেজনায় জাগরিত হইলে মনে যে আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহাই রস। অতএব রস মনসিজ,—শরীরজ নহে। প্রকৃত রসিক হইলে স্রষ্টার পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হইতে হয়,—ভোক্তার পর্য্যায়ে নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রারম্ভকালে যে সকল সংস্কৃত নাটকাদি রচিত হইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভক্তগণকে রাধাকৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করান। পদাবলী সাহিত্যও এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে, কারণ বৈষ্ণবগণ রস পর্যায়ের উপাসক। সহজিয়ারা তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা ধার করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদালীর "রাগাত্মিকা পদে," এই গ্রন্থ মধ্যে "আসকের পদ" ও "সাধনার পদ" পর্যায়ে, মৎপ্রণীত "চৈতন্য পরবর্তী সহজিয়া ধর্ম" নামক গ্রন্থে এবং "রাগাত্মিক পদ-ব্যাখ্যায়" রস ও রসিক সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। সহজ ধর্মের প্রাণের সন্ধান করিতে হইলে এই দিক্ দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস যে সহজিয়ারা তান্ত্রিক প্রথায় সাধনা করেন। পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে এই মত সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। শরীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে সহজিয়ারা তন্ত্রের অনুকরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধন ব্যাপারে তাঁহারা সম্পূর্ণই ভিন্ন পন্থী। মৎপ্রণীত 'চৈতন্য পরবর্তী সহজিয়া ধর্ম' নামক গ্রন্থের ৬৬-৭৫ পৃষ্ঠায় সহজিয়া সাধনার প্রণালী নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহা

হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে বসপর্য্যায়ের উপাসনায় শক্তিসাধন তান্ত্রিকতার স্থান থাকিতে পারে না। উভয় সাধনার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণই বিভিন্ন প্রকৃতির।

আবার কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা হইতে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। কোন সহজিয়া গ্রন্থে এবং ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ইহার সমর্থনযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন একখানাও সহজিয়া গ্রন্থ নাই, যাহাতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যদিও শৈবতন্ত্রের ঋণ সহজিয়ারা অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চরিতামৃত সহজিয়াদের ব্রহ্মসূত্র স্বরূপ। সহজ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এমন গ্রন্থ নাই, যাহাতে চরিতামৃতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

গুরু পর্যায়ে সহজিয়ারা যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম সংশ্লিষ্ট গোস্বামীগণের পববর্তী, এবং শিষ্য স্থানীয়। ইহাদের রচিত গ্রন্থাদিই সহজিয়া-সাহিত্যের প্রাবম্ভ সূচনা করিয়াছিল। এই গ্রন্থ মধ্যে "গ্রন্থশাখা" বিভাগে সহজিয়াদের যে তিনখানা আদি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্যদেবের উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। এই সকল কারণে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে বর্তমান সহজিয়া ধর্ম চৈতন্য পরবর্তী যুগে উৎপন্ন হইয়াছিল।

সহজ সাধনার ক্রম দ্বিবিধ—(১) বাহ্যের সাধন, (২) মনের করণ। এই গ্রন্থ মধ্যেই আছে—

বাহ্যের সাধন মনের করণ
সহজ বস্তু যেঁহো শিখাইলা।—১৫৫ পৃষ্ঠা।

এবং

বাহ্যের করণ নহে মনের করণি।—১৫৭ পৃষ্ঠা

চরিতামৃতেও আছে—

বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন।—মধ্যের দ্বাবিংশ।

বাহ্য সাধনা বৈধী পর্যায়ের অন্তর্গত, ইহাতেই স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার বিধি দেওয়া হইয়াছে উদ্দেশ্য, সীমাবিশিষ্ট রূপের সাধনার দ্বারা অরূপের অনুভূতি হৃদয়ে জাগরিত করা। প্লেটো তাঁহার বেঙ্কোয়েট নামক গ্রন্থে এই সাধনার দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি সহজিয়া মতে ইহাকে নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের সাধনা বলিয়াই গণ্য করা হয়। সহজিয়ারা ইহাকে বহিরঙ্গ সাধনা বলেন। যাহারা এইরূপ সাধনায় লিপ্ত হয়, তাহারা সহজিয়া তান্ত্রিক বলিয়া খ্যাত; কারণ উপাসনার প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের

হইলেও সহজ সাধনায় তান্ত্রিকতার প্রভাব একমাত্র এই জাতীয় সাধনাতেই পরিলক্ষিত হয়, অন্যত্র নহে।

মনের করণের সাধনাই প্রকৃত সহজিয়া সাধনা। ইহাও আবার প্রধানত দ্বিবিধ—(১) জ্ঞানমার্গীয়, (২) রসপর্যায়ের। কখনও জ্ঞানরস-মিশ্রিত সাধনাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এই গ্রন্থ মধ্যে 'আগম' ও 'আনন্দ ভৈরব' গ্রন্থে জ্ঞান-মার্গীয় সাধনার, এবং অমৃত রসাবলীতে জ্ঞানমূলক রসপর্যায়ের সাধনার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। খাঁটি রসপর্যায়ের সাধনা রূপধর্মী, ইহাকেই অন্তরঙ্গ সাধনা বলে। বিবর্তবিলাসে বলা হইয়াছে—'অন্তঃস্ফুট ধর্ম এই, বহিঃস্ফুট নয়।' এই সাধনায় ভাবসাগর মন্থন করিয়া তাহা হইতে আনন্দামৃত আহরণ করিতে হয়। তাহা কেমন? যেমন প্রেমোন্মত্ত চৈতন্যদেব নিত্যানন্দে ডুবিয়া থাকিতেন। ইহাই সহজ ধর্মের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এই গ্রন্থ মধ্যে ৭৪ নং পদে ইহার কিঞ্চিৎ নমুনা মিলিবে।

সহজ ধর্মে স্বকীয়া হইতে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ। সাধারণ লোকে জানে যে স্বকীয়া অর্থে নিজের স্ত্রী, আর পরকীয়া অর্থে পরের স্ত্রী। বস্তুত লোকসমাজে এই অর্থেই শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহ্যের করণে সহজিয়ারাও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই অর্থেই শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন, কিন্তু মনের করণের ধর্ম ব্যাখ্যায় ইহারা বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা স্বকীয়া শব্দে সকাম সাধনা, এবং পরকীয়া শব্দে নিষ্কাম সাধনা নির্দেশ করেন। কাম ও প্রেম, ঈশ্বরত্ব ভজন এবং পরমাত্মার সাধনা বুঝাইতেও এই শব্দ দ্বয় ব্যবহৃত হয়। গীতার নিষ্কাম-বাদ এবং উপনিষদের ব্রহ্মবাদ অবলম্বন করিয়া ধর্মের এই দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাও সহজ ধর্মের শেষ বক্তব্য নহে। তাঁহাদের সাধনার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া সহজিয়ারা বলিয়া থাকেন যে পরকীয়া হইতে স্বকীয়া শ্রেষ্ঠ। ইহার অর্থ এই যে বাহিরের দেবতার পূজা করা অপেক্ষা আত্মোপলব্ধির জন্য সাধনা করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ধর্মের গোমুখীদ্বারে যে স্রোত কৃতবর্ত্মে মুক্তির সন্ধানে বহির্গত হইয়াছিল, অনন্ত সাগর সঙ্গমে আসিয়া তাহাই 'স্রোতের উজানে' প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানে সাধনার উদ্দেশ্য এবং মুক্তির পরিকল্পনা-আত্মকেন্দ্রীয় অনন্তানুভূতি।

সহজ ধর্মের কতকগুলি প্রধান প্রধান বিশেষত্ব এখানে সূত্ররূপে বর্ণিত হইল। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এই গ্রন্থ মধ্যেই ইহাদের সন্ধান পাইতে পারেন। বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনার জন্য মৎপ্রণীত 'চৈতন্য পরবর্তী সহজিয়া ধর্ম' এবং 'রাগাত্মিকা পদ-ব্যাখ্যা'ও পঠিত হইতে পারে। সহজ ধর্মের তত্ত্ব

সম্বন্ধীয় বিরাট্ সাহিত্য বর্তমান রহিয়াছে, তাহা একান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। অথচ এই ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা লোকমধ্যে প্রচলিত আছে। জগতে ধর্মে ধর্মে কোন বিরোধ নাই, কিন্তু দ্বন্দ্ব ধার্মিকে ধার্মিকে, অথবা যাঁহারা ধার্মিক বা ধর্মজ্ঞ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন। অতএব ধার্মিকের বিচার না করিয়া ধর্ম-বিচারেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হইতে পারে।

ভোলানাথ নাথ

নাথধর্ম

আর্যমতে ধর্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তিধর্ম। বৈদিক যুগ হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গানুসরণকারীদের চিন্তাধারা ও লক্ষ্য স্বতন্ত্র ছিল। ইহলোকে ও পরলোকে অধিকতর সুখলাভ প্রভৃতি ধর্মের লক্ষ্য এবং যেধর্মাচরণ-দ্বারা নির্বাণ ও পরাশান্তি লাভ হয় তাহাই নিবৃত্তিধর্ম। প্রবৃত্তিধর্মে মূল আচরণ দুইটি—যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ঈশ্বর, অবতার বা মহাপুরুষের আরাধনা এবং দান, পরোপকার, মৈত্রী ইত্যাদি পুণ্যকর্ম।

নিবৃত্তিধর্মের মূলমন্ত্র এবং চর্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ বলা যায় স্বর্গসুখ-ভোগ ইত্যাদি চিরস্থায়ী নহে। তাহাতে জন্মমৃত্যু পরম্পরার নিবৃত্তি হয় না। সম্যগ্ দর্শন অর্থাৎ দিব্যচক্ষু বা প্রজ্ঞালাভ করিয়া সত্যদর্শন জন্মমৃত্যু নিবারণের হেতু। সম্যগ্ যোগ বা চিত্তস্থৈর্যের দ্বারা সমাধিই প্রজ্ঞালাভের উপায়। সমগ্ দর্শন দ্বারা দুঃখের মূল অবিদ্যার নাশ হয়, সুতরাং তৃষ্ণা ও দুঃখময় সংসারের নিবৃত্তি হয়। নিবৃত্তিমার্গানুসরণকারীদের মধ্যে আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মবিষয়ে বৈরাগ্য—এই দুই ধর্ম প্রধান। নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মভেদে আত্মজ্ঞান দুই প্রকার। সাংখ্যেরা নির্গুণ পুরুষবাদী। বৈদান্তিকদের আত্মা নির্গুণ ও সগুণ দুইই।

বৌদ্ধমতে আত্মজ্ঞানের পরিবর্তে অনাত্মজ্ঞান অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধস্বরূপ আত্মা শূন্য এরূপ জ্ঞানই সম্যগ্ দর্শন, সুতরাং তৃষ্ণাশূন্যতা এবং বৈরাগ্যই নির্বাণ। জৈনগণও বলেন—বৈরাগ্যপূর্বক সমাধিবিশেষ তাঁহাদের মোক্ষ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণ বৈরাগ্য ও সমাধিকে মোক্ষের উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে নাথেরা সামবেদীয় এবং নিবৃত্তিমর্গাবলম্বী সম্প্রদায়। ধর্ম প্রাচীন হইলেই ভবিষ্যতে মত ও পথ সম্বন্ধে পার্থক্য সৃষ্ট হইবেই। এইরূপে নাথগণ দ্বাদশপন্থে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গিরি, পুরি, বন, ভারতী, সাগর, পর্বত, অরণ্য প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসীর ন্যায় নাথেদেরও সত্যনাথী, গঙ্গানাথী, আইপন্থী, বৈরাগপন্থী প্রভৃতি শ্রেণী, বর্তমান। যোশী, শৃঙ্গেরী, সারদা এবং গোবর্ধন মঠের ন্যায় নাথেদেরও পেশোয়ার, জুনাগড়, গোরক্ষপুর ও ভড়ং নাথ নামে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। নাসিক কুম্ভে উক্ত দ্বাদশপন্থী নাস সন্ন্যাসী একত্রিত হইয়া একজন যোগিরাজ নিযুক্ত করেন। মৎস্যেন্দ্র নাথ যে কদলীরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন সেই কদলী (কেরল) রাজ্যের বিঠঠল মঠে এই রাজা অধিষ্ঠিত হন। বর্তমান যোগিরাজের নাম চন্দ্রনাথ যোগী। নানাপন্থে বিভক্ত 'নাথধর্ম' সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত। কিন্তু যোগী উপাধি হইতেই বুঝিতে পারা যায়

যে, যাঁহারা যোগকে অভীষ্টলাভের পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই যোগী। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী যোগীর জন্য অভ্যাসযোগ (অর্থাৎ আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ অথবা ষড়ঙ্গ যোগের ব্যবস্থা ছিল) এবং গৃহী যোগীদের জন্য শিব অথবা লিঙ্গারাধনা ও মন্ত্রযোগের ব্যবস্থা ছিল। আমরা কূর্মপুরাণে দেখিয়াছি তৎকালে যোগী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—সাংখ্য, ভৌতিক ও অন্যাশ্রমী। সাংখ্যযোগীরা জ্ঞান হইতেই মোক্ষলাভ হয় বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু যোগই প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা জানিয়া যোগাভ্যাসদ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্যও চেষ্টা করিতেন।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ যোগী ভবার্জুন॥

তাঁহারা গীতার এই উক্তিকে মান্য করিয়া চলিতেন কিন্তু 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' —এই মত অনুসরণ না করিয়া অষ্টাঙ্গ কিংবা ষড়ঙ্গ যোগ অবলম্বন করিতেন। ভৌতিক যোগীরা পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, লইয়া চর্চা করিতেন—এককথায় তাঁহারা জড়বিজ্ঞানী ছিলেন। অন্যাশ্রমী যোগীরা ধ্যান, ধারণা সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন। যোগই ধর্মবিজ্ঞানবিধায় ভারতে যত প্রকার ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে অথবা যত ধর্ম বাহির হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির সহিত যোগীর সংস্পর্শ ঘটিয়াছে এবং প্রতি ধর্মের মূলতত্ত্ব বা সত্য—যাহা সাধনলভ্য প্রত্যক্ষীভূত হইবার যোগ্য সার্বজনীন তাহা গ্রহণ করিতে যোগীরা দ্বিধা করেন নাই। এই কারণেই পণ্ডিতগণ নাথপন্থকে, কেহ বৌদ্ধ, কেহ জৈন, কেহ মুসলমান ইত্যাদি ধারণা করিয়া ভুল করিয়াছেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যোগসাধন ত কেবল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্য, সুতরাং গৃহস্থ কখনও যোগী হইতে পারে না। এই ধারণা সঙ্গত নহে। যোগীরা গৃহীর জন্য স্বতন্ত্র যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য তাঁহারা যোগকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—লয়, মন্ত্র, হঠ এবং রাজযোগ। কে কোন্ যোগের অধিকারী তাহারও সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। শক্তির তারতম্যানুযায়ী সাধকও চারি প্রকার, যথা—মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র এবং অধিমাত্রতর। ইহাদের মধ্যে মৃদু সাধকের লক্ষণ নিম্নরূপ:

মন্দোৎসাহী মন্দরাগী পরাধীনো বিদূষকঃ।
ব্যাধিস্থো হীনসত্ত্বশ্চ গৃহবাসী মৃদুঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ মন্দোৎসাহী, মন্দরাগী, পরাধীন, বিদূষক রোগগ্রস্ত, অল্পায়ুঃ গৃহবাসীকে

মৃদু বলা হয়। দেখা যাইতেছে সাধারণ গৃহী উক্ত লক্ষণযুক্ত। ইহাদের জন্য মন্ত্রযোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা :

মৃদবে দীয়তে মন্ত্রঃ মধ্যায় লয় উচ্যতে—
অধিমাত্র হঠং দদ্যাৎ অমরৌঘ মহেশ্বরে।

অর্থাৎ মৃদু সাধককে মন্ত্র, মধ্য সাধককে লয়, অধিমাত্রকে হঠ এবং কেবলমাত্র মহেশ্বরকে রাজযোগ বা অমরৌঘ দান করিবে।

তাঁহারা বলেন যোগই কেবলমাত্র মোক্ষদান করিতে পারে, কারণ চিত্ত অতিশয় চঞ্চল। যেমন তরঙ্গবিক্ষুদ্ধ সরোবরে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ বিক্ষুদ্ধ চিত্তে সত্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। সেই জন্য যোগের সংজ্ঞাই দেওয়া হইয়াছে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। এখন এই চিত্ত প্রাণবায়ুদ্বারা নিরুদ্ধ। প্রাণবায়ুকে শান্ত ও সংযত করিতে না পারিলে চিত্ত কখনও নির্মল ও স্থির হইবে না। ছান্দোগ্যোপনিষদে চিত্ত ও প্রাণবায়ুর সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে :

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্রায়তনমলবধ্বা প্রাণমেবোপাশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি।—(ছান্দোগ্য, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৮ম খণ্ড) গোরক্ষকৃত যোগবীজে ইহারই পুনরুক্তি করা হইয়াছে :

চিত্তং প্রাণেণ সংবদ্ধং সর্বজীবেষু সংস্থিতম্।
রজ্জা যদ্বৎ পরিবদ্ধঃ পক্ষী তদ্বদিদং মনঃ॥
নানাবিধৈর্বিচার্যৈস্তু ন সাধ্যং জায়তে মনঃ।
তস্মাত্তস্য জয়োপায়ঃ প্রাণ এব হি নান্যথা॥
তর্কৈর্জল্পৈশ্‌শাস্ত্র জালৈর্যক্তিভির্যজ্ঞ ভেষজৈঃ
ন বশো জায়তে প্রাণঃ সিদ্ধোপায়ং বিনা প্রিয়ে
উপায়ং তমবিজ্ঞায় যোগমার্গ প্রবর্ততে।

অর্থাৎ সর্বজীবে, রজ্জুবদ্ধ পক্ষীর ন্যায়, চিত্ত প্রাণবায়ুদ্বারা প্রবদ্ধ। নানাবিধ বিচারদ্বারা মনকে বশীভূত করা যায় না, সুতরাং প্রাণই (প্রাণবায়ু) মনজয়ের একমাত্র উপায়। তর্ক, জল্প, শাস্ত্র, জাল, যুক্তি, যজ্ঞ, ভেষজ—ইহাদের কোনটির দ্বারাই মনকে বশে আনা যায় না; সুতরাং অন্য উপায় জানা না থাকায় যোগমার্গ প্রবর্তিত হইয়াছে।

মহাযানবৌদ্ধ শাস্ত্রেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়; যথা :

যাবান্ কশ্চিৎ বিকল্পঃ প্রভবতি মনসস্ত্যাজ্যরূপো হি ভবান্
যোঽসবানন্দরূপঃ পরমসুখকরঃ সোঽপি সংকল্প মাত্রঃ।

যো বা বৈরাগ্যভাবস্তদপি তদুভয়ং তত্তবস্যাগ্রহেতু
নির্বাণং নান্যদস্তি ক্বচিদপি বিষয়ে নির্বিকল্পচিত্তাৎ ॥

—অপ্রতিষ্ঠান প্রকাশ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, পৃষ্ঠা ১৬—১৭

যে সব বিকল্প মনকে প্রভাবিত করে তাহা পরিত্যাজ্য, যাহা আনন্দরূপী পরম সুখকর তাহাও সংকল্পমাত্র, যাহা বৈরাগ্য ভাব তাহাও—তাহারা উভয়েই ভবের অগ্রহেতু। বিষয়ে নির্বিকল্পচিত্ততা ভিন্ন নির্বাণের অন্য পথ নাই। কিন্তু বৌদ্ধদিগের নির্বাণ নৈরাত্মা জ্ঞানাভিসংগ কিন্তু নাথপন্থের আদর্শ পরমাত্মায় লীন হওয়া, যেমন ঃ

নিরালম্বে নিরাধারে নিরাকারে নিরাময়ে
যোগী যোগবিধানেন পরব্রহ্মণি লীয়তে।
যথা ঘৃতে ঘৃতং ক্ষিপ্তং ঘৃতমেব হি জায়তে
ক্ষীরে ক্ষীরং তথা যোগী তত্ত্বমেব হি জায়তে ॥

—বিবেকমার্তণ্ড

যোগবিধানদ্বারা যোগী নিরালম্ব, নিরাধার, নিরাকার, নিরাময় পরব্রহ্মে লীন হইয়া যান। ঘৃতে ঘৃত, এবং দুগ্ধে দুগ্ধ মিশাইলে তাহা যেমন যথাক্রমে ঘৃত ও দুগ্ধ হইয়া যায় সেইরূপ যোগী 'তত্ত্বম্' হইয়া যান। (উপনিষদের তত্ত্বমপি শ্বেতকেতো)। যোগিগণ বলিয়া থাকেন যোগাগ্নিদ্বারা দেহ পরিপক্ক না হইলে তাহা দ্বারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। কর্দমে নির্মিত অপক্ক কলসীর ন্যায় অপক্ক দেহ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করে না। সুতরাং দেহের প্রতি তাঁহাদের অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। দেহকে নশ্বর জ্ঞান করিয়া ইহাকে তাঁহারা অবহেলার চক্ষুতে দেখেন নাই। এমন কি তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, 'ব্রহ্মাণ্ডবর্তী যৎ কিঞ্চিত্তৎ পিণ্ডেঽপি অস্তি সর্বথা' অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে দেহে তৎসমুদয় বর্তমান।

ওমিত্যক্ষরংব্রহ্ম যদুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
শরীরং তস্য বক্ষ্যামি স্থানং কালত্রয়ং তথা ॥

—ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ

'ওঁকারই ব্রহ্ম' ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, শরীরই তাহার স্থান। তৃণপত্রস্থিত শিশিরবিন্দুতে যেমন অনন্ত আকাশ প্রতিফলিত হয় তেমনই এই ক্ষুদ্র মানবদেহে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত। **What is in macrocosm is in microcosm.** সুতরাং কায়সাধন তাঁহাদের সাধনের একটি প্রকৃষ্ট অঙ্গ। হঠযোগদ্বারা তাঁহারা এই নশ্বর মৃন্ময় দেহকে অমর ও চিন্ময় করিবার স্পর্ধা

করিয়াছেন—তাঁহারা জীবন্মুক্তি চাহিয়াছিলেন। ভৌতিক যোগিগণ পারদে এবং হঠযোগিগণ পবনে অমরত্ব অর্জনের পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্রীমাধবাচার্য 'সর্বদর্শন সংগ্রহে' রসেশ্বর সিদ্ধান্ত বর্ণনাকালে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

কর্মযোগেন দেবেশি প্রাপ্যতে পিণ্ডধারণম্।
রসশ্চ পবনশ্চেতি কর্মযোগোদ্বিধাস্মৃতঃ॥
মূর্ছিতো হরতি ব্যাধীন্ মৃতো জীবয়তি স্বয়ম্।
বদ্ধঃ খেচরতাং কুর্যাৎ রসোবায়ুশ্চ ভৈরবি॥

অর্থাৎ অয়ি দেবেশি! কর্মযোগদ্বারা পিণ্ডধারণ করা যায়। রস (পারদ) এবং বায়ু লইয়া কর্মযোগ দুই প্রকার। মূর্ছিত হইলে ব্যাধি নাশ করে এবং মৃত জীবিত হয়, এবং বদ্ধ হইলে বায়ু এবং রস খেচরতা অর্থাৎ আকাশে উড়িবার সামর্থ্য দান করে।

স্বয়ম্প্রকাশ যোগীন্দ্র তৎপ্রণীত হঠপ্রদীপিকায় লিখিয়াছেন ঃ

শ্রীআদিনাথ মৎস্যেন্দ্র সারদানন্দ ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী মীনগোরক্ষ বিরূপাক্ষ বিলেশয়াঃ॥
মন্থানভৈরবো যোগী সিদ্ধবোধশ্চ কন্থড়ী।
কোরণ্ডকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটি॥
কণেরি পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথশ্চ নিরঞ্জনঃ।
কাপালি বিন্দুনাথশ্চ কাক চণ্ডীশ্বরো ময়ঃ।
অক্ষয় প্রভুদেবশ্চ ঘোড়াচুলী চ টিন্‌টিনী॥
ভল্লটি নাগবোধশ্চ খণ্ডকাপালিকস্তথা।
ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধাঃ হঠযোগ প্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি তে॥

উক্ত মহাসিদ্ধগণ হঠযোগপ্রভাবে যমদণ্ডকে খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা শুধু স্পর্ধা করেন নাই, অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। গ্রন্থে উক্ত, ভৌতিক যোগিগণ পারদে জীবনধারাকে চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—তবে পারিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু রস ব্যবহার করিয়া তাঁহারা আকাশে উড়িবার পথ বাহির করিয়াছিলেন শাস্ত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বাগভট্টে উক্ত আছে যে লঙ্কেশ্ রাবণ একজন রসসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, তৎপুত্র মেঘনাদ আকাশযানে উঠিয়া অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিতেন। আরও প্রসিদ্ধি আছে যে রামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয়ের পর

রাবণের পুষ্পক রথে অযোধ্যা প্রত্যাগমন করেন। শ্রীকেশব ধীমান, ভরদ্বাজকৃত বৈমাণিক শাস্ত্রে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ দেখিয়াছিলেন :

১। বিমানচন্দ্রিকা—নারায়ণকৃত।

২। ব্যোমযানতন্ত্র—শৌনককৃত।

৩। যানবিন্দু—বাচস্পতিকৃত।

৪। যন্ত্রকল্প—গর্গকৃত।

৫। ক্ষেতযান প্রদীপিকা—চক্রযানীকৃত।

৬। ব্যোমযানার্কপ্রকাশ—ঢণ্টীনাথকৃত।

শেষোক্ত ঢুণ্টীনাথ 'হঠযোগ প্রদীপিকার' টিন্‌টিনি বলিয়া উল্লিখিত। অন্যস্থলে চিন্‌চিনি, টিনটিবি, ঢেণ্‌ঢন্‌ ও ঢুন্‌ঢুক নাকে পরিচিত। চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে ঢেন্‌ঢন পাদের চর্যাও রহিয়াছে। কলা নাথশিষ্য ঢুন্‌ঢুক নাথবিরচিত 'রসেন্দ্র চিন্তামণি, নামক একখানি রসশাস্ত্রও বিদ্যমান। অমরত্ব অথবা দীর্ঘায়ু লাভ করিবার জন্য অন্য উপায়ও রহিয়াছে ; যথা :

বিন্দুনাদৌ মহৌষধ্যৌ বিদ্যেতে সর্বজন্তুষু।
তাববিজ্ঞায় সর্বেঽপি ম্রিয়ন্তে গুরুবর্জিতাঃ ॥

সর্বজন্তুতে বিন্দু ও নাদ নামক দুটি মহৌষধি বর্তমান। গুরুবর্জিত তাহা না জানিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হঠযোগ-প্রদীপিকায় যে সমস্ত সিদ্ধ হঠযোগীর নাম আছে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রসশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ও দক্ষ ছিলেন। কেবল-মাত্র যোগসাধনে ও ব্রহ্মচিন্তায় নহে, যোগীরা ধাতু জারণ মারণ, নূতন ঔষধ আবিষ্কার ও চিকিৎসাবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, পদার্থবিদ্যাতেও যথেষ্ট উন্নত ছিলেন। চেষ্টা করিলে তাঁহাদের বংশধরগণও এসব বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন। ইন্দ্রজাল বিদ্যায়ও তাঁহারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাঠক গ্রন্থশেষে নাথসিদ্ধলিখিত ইন্দ্রজাল বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থের বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

নাথধর্ম সম্বন্ধে গোরক্ষপুর মহারাণী প্রতাপচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাবা গম্ভীর নাথ প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে সুচিন্তিত প্রকৃত তথ্যপূর্ণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বলিত যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলেন, 'অতিপুরাকাল হইতে পরমার্থনিষ্ঠ আর্যসমাজে মুমুক্ষুগণের মোক্ষলাভের জন্য দ্বিবিধ অন্তরঙ্গ সাধনমার্গ প্রচলিত আছে। একটির নাম যোগমার্গ, অপরটির নাম জ্ঞানমার্গ। কেহ কেহ জ্ঞানমার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিতেন, কেহ কেহ যোগের প্রাধান্য স্থাপন করিতেন। মহা-ভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন : 'সাংখ্যাঃ সাংখ্যং প্রশংসন্তি

যোগাঃ যোগং দ্বিজায়তঃ বদন্তি কারণং শ্রেষ্ঠং স্বপক্ষোদ্ভাবনায় বৈ ॥ অর্থাৎ সাংখ্যমতাবলম্বী দ্বিজগণ সাংখ্যমার্গের এবং যোগাবলম্বী দ্বিজাতিগণ যোগমার্গের প্রশংসা করেন ; নিজ নিজ পক্ষের উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্য তাঁহারা শ্রেষ্ঠযুক্তিসকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জ্ঞানমার্গে তত্ত্ব বিচারই মোক্ষের প্রকৃষ্ট সাধন। শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের অনিত্যত্ব অশুচিত্ব, দুঃখকরত্ব, মোহজনকত্ব প্রভৃতি দোষ এবং আত্মার নিত্যত্ব, অসঙ্গত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব, সুখদুঃখাদিবিহীনত্ব, কার্যকারণাতিতত্ব, সত্যজ্ঞান অনন্তস্বরূপত্ব প্রভৃতি গুণ পর্যালোচনা করিয়া বিষয় সম্পর্ক বর্জনপূর্বক চিত্তকে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্ম-স্বরূপে সমাহিত করিবার ঐকান্তিকী চেষ্টাই জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের মোক্ষলাভের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।'

'যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে কেবলমাত্র বিচারদ্বারা বৈরাগ্যেরও প্রতিষ্ঠা হয় না, পরমতত্ত্বে স্থিতিলাভও হয় না। যতদিন পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রাণের স্পন্দন চলিতে থাকে, দেহ ও ইন্দ্রিয়সকল অস্থির থাকে এবং অন্তঃকরণের বৃত্তি-সকল তরঙ্গ তুলিতে থাকে—যতদিন না ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে প্রাণকে আয়ত্ত, দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলকে স্থৈর্যসম্পন্ন ও চিত্তবৃত্তিসকলকে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায় তত-দিন বাসনা নির্মূল হয় না, চাঞ্চল্য দূর হয় না, অন্তঃকরণ আত্মস্বরূপে সমাহিত হয় না—সুতরাং মোক্ষলাভও হয় না। যোগসাধনদ্বারা দেহেন্দ্রিয় স্থির, প্রাণ-স্পন্দন নিয়মিত ও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে সেই নিস্তরঙ্গ বিষয়সঙ্গ রহিত অন্তঃ-করণে স্বয়ং প্রকাশ আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়, সুতরাং যোগই মোক্ষের প্রকৃষ্ট উপায়।'

'গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যোগশব্দটি অতি উদার অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যে কোন উপায়ে চিত্ত আত্মনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হয়, যে কোন উপায়ে সাধকের সকল জ্ঞান, সকল কর্ম ও সকল ভাব এককেন্দ্রানুগ হয়, যে কোন উপায়ে মানবজীবনে সকল প্রকার অসামঞ্জস্য ও তজ্জনিত ক্লেশ বিনিষ্ট হইয়া সাম্য ও শান্তি সংস্থাপিত হয়, যে কোন উপায়ে সাধক আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহাই যোগশব্দবাচ্য। সুতরাং গীতায় সাংখ্যকেও যোগ বলিয়াছেন, ভক্তিকেও যোগ বলিয়াছেন, কর্তব্যবুদ্ধিতে অনাসক্তভাবে সম্পাদিত সামাজিক ও লৌকিক কর্মকেও যোগ বলিয়াছেন ; আসন-প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণাদি অভ্যাস যোগকেও যোগ বলিয়াছেন।'

স্বামী বিবেকানন্দ তৎপ্রণীত 'রাজযোগ' গ্রন্থের ভূমিকায় অনুরূপ উক্তিই করিয়াছেন। তিনি বলেন :

'Man is potentially divine and the object of religion is to bring out the divinity that is within man. Do it either by knowledge, devotion or work, by one or by all of them, that is the be-all and end-all of our life—all else are but secondary details'.

ভাবার্থ : মানবাত্মা স্বরূপত ঐশীশক্তিসম্পন্ন এবং ধর্মের উদ্দেশ্য মানবাত্মার অন্তর্নিহিত ঐশীত্বকে বিকশিত করা। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম—ইহাদের যে কোন একটি দ্বারা কিংবা সমবেত সকলগুলির সাহায্যে ইহা সম্পাদন করাই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—অন্যান্য যাহা কিছু সব বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন :

'মধ্যযুগে জ্ঞানসাধনা ও যোগসাধনার বৈজয়ন্ত লইয়া দুইজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ভারতের সাধনক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—একজন বেদান্তচার্য শঙ্কর, অপরজন যোগাচার্য গোরক্ষ নাথ। তাঁহারা উভয়েই সাধারণ ধর্মার্থীদের জন্য সাকার দেবোপাসনা ও মূর্তিপূজার সমর্থক ছিলেন। উদার-চরিত্র জ্ঞানিগণ, যোগিগণ কোন দেবতার উপাসনাই অবজ্ঞা করেন নাই। তবে মোক্ষপিপাসু জ্ঞানী ও যোগিসকলকে প্রধানত শিবের উপাসক হইতে দেখা যায়। একদিকে শিব যেমন বৈরাগী, জ্ঞানী ও যোগীর আরাধ্য অন্যদিকে তিনি আবার সর্বসাধারণের উপাস্য। শিবের পূজায় পৌরোহিত্যের প্রাধান্য নাই—স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্র নিজে নিজেই শিবের পূজা করিতে পারে। শিবমন্দিরে প্রবেশ করিতে ও স্বহস্তে শিবপূজা করিতে কাহারও বাধা নাই। শিবলিঙ্গ সঙ্গে করিয়া ট্রেন ষ্টীমার প্রভৃতিতে অনেকে নানাস্থানে যাতায়াত করিয়া থাকেন—স্পর্শদোষ শিবকে স্পর্শ করে না। বৌদ্ধধর্মের পতন ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সময় অনেক বৌদ্ধ শিবোপাসনা গ্রহণপূর্বক হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছিল। সাধারণ বৌদ্ধদিগকে হিন্দুভাবাপন্ন করিতে এবং শৈবধর্মের এইরূপ বহুল প্রচার করিতে যোগিগুরু গোরক্ষনাথের অনন্যসাধারণ প্রভাব ছিল।'

নাথধর্ম সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে মুদ্রিত পুথিগুলিতে বিশেষত 'যোগবীজে' দেখিতে পাইবেন। এইবার লিঙ্গোপাসনা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

লিঙ্গোপাসনা

অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও প্রাচ্যে তাঁহাদের শিষ্যগণ মনে করিয়া থাকেন যে, লিঙ্গোপাসনা প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তির প্রতীকরূপে আদিম

মানবের জননেন্দ্রিয় পূজার স্মারক অবশেষ। অবশ্য প্রাচ্যবিদ্যায় পরম পণ্ডিত উইন্‌টারনিজ তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, 'ক্ষুদ্র একটি প্রস্তরস্তম্ভের ন্যায় লিঙ্গমূর্তি শিবপূজার জন্যই ব্যবহৃত হয়, এই মূর্তি শিবের সৃজনশক্তির প্রতীকরূপেই ধারণা করা হইয়াছে—ইহাতে কুৎসিত জননেন্দ্রিয় পূজার চিহ্নমাত্র নাই' (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৫৬৯)। কিন্তু উক্ত বর্ণনাও সন্তোষজনক নহে। ভারতের সর্বত্র হিন্দুসম্প্রদায়ে লিঙ্গরূপেই শিবপূজা প্রচলিত—পূর্ণমানবাকৃতিতে শিবপূজা ভারতে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, বিষয়বৈরাগ্য ধ্যানধারণা ও সমাধি যাঁহাদের জীবনের আদর্শ সেই সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও যোগিগণ আত্মোন্নতির জন্য ভক্তি-ভরে পরমাত্মজ্ঞান করিয়া এই লিঙ্গমূর্তিই সম্মুখে রাখিয়া বহিরঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন। ভস্ম যাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ, কৌপীনমাত্র যাঁহাদের পরিধান, গুহা অরণ্য ও শ্মশানবাসী সেই নিবৃত্তিমার্গের ত্যাগীসম্প্রদায় নির্জনে ও শ্মশানে বসিয়া কামোদ্দীপক জননেন্দ্রিয়ের উপাসনায় রত থাকিবেন ইহা বিকৃতমস্তিষ্ক শৈবধর্মের নিকৃষ্টতম নিন্দুকছাড়া আর কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব? বৈষ্ণবগণও বিষ্ণুর প্রতাকরূপে একটি প্রস্তরখণ্ডের পূজা করিয়া থাকেন—ইহা অবশ্য দণ্ডাকৃতি নহে। একটু অন্য ধরনের।

ইহাকেও বিষ্ণুলিঙ্গ বলে কিন্তু ইহাকে কেহ লিঙ্গ বলিয়া কল্পনা করেন না। হিন্দুপুরাণে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও শিব সংহারকর্তারূপে কল্পিত। মৃত্যু প্রলয়ের স্থান শ্মশানেই শিবের অধিষ্ঠান—ভারতের বহু শ্মশানে শিবলিঙ্গই প্রতিষ্ঠিত। লিঙ্গ যদি জননেন্দ্রিয়ের যুক্ত প্রতীকই হইবে তাহা হইলে শব-সৎকারের স্থানে লিঙ্গের দর্শন মিলিত না। শ্মশান বৈরাগ্যের স্থান, ঐ স্থানে কামের প্রতীক-স্থাপন রুচিবিগর্হিত। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও লিঙ্গশব্দের মুখ্য অর্থ শিশ্ন বা উপস্থ নহে। লিঙ্গ অর্থে চিহ্ন, প্রতীক বা কোন বস্তুর একটি বিশেষ গুণ যাহার দ্বারা বস্তুটিকে অন্যবস্তু হইতে স্বতন্ত্র করিয়া চেনা যায় ইহাই বুঝায়। ধূম অগ্নির লিঙ্গ, গৈরিক বসন সন্ন্যাসীর লিঙ্গ, জীবের কোন বিশিষ্ট অঙ্গ যাহার দ্বারা সেটি পুরুষ কি স্ত্রী জানা যায় সেটি তাহার লিঙ্গ। কোনও কার্য, কারণের লিঙ্গ, ওষ্ঠ কিংবা চক্ষুর কোন বিশিষ্ট ভাব, হস্ত কিংবা অন্য কোন অঙ্গের দ্বারা ইঙ্গিত, মনের বিশিষ্ট অবস্থাকে লিঙ্গ বলা যাইতে পারে। দৃশ্য কোন বস্তু কোন অদৃশ্য সত্য বা মানসিক ধারণার লিঙ্গ হইতে পারে—যেমন শ্বেতবর্ণ সত্ত্বগুণের লিঙ্গ, রক্তবর্ণ রজোগুণের লিঙ্গ এইরূপ ব্যাপক অর্থেই সংস্কৃতে লিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

নিবৃত্তিমার্গের সাধকেরা তাঁহাদের সাধনাদর্শরূপে পুরাকাল হইতে জ্যোতি-শিখা ও জ্যোতিস্তম্ভকেই অন্তরে ধারণা করিয়া আসিয়াছেন। আলোক প্রকৃত জ্ঞানের প্রতীক ইহাই অজ্ঞানান্ধকারকে নাশ করে। শিবই জ্ঞানীশ্বর, যোগীশ্বর, ত্যাগীশ্বর, আত্মারাম, স্বয়ংজ্যোতি, সুতরাং শৈবগণ আলোকশিখা ও জ্যোতিস্তম্ভকেই সাধারণ প্রতীকরূপে বা লিঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রতীককে ধর্মশাস্ত্রে জ্যোতির্লিঙ্গ বলা হইয়াছে। শৈবযোগিগণ যোগসাধন ও ধ্যানের সময় সম্মুখে আলোক বা দীপশিখা জ্বালিয়া রাখেন। সর্বস্থানে লিঙ্গের আকৃতি একই প্রকার—অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় শীর্ষদেশ সূক্ষ্ম। দার্শনিক চিন্তার অগ্রগতির সহিত শিব যখন বিশ্বাত্মারূপে প্রতিভাত হইলেন তখন ঐ আলোক-স্তম্ভই শিবের প্রতীক হইল, এবং যে-ভিত্তির উপর আলোক জ্বলে তাহাই বিশ্বের প্রতীক হইল। উপনিষদের ব্রহ্ম ও শিবকে যখন অভিন্নরূপে ধারণা করা সম্ভব হইল এবং সাংখ্যের প্রকৃতিকে ব্রহ্মের শক্তিরূপে ব্রহ্মের সহিত চিরসংযুক্ত করা হইল—তখন রূপকরূপে শিবশক্তি—পুরুষ প্রকৃতিকে শিব ও উমার মূর্তিতে সাজাইয়া বিশ্বের পিতৃমাতৃরূপে তাঁহাদিগকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা হইল।

এইরূপ জ্যোতিস্তম্ভ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা ও জ্যোতির ছায়াযুক্ত তলদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন যোনিপীঠরূপে কল্পিত হইল। এই যোনিপীঠ বা শক্তিই আত্মার দিব্য জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার ছায়ায় বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মায়ার খেলা খেলিতেছেন। সন্ন্যাসী ও যোগিগণ এই প্রতীকটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, যেহেতু তাঁহাদের মতে ইহাই পরমসত্তার অসাম্প্রদায়িক সার্ব-জনীন প্রতীক। ইহারা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত কোন জীবের প্রতিকৃতি নহে—পুরুষও নয় স্ত্রীও নয়, ইহা হিন্দুর সাকার ও নিরাকার ধারণার মধ্যবর্তী রূপ—এইজন্যই সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু পিতা-মাতা-কন্যা-পুত্র মিলিয়া এই আকারেই শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুলিঙ্গ শালগ্রাম শিলারও অর্থ এইরূপে করা যাইতে পারে।

কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে মৎস্যেন্দ্র নাথ লিখিয়াছেন :

তস্যোর্ধ্বে ব্যাপকং তত্র নিত্যোদিতমখণ্ডম্।
স্বাতন্ত্র্যমজমচলং সর্বব্যাপী নিরঞ্জনম্॥

তস্যেচ্ছয়া ভবেৎ সৃষ্টির্লয়ং তত্রৈবগচ্ছতি।
তেন লিংগং তু বিখ্যাতং যত্রলীনং চরাচরম্॥

'অমরৌঘপ্রবোধে' গোরক্ষদেবও বলেন :

লীনং যত্র চরাচরং লয়বশাত্তল্লিঙ্গবিমুচ্যতে।

এই লিঙ্গঠাকুরটিই সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি, নাথের শিবশক্তি। গীতার ১৪।৩, ৪

মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

উক্ত শ্লোকের প্রতীক চিহ্ন আর কি হইতে পারে? ইনিই সুসংস্কৃত হইয়া কালে হরগৌরী, লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণরাধা প্রভৃতি হইয়াছেন। সাম্প্রদায়িক হিংসাই লিঙ্গের কুৎসিত ব্যাখ্যার কারণ।

ভারতের নাথ মার্গের ধর্মীয় পরিচয় ১৩৮০, চৈত্র।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

শক্তিসাধনা

পার্বতী উমা, সতী এবং দুর্গা চণ্ডিকার ধারা মিলিয়া পুরাণ-তন্ত্রাদিতে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই, তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে আর একটি ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীর ধারা। এই কালী বা কালিকাই বাংলাদেশের শক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া উঠিয়া দেবীর অন্য সব রূপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন। বাংলাদেশের শক্তি-সাধনা এবং শাক্ত-সাহিত্যকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে সেইজন্য এই কালী বা কালিকার ধারাটির প্রাচীন ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কি করিয়া এই দেবী মহাদেবীর সঙ্গে মিলিয়া গেলেন তাহার প্রমাণ বহু পুরাণের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সব দেবীর ইতিহাসই বেদের মধ্যে আবিষ্কার করিবার আমাদের প্রবণতা। বেদের রাত্রি সূক্তকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে যে এক রাত্রিদেবীর ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে, কাহারও কাহারও বিশ্বাস সেই রাত্রিদেবীই পরবর্তীকালে কালিকা রূপ ধারণ করিয়াছেন। আমাদের এই কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী দেবীর প্রসঙ্গে বৈদিক কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী নির্ঋতি দেবীর কথাও কেহ-কেহ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। 'শত পথ ব্রাহ্মণ' এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' নির্ঋতি দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' দেবীকে কৃষ্ণা (কৃষ্ণং হি তত্তম আসীদথ কৃষ্ণা বৈনির্ঋতিঃ, ৭।২।৭) এবং ঘোরা (ঘোরা বৈ নির্ঋতিঃ ৭।২।১১) বলা হইয়াছে এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (৪।১৭) নির্ঋতি দেবীকে পাশহস্তা বলা হইয়াছে এবং নির্ঋতি দেবীর হস্তস্থিত এই পাশ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এই নির্ঋতি দেবীর পরবর্তীকালে আর কোনও ইতিহাস দেখি না। সুতরাং বর্ণনাঃ সামান্য একটু কোথাও মিল দেখিয়াই কোনও সিদ্ধান্ত করা উচিত মনে হয় না। পূর্বে বলিয়াছি, অন্ধকাররূপিণী রাত্রিদেবীকেও কালীর সহিত যুক্ত করা হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে সঙ্কলিত 'সদুক্তি কর্ণামৃত'—নামক সংস্কৃত সংগ্রহ গ্রন্থে কবি ভাসোকের নামে ধৃত একটি শ্লোকে দেখি কালীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 'ক্ষুৎক্ষামহ কাণ্ডচণ্ডী চিরমবতুতরাং ভৈরবী কালরাত্রিঃ॥'

বৈদিক সাহিত্যে কালী এই নামটি আমরা প্রথম দেখিতে পাই 'মুণ্ডক উপনিষদে'; সেখানে কালী যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি জিহ্বা 'মহাভারতেও' যজ্ঞাগ্নির এই সপ্তজিহ্বার উল্লেখ দেখিতে পাই (আদি, ২৩২।৭)। দার্শনিক

মতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই সাতটিকে অগ্নির সপ্তজিহ্বা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রচলিত মহাভারতে একাধিক স্থলে 'কালী'র উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পৌরাণিক কালীদেবীর সহিত মহাভারতের এই সকল স্থলে বর্ণিত কালীদেবীর বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। সৌপ্তিক পর্বে দেখিতে পাই, দ্রোণের মৃত্যুর পরে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন রাত্রিতে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত বীরগণকে হত্যা করিতেছিলেন তখন সেই হন্যমান বীরগণ ভয়ঙ্করী কালী দেবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই কালীদেবী রক্তাস্যনয়না, রক্ত-মাল্যানুলেপনা, পাশহস্তা, এবং ভয়ঙ্করী। কালীর ভীষণ স্বরূপ সংহারের প্রতীক ; কালরাত্রি রূপিণী এই দেবী বিগ্রহবতী সংহার।

মহাভারতে কালীদেবীর এই উল্লেখ পরবর্তীকালের যোজনা হইতে পারে ; পরবর্তীকালের যোজনা না হইলেও এইসব বর্ণনায় কালীর কোনও দেবীত্বের আভাস নাই ; কালী এখানে অত্যন্ত ভীত মনের একটা ভয়ঙ্করী ছায়ামূর্তি দর্শনের ন্যায়। কবি কালিদাসের সময়েও কালী কোনও প্রধানা দেবী বলিয়া গৃহীতা হন নাই। 'কুমারসম্ভবে' উমার সহিত মহাদেবের বিবাহ প্রসঙ্গে বরযাত্রার বর্ণনায় দেখিতে পাই, কৈলাস পর্বতের মাতৃকাগণ বিবাহযাত্রায় মহাদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন ; 'রঘুবংশের' মধ্যে একটি উপমাতেও এই কালী বা কালিকাদেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই। রাম-লক্ষ্মণের জ্যা-নিঃস্বন শুনিয়া ভয়ঙ্করী তাড়কা রাক্ষসী যখন আত্মপ্রকাশ করিল তখন সেই ঘন কৃষ্ণরাত্রির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা তাড়কাকে মনে হইতেছিল চঞ্চল কপালকুণ্ডলা বলাকাযুক্তা কালিকার মতো।

কালিদাসের পরে সংস্কৃত-সাহিত্যে স্থানে-স্থানে এক রক্তলোলুপা ভয়ঙ্করী দেবীর উল্লেখ পাই। যে-নামেই দেবীকে পাই না কেন, মনে হয় এই-সকল দেবী তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই। আমরা 'মিল হরিবংশে' মদ্যমাংসপ্রিয়া দেবীকে শবর, বর্বর, পুলিন্দগণ কর্তৃক পূজিত হইবার কথা পাইয়াছি। সুবন্ধুর (ষষ্ঠ শতক বা সপ্তম শতকের প্রথম) 'বাসবদত্তা'য় আমরা কুসুমপুরের গঙ্গাতীরে ভগবতী বা কাত্যায়নীর বাসের কথা জানিতে পারি। এই দেবী 'শুম্ভ-নিশুম্ভ-মহাবন-দাবজ্বালা,' 'মহিষমহাসুর-গিরি-বজ্রসারধারা' এবং 'প্রণয়প্রণতগঙ্গাধরজটাজুট-স্খলিত-জাহ্নবী-জলধারাশ্বেত-পাদপদ্ম' বটেন, কিন্তু 'বেতালাভিধানা'। এই 'বেতালা' অভিধানটিই এখানে তালভঙ্গ করে। বাণভট্ট রচিত (সপ্তম শতক ?) 'কাদম্বরী'তে আমরা শবরগণ

কর্তৃক বনমধ্যে যেভাবে রুধিরের প্লাবন দিয়া 'চণ্ডী'র পূজার বর্ণনা পাই, বাকৃপতিরাজ (অষ্টম শতক) তাঁহার 'গউড়বহো' প্রাকৃত কাব্যে শবরপূজিতা 'পর্ণ' বা পত্রপরিহিতা 'পর্ণশবরী'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতির রচিত (সম্ভবত সপ্তম শতক) 'মালতীমাধব' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে আমরা নরমাংসবলিদানে পূজিতা ভয়ঙ্করী 'করালা' দেবীর বর্ণনা পাই।

কৃষ্ণবর্ণা শোণিতলোলুপা ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা দেবীকে আমরা কালী বা কালিকাদেবীর সহিত পরবর্তীকালে অভিন্না দেখিতে পাই। কিন্তু মনে হয়, ইঁহারা মূলে দুই দেবী ছিলেন: আকার সাদৃশ্যে এবং সাধর্ম্যে ইঁহারা পরবর্তীকালে এক হইয়া গিয়াছেন।

এই কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্করী কালিকা ও চামুণ্ডাদেবী এক পরমেশ্বরী মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'তে এই মিলনের পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। উপাখ্যানাদির সাহায্যেই পুরাণকারেরা এই জাতীয় মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। চণ্ডীতে দেখিতে পাই, ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য হিমালয়ে স্থিতা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলে দেবীর শরীরকোষ হইতে আর এক দেবী সমুদ্ভূতা হইলেন, এবং এই দেবী যেহেতু পার্বতীর শরীরকোষ হইতে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন সেইজন্য সেই দেবী 'কৌশিকী' নামে লোকে পরিগীতা হইলেন। কৌশিকী-দেবী এইরূপে দেহ হইতে বহির্গতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন, এইজন্য তিনি হিমাচলবাসিনী 'কালিকা' নামে সমাখ্যাতা হইলেন। মনে হয় এই যুগে কালিকাদেবী কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মেও খানিকটা গৃহীতা হইয়াছিলেন, সেইজন্য হিমাচলবাসিনী দেবীর সহিত এইভাবে তাঁহাকে মিলাইয়া লওয়া হইল। এখানের 'কালিকা'র আবির্ভাব রহস্য এইরূপ দেখিলাম বটে, কিন্তু একটু পরেই গিয়া আবার অন্যরূপ দেখিতে পাই। শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড এবং তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য অসুরগণ দেবীর নিকটবর্তী হইলে—

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা॥
ভ্রূকুটী-কুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥—৭।৫।৬

তখন অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত কোপ করিলেন; তখন কোপের দ্বারা তাঁহার বদন মসীবর্ণ হইল। তাঁহার ভ্রূকুটী-কুটিল ললাটফলক হইতে দ্রুত অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন।

এই কালীদেবী—

> বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
> দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
> নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥—৭।৭-৮

বিচিত্র নরকঙ্কালধারিণী, নরমালাবিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, শুষ্কমাংসা (মাংসহীন অস্থিচর্মময় দেহ), অভিভৈরবা, অতিবিস্তারবদনা, লোলজিহ্বা-হেতু ভীষণা, কোটরগত রক্তবর্ণচক্ষুবিশিষ্টা,—তাঁহার নাদে দিঙ্‌মুখ আপূরিত।

দেবী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াই সেই কালীদেবী বেগে দেবশত্রু অসুরগণের সৈন্যমধ্যে অভিপতিতা হইয়া সেখানে মহা-অসুরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন, সৈন্যবলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে আমরা কালী বা কালিকার যে বিস্তার ও বিবর্তন দেখিতে পাই, সে-বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করিতে চাহি না। এই বিবর্তনের ভিতরে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যবস্তু হইল কালীর শিবের সঙ্গে যোগ। শিব কালীর পদে স্থিতা, কালীর একপদ শিবের বুকে ন্যস্ত। সাধকের দিক হইতে এই তত্ত্বকে নানাভাবে গভীরার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি উপাদান মুখ্যভাবে এই শিবারূঢ়া দেবীর বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ, তন্ত্রের 'বিপরীত-রতাতুরা' তত্ত্ব। তৃতীয়তঃ, নিষ্ক্রিয় দেবতা শিবের পরাজয়ে বলরূপিণী শক্তিদেবীর প্রাধান্য এবং প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ যাহা মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচীন বর্ণনায় কালিকা শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া; অসুরনিধন করিয়া অসুরগণের শব তিনি পদদলিত করিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শবারূঢ়া বলিয়া বর্ণিতা। দক্ষিণা-কালীর প্রচলিত ধ্যানের মধ্যেও দেখিতে পাই—

> শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্।
> ... ...
> মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্॥

পরবর্তীকালের দার্শনিক চিন্তায় শক্তি-বিহনে শিবেরই শবত্ব-প্রাপ্তির তত্ত্ব খুব প্রসিদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং মনে হয় তখন শিবই পূর্ববর্তীকালের বর্ণিত শবের স্থান গ্রহণ করেন—শবারূঢ়া দেবীও তাই শিবারূঢ়া হইয়া ওঠেন। অসুরের শবারূঢ়া বলিয়াই যে দেবী শিবারূঢ়া বলিয়া কীর্তিতা বাংলাদেশের শাক্ত

পদাবলীর মধ্যে এই সত্যটির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই। মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা প্রাপ্তির আসল অর্থ হইল, শক্তিতত্ত্বের প্রাধান্যে শক্তির চরণলগ্ন অসুরের শবই তত্ত্বদৃষ্টিতে শিবে রূপান্তরিত হইয়াছে। তন্ত্রাদিতে শিবের বুকে কালীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বহুবিধ দার্শনিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। যেমন মহানির্বাণ-তন্ত্রে বলা হইয়াছে তিনি মহাকাল, তিনি সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়াই মহাকাল; দেবী আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি আগ্ধা পরম 'কালিকা'। কালকে গ্রাস করেন বলিয়াই দেবী কালী। তিনি সকলের আদি, সকলের কালস্বরূপা এবং আদিভূতা, এই নিমিত্তই লোকে দেবীকে আগ্ধাকালী বলিয়া কীর্তন করে।—

বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্রাদির ভিতরে 'কালীতন্ত্র'-ধৃত কালীর বর্ণনাই কালীর ধ্যানরূপে কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে গৃহীত হইয়াছে এবং কালীর এই রূপই এখন সাধারণভাবে বাংলাদেশের মাতৃপূজায় গৃহীত। দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা। বাম-হস্তযুগলের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন শির, আর উর্ধ্বহস্তে খড়্গ; দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, উর্ধ্ব-হস্তে বর। দেবী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণা (এইজন্যই কালীদেবী শ্যামা নামে খ্যাতা) এবং দিগম্বরী; তাঁহার কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত রুধিরের দ্বারা দেবীর দেহ চর্চিত; আর দুইটি শবশিশু তাঁহার কর্ণভূষণ। তিনি ঘোরদংষ্ট্রা, করালাস্যা, পীনোন্নত পয়োধরা; শবসমূহের করদ্বারা নির্মিত কাঞ্চী পরিহিতা হইয়া দেবী হসন্মুখী। ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় হইতে গলিত রক্তধারা দ্বারা দেবী বিস্ফুরিতাননা; তিনি ঘোরনাদিনী, মহারৌদ্রী—শ্মশানগৃহবাসিনী। বালসূর্যমণ্ডলের ন্যায় দেবীর ত্রিনেত্র; তিনি উন্নতদন্তা, তাঁহার কেশদাম দক্ষিণ-ব্যাপী ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা; তিনি চতুর্দিকে ঘোররবকারী শিবাকুলের দ্বারা সমন্বিতা। তিনি মহাকালের সহিত 'বিপরীত-রতাতুরা', সুখপ্রসন্নবদনা এবং 'স্মেরাননসরোরুহা'।

'মহানির্বাণ-তন্ত্রে'র মধ্যে কালীর প্রচলিত রূপের চমৎকার একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। সেখানে দেখি পার্বতীদেবী মহেশ্বরকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, মহদ্‌যোনিস্বরূপা আদিশক্তিস্বরূপিণী মহাদ্যুতি-সম্পন্না সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতা যিনি মহাকালী তাঁহার আবার শক্তিনিরূপণ কিরূপে সম্ভব? উত্তরে সদাশিব বলিতেছেন—'হে প্রিয়ে, পূর্বেই কথিত হইয়াছে, উপাসকগণের কার্যের নিমিত্ত গুণক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ প্রকল্পিত হইয়া থাকে। শ্বেত-পীতাদি বর্ণ যেমন কৃষ্ণে বিলীন হয়, হে শৈলজে, সর্বভূত সমূহ তেমনই

কালীতে প্রবেশ করে। এইজন্যই যোগিগণের হিতের জন্য সেই নির্গুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অমৃততত্ত্বের হেতুই এই নিত্যা কালরূপা অব্যয়া কল্যাণরূপিণীর ললাটে চন্দ্রচিহ্ন নিরূপিত হইয়াছে। নিত্যকালীন শশি-সূর্য-অগ্নি দ্বারা তিনি এই কালকৃত জগৎ সম্যক্ দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার তিনটি নয়ন কল্পিত হইয়াছে। সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন বলিয়া এবং কালদণ্ডের দ্বারা চবণ করেন বলিয়া তাহাদের রক্তসমূহ এই দেবেশ্বরীর বসনরূপে বলা হইয়াছে। সময়ে-সময়ে বিপদ হইতে জীবনকে রক্ষণ এবং স্ব-স্ব কার্যে প্রেরণই দেবীর বর ও অভয় বলিয়া ভাষিত। রজোগুণজনিত বিশ্ব-সমূহকে তিনি ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন; এইজন্যই, হে ভদ্রে তিনি রক্ত-পদ্মাসনস্থিতা বলিয়া কথিত হন। মোহময়ী সুরা পান করিয়া সেই সর্ব-সাক্ষিস্বরূপিণীদেবী কালসম্ভূত ক্রীড়ামগ্ন সৃষ্টিকে দর্শন করেন। এইভাবে অল্প-বুদ্ধি ভক্তগণের হিতের জন্য গুণানুসারে দেবীর বিবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে।

বাংলাদেশই শক্তি-সাধনার প্রধান কেন্দ্র। পূজার দিক হইতে বিচার করিলে বাংলাদেশে কালীপূজা হইতে দুর্গাপূজা প্রাচীনতর এবং ধর্মোৎসবের রূপে এখন পর্যন্তও দুর্গাপূজারই অধিক ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা, এবং জাঁক-জমক। কিন্তু বাঙ্গালী যে বিশেষ করিয়া শাক্ত তাহাও শুধু তাহার ধর্মোৎসব-রূপে শক্তিপূজার জন্য নয়, তাহা তাহার সাধনার জন্য; সেই সাধনার দিক হইতে বিচার করিলে দেখিব, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত শক্তিসাধনার কেন্দ্রে কালা; তারাকেও আমরা কালী-স্থানীয়া করিয়াই লইয়াছি; দশমহাবিদ্যার ভিতরকার অন্যান্য মহাবিদ্যাগণও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে কালীপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে কালীপূজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলাদেশে 'কালী' নানাপ্রকারের আছেন; 'তন্ত্রসারে' আমরা বিবিধ প্রকারের কালীর সাধনার পদ্ধতি দেখিতে পাই। প্রচলিত মতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মনে করিয়া ষোড়শ শতকের লোক বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই কালকে স্বীকার করেন না; তাঁহারা কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার'-নামক তন্ত্রশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন-গ্রন্থকে পরবর্তীকালের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 'তন্ত্রসারে'র মধ্যে কালী বা শ্যামা-পূজার বিধি ব্যতীত তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধনবিধিও সঙ্কলিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ ব্যতীত

তান্ত্রিক সাধনা ক্রিয়াকলাপবিধি সম্বন্ধে গ্রন্থরচয়িতৃরূপে ব্রহ্মানন্দ ও সর্বানন্দের প্রসিদ্ধি সমধিক। ব্রহ্মানন্দ পূর্ণানন্দের গুরু ছিলেন এবং আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'শাক্তানন্দতরঙ্গিনী'-তে শাক্তদিগের আচার-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তারারহস্যে' তারার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ পরহংস ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। তাঁহার রচিত 'শ্যামারহস্যে' কালীর উপাসকের আচার-অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। অপর একজন গ্রন্থকার (সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম শঙ্কর আগমাচার্য) 'গৌড়ীয় শঙ্কর' নামে অভিহিত হন। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার 'তারারহস্য বৃত্তিকা' গ্রন্থে তারার উপাসকের আচারাদি বিবৃত হইয়াছে।

বর্তমানকালে যেসব স্থানে নিত্য কালীপূজার প্রথা রহিয়াছে বা বিশেষ কোনও উপলক্ষে 'মানসিক'-করা কালীপূজার ব্যবস্থা হয়, ইহা ব্যতীত সাংবৎসরিক কালীপূজার বিধি হইল দীপালি-উৎসবের দিনে। দীপালি-উৎসবের দিনে এই কালীপূজার বা শ্যামাপূজার বিধি সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ পাওয়া ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের 'কালীসপর্যাবিধি' গ্রন্থে। কাশীনাথ এই গ্রন্থে কালীপূজার পক্ষে যেভাবে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালীপূজা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সুগৃহীত ছিল না। কালীপূজা বিষয়ে একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ এই যে, নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই এই পূজার প্রবর্তন করেন এবং তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যাহারা কালীপূজা করিতে অস্বীকৃত হইবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হইবে। এই আদেশের ফলে প্রতি বৎসর দশ সহস্র করিয়া কালীমূর্তি পূজিত হইতে লাগিল। কথিত আছে, কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র সহস্র-সহস্র মণ নৈবেদ্যে এবং সহস্র-সহস্র বস্ত্র এবং সমপরিমাণ অন্যান্য উপাচারে কালীদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। রটন্তী চতুর্দশীর রাত্রিতে (মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে) কালীপূজার কথা 'স্মৃতিসমুচ্চয়' গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। গোবিন্দানন্দ, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, বৃহস্পতি, রায়মুকুট এবং কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই দেবী পূজার ইতিহাসটাই বাংলাদেশের শাক্তধর্মের ক্ষেত্রে প্রধান কথা নহে; প্রধান জিনিস হইল দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাংলার তন্ত্র-সাধনা, এই তন্ত্র-সাধনা মুখ্যভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল কালী-সাধনা এবং দশমহাবিদ্যার সাধনার সঙ্গে; এবং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে আমরা কালী এবং অন্যান্য

দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শক্তি-সাধকগণের কথা জানিতে পারি।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া শক্তি-সাধকরূপে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ সেন। বাংলা শাক্ত পদাবলীর তিনিই প্রবর্তক। তাঁহার পরে সাধক কমলাকান্ত গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সাধক শাক্ত গান রচনা করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরের মা 'ভবতারিণী'-র মন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাংলার এই শক্তি-সাধনাকে বিশ্ববিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। যোগিপ্রবর শ্রীঅরবিন্দ বাংলার শক্তি-সাধনার অন্তর্গূঢ় রহস্যকে তাঁহার অখণ্ড মহাযোগের সহিত যুক্ত করিয়া সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক দার্শনিক রূপ দান করিয়াছেন।

কালিকাই যে হিমাচলসুতা বাংলা-সাহিত্যের স্থানে-স্থানে ইহার আভাস পাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে অম্বিকাকে কালিকারূপেই দেখিতে পাই। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাংলাদেশে যে-সকল শাক্ত পদাবলী দেখিতে পাই তাহাতেও এই সত্যের প্রমাণ মেলে। কালিমির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) রচিত পার্বতীর বাল্যলীলার একটি চমৎকার পদে দেখিতে পাই –

'চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী,
তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি।
জননীর হাত ধরা, হাঁটিছে সুধা অধরা,
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গণি॥

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপিণী ভজ মন অনুমানি,
হিমালয়েরি আলয়ে পরব্রহ্ম সনাতনী।
সব সখী সঙ্গে মেলে, কালী কালী কালী বলে,
কালিকে গিরি বালিকে হয়েছেন আপনি॥'

আর একটি পদে দেখি পার্বতী স্বামীগৃহ কৈলাস হইতে গিরিপুরে আসিলে অভিমানিনী মা মেনকা মেয়েকে বলিতেছেন—

'কৈলাস শিখরে, শঙ্করের ঘরে গিয়ে মা,
ভুলে যাক মায়।
মা বলে করিস না মনেতে, এ ছল বলি গো
মা কায়॥
বালিকা কালিকায় না হেরে মা নয়নে,
গেছে অশ্রুজলে দিন ও মা হর-অজনে।

আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা,
শক্তিহীন শক্তিতত্ত্বে ঈশানী।'

দাশরথি রায়ের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই, পার্বতীর জন্মের পরে প্রতিবেশিনীর রমণীগণ ধাত্রীর নিকট যখন মেয়ে দেখিতে চাহিলেন তখন—

দ্বার মুক্ত করে ধাত্রী কালিকা বালিকা মূর্তি
নয়নে নিরখে নারীগণ।

আমরা উপরে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে প্রচলিত মাতৃপূজার মধ্যে প্রধান কয়েকটি ধারার ইতিহাস অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলাম। এই প্রধান ধারাগুলির সহিত বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে স্থানীয় মাতৃদেবীগণ মিলিয়া মিশিয়া মূল ধারাকেই সুবিচিত্র এবং পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। 'দেবী ভাগবতে' এ-বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলা হইয়াছে। মহাদেবীর সহিত নিঃশেষে বহু গ্রাম্য দেবীকে মিলাইয়া দিয়া শেষে বলা হইয়াছে,—

কলা যা যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে।
পূজিতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে মুনে ॥—১।১।১৫৮-৫৯

ভারতবর্ষের যত নগরে এবং গ্রামে যত দেবী রহিয়াছেন তাঁহারাও বিধি-পূর্বক মহাদেবী রূপেই পূজিতা হইয়া থাকেন—কারণ, মূলে তাঁহারা আদ্যাদেবী হইতে কিছু পৃথক নন তাঁহারাও সকলে একই মহাদেবীর বিশেষ-বিশেষ কলামাত্র। এইরূপে মূলদেবীর কলাস্পদা বলিয়াই ভারতবর্ষের সকল গ্রাম্যদেবীকেও মহাদেবীর সহিত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে।

কালীদেবী ও কালীপূজার ইতিহাস।

উত্তরণ

দীর্ঘকাল চলেছে উর্দ্ধলোকের এক অধরা সত্তার সঙ্গে মানবাত্মার বিচিত্র যোগস্থাপনার ইতিহাস। মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাধনায় পরমেশ্বর নেমে এলেন নিচে, মানুষের দিকে হাত বাড়ালেন সখারূপে, পুত্ররূপে, প্রণয়ীরূপে। প্রতিষ্ঠিত হলো এই তত্ত্ব—ভক্ত যেমন ভগবানের সাযুজ্যকামী, ভগবানও তেমনি ভক্তের জন্য উন্মুখ।

বাঙ্গালীর ধর্মচিন্তা যে-বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার একটি বিশেষ রূপ আছে। আমরা দেখেছি এর আশ্চর্য সহনশীলতা। কেউ কোন যুগে কাকেও বলেনি—'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই!' ফলে, এ-জাতির অধ্যাত্ম-বীণায় সব স্বরই বেজে উঠেছে—কেউ কাউকে বাধা দেয়নি। এইভাবেই বেদবিরোধী ধর্মগুলি, এমনকি নাস্তিক্য-বাদীরাও এই আসরে আসন পেয়েছে। জাতির ধর্ম-চিন্তা অবাধে বিচরণ করেছে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যে, চৈতন্য থেকে জড়ে আর জড় থেকে চৈতন্যে। এই পথেই জন্ম নিয়েছে সুখবাদ (**Henotheism**)। নাস্তিক চার্বাক চেয়েছিলেন মানুষের ইহলৌকিক সুখের কথা, অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ভেবেছিলেন মানুষেরই পারমার্থিক মুক্তির কথা।

মুক্তির পথ যত ভিন্নই হোক, দেখা যায় ধর্মচিন্তায় মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় দ্বৈতবাদীরা অন্ততঃ সেই কথাই বলেন। তবু মধ্যযুগে ছিল মানবরূপী দেবতার পূজা—সেখানে দেবতা নিয়েছেন মানুষের রূপ। কিন্তু এরপর মানুষই উন্নীত হয়েছে দেবতার স্তরে আর সেইখানেই আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠা।

তারপর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙ্গালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তায় ঘটলো বিপ্লব। দূরের আলো এসে পড়লো জাতির মানসদর্পণে—এলেন ইমানুয়েল কাণ্ট তাঁর যুক্তিবাদ নিয়ে, ফ্রেডরিক হেগেল তাঁর অভিনব মনোদর্শন নিয়ে। এলো মিল বেন্থামের হিতবাদ, কোঁতের প্রত্যক্ষ দর্শন।

এরপর উনিশ শতকের ধর্মনায়কদের কণ্ঠে আমরা শুনলাম মানবগীতার পুণ্যমন্ত্র :—

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতাপাঠ

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—

'ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।'

'বেদে ক্রিয়াকর্মের বিধান ব্যবস্থা যতো কিছু আছে সবই ত্রৈগুণ্য বিষয়ক ; তুমি অর্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও।' এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহার সঙ্গে আর চারিটি বচন যোজনা করিয়া উহার ভাবার্থ ফুটাইয়া দিতেছেন ; বলিতেছেন—(১) নির্দ্বন্দ্ব হও' (২) 'নিত্যসত্ত্বস্থ হও' (৩) 'বিষয় ঘটিত লাভালাভ মনে স্থান দিও না' এবং (৪) 'আত্মবান হও।'

সমগ্র শ্লোকটি এই :—

'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।'

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ নির্দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ ভাঙিয়া দিতেছেন এইরূপ :—

'সুখ-দুঃখ মান-অপমান রাগ-দ্বেষ শীতোষ্ণ প্রভৃতি দুই-দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সংস্রব হইতে বিনির্মুক্ত এই অর্থে নির্দ্বন্দ্ব।' কথাটা ঠিক। কিন্তু ঐ কথাটুকুর অস্ফুট আলোকে নিস্ত্রৈগুণ্য এবং নির্দ্বন্দ্বের মধ্যে বন্ধনের আঁট যে কিরূপ তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন। তাহার সন্ধান পাইতে হইলে বর্তমান গীতাপাঠ প্রবন্ধের পূর্বের একটি প্রপাঠে সত্ত্বরজস্তমোগুণের পরস্পর প্রতি-দ্বন্দ্বিতার কথা যাহা বলা হইয়াছে, সেই কথাটির প্রতি আবার একবার মনঃসমাধান করা আবশ্যক। কথাটি সংক্ষেপে এই—

সত্ত্বগুণের প্রধান যে-দুইটি অঙ্গ—প্রকাশ এবং আনন্দ, দোঁহারই সঙ্গে দোঁহার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লাগিয়া আছে। প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী কে ? না অন্ধতা এবং জড়তা, এক কথায়—তমোগুণ। আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী কে ? না দুঃখ এবং অশান্তি, এক কথায় রজোগুণ। সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজস্তমোগুণের উভয়েরই একে-তো এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহাতে আবার রজস্তমোগুণের আপনা-আপনির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় যে কম তাহা নহে। তার সাক্ষী—একদিকে রজোগুণের প্রকৃতি-সিদ্ধ দুঃখ-যন্ত্রণার ছটফটানি এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মাতামাতি, আরেকদিকে তমোগুণের প্রকৃতি-সিদ্ধ অপ্রকাশের অন্ধকার এবং জড়তার নাগপাশ, দুয়ের মধ্যে যে কিরূপ সর্প-নকুলের সম্বন্ধ তাহা কাহারো চক্ষে ঢাকা

থাকিতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে, দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বি ত্রৈগুণ্যের সঙ্গের সঙ্গী, আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে নির্দ্বন্দ্বভাব নিস্ত্রৈগুণ্যের সঙ্গের সঙ্গী।

নির্গুণ হওয়া কাহাকে বলে? না একেবারেই গুণবর্জিত হওয়া। নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়া কাহাকে বলে? না তিনগুণের দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বির প্রতিকূলে আত্মশক্তি খাটাইয়া দ্বন্দ্ববিনির্মুক্ত একটি মাত্র গুণের সূর্যালোকে প্রভাতের পদ্মের ন্যায় মাথা তুলিয়া এবং হৃদয় খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ানো। সে গুণ কি? না রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত পরম পরিশুদ্ধ ঐশ্বরিক সত্ত্বগুণ। (১) রজোগুণ, (২) তমোগুণ, (৩) সত্ত্বগুণ, (৪) মলিনসত্ত্ব বা মিশ্রসত্ত্ব, (৫) শুদ্ধসত্ত্ব—এই পাঁচের কাহার কিরূপ পরিচয় লক্ষণ—শ্রীমৎশঙ্করাচার্যের প্রণীত বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ ঃ—

(১) রজোগুণের পরিচয়-লক্ষণ।

বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং
দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ॥
কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাঽভ্যসূয়াঽ
হঙ্কারের্ষ্যা—মৎসরাদ্যাশ্চ ঘোরাঃ।
ধর্ম্মা এতে রাজসাঃ; দুষ্প্রবৃত্তিঃ
যস্মাদেষা তদ্‌রজো বন্ধহেতুঃ॥

ইহার অর্থ এই—

রজোগুণের বিক্ষেপশক্তি ক্রিয়াত্মিকা।[১] তাহা হইতেই আদিহীনা প্রবৃত্তি-ধারা অজস্র প্রবাহিত হইতেছে। তাহা হইতেই রাগাদি এবং দুঃখাদি মনোবিকার সকল নিত্যনিয়ত উৎপন্ন হইতেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অসূয়া (Jealousy), পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি ঘোরা বৃত্তি যত কিছু আছে সমস্তই রজোগুণের ধর্ম্ম। যাহার উত্তেজনায় পুরুষের মনে এইসব প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ওঠে তাহাই রজোগুণ, আর তাহাই বন্ধনের হেতু।

(২) তমোগুণের পরিচয় লক্ষণ।

অজ্ঞানমালস্য-জড়ত্ব-নিদ্রা—
প্রমাদ-মূঢ়ত্ব-মুখাস্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চিৎ
নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি॥

অজ্ঞান, আলস্য, জড়ত্ব, নিদ্রা, প্রমাদ, মূঢ়ত্ব, এইগুলি প্রধানত তমোগুণের পরিচয় লক্ষণ। এই সকলের বশতাপন্ন হইয়া তামসিক লোকেরা জানে না কিছুই —কেবল হাই তুলিয়া ঝিমাইয়া এবং স্তম্ভের ন্যায় হইয়া কালাতিপাত করে।

(৩) সত্ত্বগুণের লক্ষণ—

সত্ত্বং বিশুদ্ধংজলবৎ তথাঽপি
তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্॥

ইহার অর্থ :—

সত্ত্বগুণ জলের ন্যায় বিশুদ্ধ; আর তাহাতে আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া নিখিল জড়বস্তু প্রকাশ করে। কিন্তু তথাপি তাহা অপর দুইটির সহিত জড়িত হইয়া সংসারগতির অনুপন্থী হয়।

ইহার টীকা—

আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই যে একটি অন্তর্দৃষ্টির দেখা কথা—কিনা আত্মচৈতন্য সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত হয়, ইহা শুনিয়া শিক্ষিতম্মন্য নব্য পণ্ডিতগণের হাস্যোদ্রেক হইতে পারে তা হোক! কিন্তু তাঁহারা যাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগের একজন প্রধান শিরো-ভূষণ বলিয়া মান্য করেন, তিনি কি বলিয়াছেন তাহা যদি মুহূর্তেক ধৈর্য ধরিয়া শোনেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হাস্যবদন তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিবে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব শুনুন কাণ্ট্ কি বলিতেছেন :—

It may seem difficult to understand how I can say : I, as an intelligence and thinking subject (অর্থাৎ I, as চিন্ময়জ্ঞাতা পুরুষ বা চিদাত্মা), know myself as an object thought like other phenomena, not as I am (স্বরূপতঃ) but only as I appear to myself (প্রতিবিম্ববৎ) * But that this must really be so can be clearly shown by the fact that we cannot represent to ourselves time in any other way than under the image of a line which we draw.**

ইহার অর্থ এই :—

আপাততঃ এটা একটা কঠিন সমস্যা বলিয়া মনে হইতে পারে যে, চিন্ময়

জ্ঞাতাপুরুষের পক্ষে আপনার নিকটে আপনি ঘটপটাদি বা সুখদুঃখাদি প্রতিভাসগুলার ন্যায় জ্ঞেয় বিষয়রূপে প্রতিভাত হওয়া কি প্রকারে সম্ভবে? যাহা বাস্তবিক আমি না, তাহা আমি বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া কিরূপে সম্ভবে? কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে কাঠিন্য কিছুই নাই; কেননা তাহা হইবারই কথা। এটা যেমন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, মনে মনেই হোক, আর হাতে-কলমেই হোক—একটা রেখা টানিয়া সেই দৃশ্যরেখাটিকে অদৃশ্য কালাংশের স্থলাভিষিক্ত করা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে কালনিরূপণ করা কাহারো সাধ্য-সুলভ নহে, এটাও তেমনি আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত চিদাভাসকে চিদাত্মার স্থলাভিষিক্ত করা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে আত্মনিরূপণ করা কাহারো সাধ্য-সুলভ নহে।

কাণ্টের এই কথাটির টীকা।

মনে কর, আমি বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা-উপলক্ষে মধ্যাহ্নকালে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমার একটি আত্মীয় লোকের বাটীতে গিয়াছিলাম। ভোজনাস্তে ঘণ্টা-খানেক বিশ্রামের পরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, আমার বসিবার ঘরে আমার বাল্যকালের কাব্যানুরাগী বন্ধু দেবদত্ত চৌকি হেলান দিয়া বসিয়া মেঘদূত পাঠ করিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'তুমি এখানে কতক্ষণ?' তিনি 'বলিতেছি' বলিয়া টিক্ করিয়া ঘড়ির ডালা উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন 'আমি যখন তোমার এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন ঘণ্টার কাঁটা এবং মিনিটের কাঁটা গায়ে-গায়ে লিপ্ত হইয়া বারোটায় ঠেকিয়াছে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল—ঘড়িটি আমার পরম নিষ্ঠাবান্। কেমন দেখ তদ্গতচিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে জোড়হস্তে মধ্যাহ্নদেবকে প্রণাম করিতেছে! এখন এ-যাহা দেখিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে—ঘড়িটি শেরা কাজের লোক! এই দেখ মিনিটের কাঁটার নিশান গাড়িয়াছে, আর ঘণ্টার কাঁটার মানদণ্ড দিয়া যে-দিকটা আমার ডাহিন্ দিক্, সেই দিকের ভূমি মাপিতেছে, অতএব এটা অকাট্য বেদবাক্য যে, আমি ডাহা তিন ঘণ্টা কাল তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি।' এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঘটিকা-চক্রের চতুর্থাংশ কি সত্যসত্যই তিনঘণ্টা কাল? কখনই না। তবে কি? না তাহা অদৃশ্য তিনঘণ্টা কালের দৃশ্য প্রতিরূপ, আর, প্রতিরূপেরই নাম প্রতিবিম্ব। এখন বলিবামাত্রেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, অদৃশ্য কালাংশ যেমন ঘটিকা-চক্রে দৃশ্য রেখারূপে প্রতিবিম্বিত হয়, চিন্ময় জ্ঞাতা পুরুষ তেমনি মস্তিষ্কের সত্ত্বাংশে চিদাভাসরূপে প্রতিবিম্বিত হন। টীকা এই পর্যন্তই যথেষ্ট, এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাক।

(৪) মিশ্র সত্বের পরিচয়-লক্ষণ।

মিশ্রস্য সত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ
স্বমানিতাদ্যা নিয়মা সমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধাচ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ॥

ইহার অর্থ এই:—

মিশ্রসত্বের ধর্ম এইগুলি:—স্বমানিতা (অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমানিতা) সমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুক্তিকামনা, দৈবী সম্পত্তি অর্থাৎ শমদমাদি সাধনসম্পত্তি, অসদাচরণ হইতে নিবৃত্তি।

(অর্থাৎ মিশ্রসত্বের লক্ষণ = সাধনাবস্থার লক্ষণ)।

(৫) শুদ্ধসত্বের লক্ষণ।

বিশুদ্ধসত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা
যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥

ইহার অর্থ এই:—

বিশুদ্ধ সত্বের পরিচয় লক্ষণ এইগুলি:—আত্মানুভূতি, পরমা প্রশান্তি, তৃপ্তি, প্রহর্ষ, আর সেই প্রগাঢ় পরমাত্মনিষ্ঠা যাহাতে করিয়া সদানন্দরসের সম্ভোগ হয়।

(অর্থাৎ শুদ্ধসত্বের লক্ষণ = সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ)।

এ-স্থানটিতে শঙ্করাচার্য পরমাত্মার সংস্পর্শগুণে শুদ্ধসত্বের যে-সকল লক্ষণ সিদ্ধ পুরুষের অন্তরে বাহিরে ফুটিয়া বাহির হয় তাহাই নির্দেশ করিলেন। স্থানান্তরে তিনি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শুদ্ধসত্ব অর্থাৎ সর্বজগতের সারভূত সমষ্টিসত্তা বা সমষ্টিসত্ব যাহা রজস্তমোগুণদ্বারা অবাধিত তাহা পরমাত্মারই উপাধি, তাহা জীবাত্মার উপাধি নহে:—রজস্তমোগুণ-দ্বারা কলুষিত মলিনসত্বই—মিশ্রসত্বই—জীবাত্মার উপাধি। শুদ্ধসত্ব এবং মিশ্রসত্ব সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের প্রকৃত মন্তব্য কথাটি তলাইয়া বুঝিতে হইলে তাহার সহজ উপায় হইতেছে—বর্তমান গীতাপাঠ প্রবন্ধের পূর্বের একটি প্রপাঠে সত্তাঘটিত সমষ্টি-ব্যষ্টির সম্বন্ধে গোটাদুই কথা আমি যাহা বলিয়াছি তাহার প্রতি, আবার একবার মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা ঐ স্থানটিতে প্রথমে আমি বলিয়াছি —'সমষ্টিসত্তা এবং ব্যষ্টিসত্তাকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিলে প্রথমেই

দুয়ের মধ্যেকার একটি মর্মান্তিক প্রভেদ আমাদের চক্ষে পড়ে এই যে, কোন দুই ব্যক্তি যেহেতু এক নহে, এইজন্য আমাতে তোমার সত্তার অভাব আছে, তোমাতে আমার সত্তার অভাব আছে; আর, যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তির নাম হয় দেবদত্ত, তবে দেবদত্তে তোমার এবং আমার উভয়েরই সত্তার অভাব আছে। তবেই হইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্তামাত্রেতেই সত্তার সঙ্গে সত্তার বাধা ন্যূনাধিক পরিমাণে লাগিয়া রহিয়াছে; সাত্ত্বিক আনন্দ রাজসিক দুঃখ এবং অশান্তির দ্বারা ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতিহত হইতেছে; সাত্ত্বিক প্রকাশ তামসিক জড়তা এবং অবসাদে ন্যূনাধিক পরিমাণে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে।' এ যাহা আমি বলিয়াছি ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্তামাত্রই রজস্তমোগুণের সহিত জড়িত, আর সেইজন্য তাহা মিশ্রসত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না—শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারে না।

শুদ্ধসত্ত্ব যে পদার্থটা কি, এই তো তাহা দেখিলাম, আর, মিশ্রসত্ত্ব যে পদার্থটা কি তাহাও একটু পূর্বে দেখা হইয়াছে। এ যাহা দেখা হইল তাহা জিজ্ঞাস্য বিষয়টির মূলে পৌঁছিবার পক্ষে যদিচ সহায় মন্দ না, কিন্তু তাহার কূলে পৌঁছিতে হইলে আরো গোটাকত কথা দেখিবার আছে; এই নিগূঢ় রহস্য-গুলি ক্রমে ক্রমে ভাঙিতেছি—

প্রথম দ্রষ্টব্য

সত্ত্বাকে যদি চৈতন্যময় সদ্‌বস্তু হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখা যায়, তবে তাহা অস্তি-নাস্তি দুয়ের বার—একপ্রকার জ্ঞানবিরোধী ভাবপদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ অস্তি এবং নাস্তি দুয়ের বা'র—জ্ঞান-বিরোধী ভাবপদার্থের নাম বেদান্ত দর্শনের পরিভাষায়—অবিদ্যা, কাণ্টের পরিভাষায়—thing in itself। এ-বিষয়ে কাণ্টের মন্তব্য এই:—ঘটদৃষ্টে যখন আমার মনোমধ্যে ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সে যে ঘটজ্ঞান তাহা আমারই ঘটজ্ঞান; পক্ষান্তরে, ঘটবস্তু কিছু আর আমারই ঘটবস্তু নহে। আমার ঘটজ্ঞান যে আমারই ঘটজ্ঞান তাহার প্রমাণ এই যে, আমি না থাকিলে আমার ঘটজ্ঞান থাকিতে পারে না; আর, ঘটবস্তু যে আমারই ঘটবস্তু নহে তাহার প্রমাণ এই যে আমি না থাকিলেও ঘটবস্তু যাহা আছে তাহাই থাকে। যাহাই হোক না কেন—আমার ঘটজ্ঞানের সীমার বাহিরে ঘট নিজে যে কি, তাহা বলিতে পারা একান্তপক্ষেই আমার সাধ্যাতীত। তবেই হইতেছে যে, যাহাকে আমি বলি ঘটবস্তু তাহার সহিত আমার ঘটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট। তেমনি, যাহাকে আমি বলি পটবস্তু তাহার সহিত আমার পটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে,

ঘটদ্রষ্টার যদি জ্ঞান না থাকে তবে ঘটজ্ঞানই বলো, পটজ্ঞানই বলো, আর, মঠজ্ঞানই বলো—কোন জ্ঞানই তাহার মনোমধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে না। ঘটদ্রষ্টার জ্ঞান আছে বলিয়াই, তাহার সেই একই অভিন্ন জ্ঞান ঘটদৃষ্টে ঘটজ্ঞানে পরিণত হয়, পটদৃষ্টে পটজ্ঞানে পরিণত হয়, মঠদৃষ্টে মঠজ্ঞানে পরিণত হয় ইত্যাদি। তবেই হইতেছে যে, ঘটপটাদি বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান একই অভিন্ন জ্ঞানের শাখাপ্রশাখা। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বৃক্ষ এবং শাখা-সমূহের মধ্যে যেমন সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধ, দ্রষ্টা পুরুষের একই অভিন্ন জ্ঞান এবং ঘটপটাদি-বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে তেমনি সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধ।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য

কাণ্ট্‌কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ ব্যষ্টিবস্তু, আর, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ অবিদ্যা বা **thing-in-itself**? তবে তাহার উত্তরে কাণ্ট্‌ একটা ঘট এবং একটা পট প্রশ্নকর্ত্তার সম্মুখে রাখিয়া সে-দুটার প্রতি একে-একে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন যে, এই যে ঘট, আর, এই যে পট, দুইই, জ্ঞানে অবভাসিত হইবামাত্র ব্যষ্টিবস্তু হইয়া ওঠে, আর, জ্ঞান হইতে বিযুক্ত হইবামাত্র অবিদ্যা বা **thing-in-itself** হইয়া পড়ে। পরন্তু, শঙ্করাচার্যের শিষ্যকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ সমষ্টিবস্তু, আর কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ সমষ্টি অবিদ্যা? তবে তাহার উত্তরে তিনি কী বলিবেন? তিনি যে কি বলিবেন তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; সকল শাস্ত্রেই যাহা বলে তাহাই তিনি বলিবেন;—তিনি বলিবেন—'তুমি যাহা দেখিতে চাহিতেছ তাহা আমি তোমাকে অবশ্যই দেখাইব—কিন্তু এখন না; পৃথিবী যখন সাগর গর্ভে প্রবেশ করিয়া জলময় হইয়া যাইবে; মহাসাগর যখন অগ্নিগর্ভে প্রবেশ করিয়া অগ্নিময় হইয়া যাইবে; অগ্নি যখন বায়ুগর্ভে প্রবেশ করিয়া বায়ুময় হইয়া যাইবে; বায়ু যখন আকাশে মিশিয়া আকাশের সহিত একীভূত হইয়া যাইবে; আকাশ যখন আরো সূক্ষ্মাৎ-সূক্ষ্মতর চৈতন্য-ঘ্যাঁসা শুদ্ধসত্ত্বে মিশিয়া চৈতন্যময় হইয়া যাইবে, তখন তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তোমাকে আমি বলিব যে, বিশ্বব্যাপী মহাচৈতন্যে অবভাসিত এই যে শুদ্ধসত্ত্ব ইহাই সমষ্টিবস্তু বা একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু, আর উহাকে চৈতন্য হইতে বিযুক্তভাবে দেখিলে উহাই সমষ্টি অবিদ্যা; আবার, উহাকে চৈতন্যের প্রতিবিম্বে অবভাসিত এবং চৈতন্যের প্রভাবে অভিভূতভাবে দেখিলে উহাই মায়া, অথবা যাহা একই কথা—ঐশী শক্তি। দ্বিতীয়ভাবে

দেখিলে শুদ্ধসত্বও যা, মায়াও তা, ঐশীশক্তিও তা, একই। চৈতন্যের আলোকে আলোকিত এবং চৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত শুদ্ধসত্বকে মায়া বলা যায় এইজন্য, যেহেতু তাহা বহুধা বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। মায়া শব্দের গোড়ার অর্থ—লোকে যাহাকে বলে জাদুবিদ্যা; কিন্তু তাহার সেই গোড়ার অর্থটি তাহার প্রকৃত অর্থ হইতে পারে না এইজন্যে—যেহেতু তাহা একটা মোটামুটি ভাবের উপমা মাত্র। যদি বলা যায় যে, ঈশ্বর জাদুবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য সম্পাদন করিতেছেন তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত কার্য আছে—সবই জাদুকার্য। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, ঈথরকম্পন হইতে আলোকের অভিব্যক্তি, সচেতন ইচ্ছার বলে অচেতন দৈহিক ব্যাপার সকলের প্রবর্ত্তনা, নিদ্রা হইতে জাগরণ, জাগরণ হইতে নিদ্রা—সবই জাদুকার্য। এইরূপ যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কার্যই জাদুকার্য হয়, তবে জাদুকার্যের বিশেষত্ব কী আর থাকে? জাদুকার্যের বিশেষত্বই যদি না থাকে, তবে জাদুকার্যকে অন্যান্য কার্য হইতে বিশেষিত করিয়া তাহাকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর কার্যরূপে দাঁড় করাইবার প্রয়োজন কি? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে নিতান্তই তাহার প্রয়োজনাভাব; আর, সেইজন্য তাঁহারা 'জাদু' 'মায়া' 'Miracle'—এই ভাবের শব্দগুলার দলবল যেখানে যত আছে সমস্তই বিজ্ঞানরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদিগের এইরূপ কঠোর আইন-জারি-কার্যে কবির মন প্রাণান্তেও সায় দিতে পারে না। কথাটা আর কিছু না—বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক চক্ষুষ্মান্, হৃদয় অন্ধ; কবির হৃদয় চক্ষুষ্মান্, মস্তিষ্ক অন্ধ। এইজন্য, বিজ্ঞানীরা যাহা স্পষ্ট দেখিতে পান, কবি তাহা দেখিতে পান না; তেমনি আবার, কবিরা যাহা স্পষ্ট দেখিতে পান, বিজ্ঞানীরা তাহা দেখিতে পান না। বিজ্ঞানীরা যাহাই বলুন না কেন—কবির চক্ষে অঘটনঘটনপটীয়সী পরমাশ্চর্য ঐশীশক্তি মহামায়াই বটে। ফল কথা এই যে, মহামায়াও যা ঐশীশক্তি তা; কথা একই কেবল ভাষা ভিন্ন। কবির ভাষায় যাহা মহামায়া বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাই ঐশীশক্তি। এই সকল অনির্বচনীয় নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা-স্থলে ভাষা লইয়া বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই হৃদয়-শূন্য মূঢ় ব্যক্তির কার্য।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য

বেদান্ত দর্শনের আর একটি কথা এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব বা মায়া বা সমষ্টি-অবিদ্যা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। তাহা তো হইবেই, যাহার গর্ভে পৃথিবী

জলময়, জল অগ্নিময়, অগ্নি বায়ুময়, বায়ু ঈথরময়, এবং যিনি আপনি ঈশ্বর চৈতন্যে চৈতন্যময়ী সেই সর্বধারিণী বিশ্বজননী—জগতের মূল উপাদান নহেন তো আর কী ? শঙ্করাচার্য তাই তাঁহার সর্ববেদান্ত সারসংগ্রহে বলিয়াছেন।

'অনন্তশক্তি-সম্পন্নো মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ।
ঈক্ষামাত্রেণ সৃজতি বিশ্বমেতচ্চরাচরং ॥
অদ্বিতীয়ঃ স্বমাত্রোহসৌ নিরুপাদান ঈশ্বরঃ।
স্বয়মেব কথং সর্বং সৃজতীতি ন শঙ্ক্যতাং ॥
নিমিত্তমপ্যুপাদানং স্বয়মেবাভবৎ প্রভুঃ।
চরাচরাত্মকং বিশ্বং সৃজত্যবতি লুম্পতি ॥
স্বপ্রাধান্যেন জগতো নিমিত্তমপি কারণং।
উপাদানং তথোপাধি প্রাধান্যেন ভবত্যয়ং ॥
যথা লূতা নিমিত্তং চ স্বপ্রধানং তথা ভবেৎ।
স্বশরীর-প্রধানত্বে চোপাদানং তথেশ্বরঃ ॥

ইহার অর্থ এই :—

অনন্ত শক্তিসম্পন্ন এবং মায়া-উপাধির সহবর্তী—এমন যিনি ঈশ্বর, তিনি সংকল্প মাত্রে বিশ্বচরাচর সৃজন করেন। স্বয়ং ঈশ্বর যখন অদ্বিতীয় আপনি-মাত্র এবং উপাদানরহিত, তখন তিনি জগৎ সৃষ্টি করিবেন কিরূপে এ-প্রকার শঙ্কা করিও না। প্রভু নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ হইয়া জগৎ সৃজন পালন এবং সংহার করেন। যে-অংশে তিনি স্বপ্রধান, সেই অংশে তিনি নিমিত্ত কারণ, আর, যে-অংশে তিনি উপাধি-প্রধান সেই অংশে তিনি উপাদান কারণ। যেমন মাকড়সা যে-অংশে স্বপ্রধান সেই অংশে তন্তুজালের নিমিত্ত-কারণ অর্থাৎ কর্তাকারণ, আর যে-অংশে শরীর প্রধান সেই অংশে উপাদান কারণ (অর্থাৎ মৃত্তিকা যেমন ঘটে পরিণত হয় সেইরূপ পরিণামী কারণ), ঈশ্বর তেমনি নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ দুইই একাকী আপনি। শঙ্করাচার্য এই যে বলিয়াছেন—

'মাকড়সা যেমন স্বীয় শরীরগুণে তন্তুজালের উপাদান কারণ, ঈশ্বর তেমনি স্বীয় উপাধিগুণে নিখিল জগতের উপাদান কারণ'।

ইহাতেই উপাধি যে পদার্থটা কি তাহা প্রকারান্তরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপাধি পদার্থটা আর কিছু না—শরীর। যেমন রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, তপ্ত অঙ্গারের দৃশ্য কিরণ-ছটা অগ্নির স্থূল শরীর, তপ্ত অঙ্গারের অদৃশ্য উত্তাপ অগ্নির সূক্ষ্ম শরীর, আর তপ্ত অঙ্গারের দাহিকা শক্তি দীপ্তি এবং উত্তাপ

উভয়েরই মূল কারণ এই অর্থে তাহা অগ্নির কারণ শরীর ; তেমনি বলা যাইতে পারে যে, নিখিল বাহ্যজগৎ পরমাত্মার স্থূল শরীর, নিখিল অন্তর্জগৎ পরমাত্মার সূক্ষ্মশরীর, আর ঐশী শক্তি যাবার দ্বিতীয় নাম মায়া এবং তৃতীয় নাম শুদ্ধসত্ত্ব, তাহা অন্তর্বাহ্য উভয় জগতের কারণ—এই অর্থে কারণ শরীর। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেনও তাই। সেই সঙ্গে এটাও তিনি বলিয়াছেন যে, জীব-শরীরের যে অংশ অস্থিমজ্জারসরক্ত ত্বক প্রভৃতি পাঞ্চভৌতিক উপাদানে পরিগঠিত তাহা জীবের স্থূল শরীর ; যে-অংশ বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সূক্ষ্ম উপাদানে পরিগঠিত তাহা জীবের সূক্ষ্ম শরীর ; আর জীব-চৈতন্যের উপাধিভূত সেই যে অবিদ্যা বা মলিনসত্ত্ব তাহা অল্পজ্ঞতা এবং অহঙ্কারাদির কারণ—এই অর্থে তাহা জীবের কারণ-শরীর।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য

বেদান্তের মতে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েরই কারণ শরীর সুষুপ্তিরূপী। প্রভেদ কেবল এই যে, জীবাত্মার কারণ শরীর সামান্য-গোছের সুষুপ্তি ; পরমাত্মার কারণ শরীর সেই মহাসুষুপ্তি যাহার আর এক নাম প্রলয়। একটু পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পরমাত্মার সেই যে মায়া-উপাধি যাহার আরেক নাম শুদ্ধ সত্ত্ব তাহাই তাঁহার কারণ শরীর, আর তাহাতে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সমস্ত বস্তু একসঙ্গে মিশিয়া একাকারে পরিণত। ইহা হইতে আসিতেছে যে পরমাত্মার কারণ শরীর প্রলয়রূপী। আবার, জীবের কারণ শরীর যেহেতু তাহার সমস্ত শরীরের সারভূত মূল উপাদান, কিনা বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে বলে Protoplasm, এইজন্য তাহাতেও জীবের স্থূলসূক্ষ্ম সমস্ত অবয়ব একসঙ্গে মিশিয়া একাকারে পরিণত হইবারই কথা ; কাজেই তাহাও সুষুপ্তিরূপী।

বেদান্ত দর্শনে আরো বলা হইয়াছে এই যে, জীবাত্মার সেই যে সুযুপ্তিরূপী কারণ-শরীর, তাহা জীবাত্মার আনন্দময় কোষ ; আর পরমাত্মার আনন্দময় কোষ হচ্ছে সেই মহাসুমুপ্তি যাহার আরেক নাম প্রলয়। গীতায় কিন্তু লেখে—

'অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥'

'জানাই তো আছে যে, সৃষ্টির মধ্যই কেবল ব্যক্ত, পরন্তু তাহার আদিও যেমন অন্তও তেমনি—দুইই অব্যক্ত, তাহার জন্য খেদ কিসের ?'

ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ই বা কেমন ধারা আর সৃষ্টিই বা কেমন ধারা তাহার রহস্য-বার্তা মুখে বলিয়াছেন এবং গ্রন্থে

লিখিয়াছেন নানা দেশের নানাশাস্ত্রকার, কিন্তু চক্ষে দেখেন নাই কেহই। পক্ষান্তরে, আদি এবং অন্তের মাঝের জায়গাটিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া—রহিয়াছি এই যে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সবাই আমরা এক-একটি, এ-ব্রহ্মাণ্ডের আটপহুরিয়া প্রলয় এবং সৃষ্টি যে কিরূপ তাহা আমাদের কাহারো নিকটে অবিদিত নাই। তার সাক্ষী—কল্পনাকুহকিনী যখন আমাদের ধ্যানচক্ষুর সম্মুখে বিরাট অন্ধকার-মূর্তি ধারণ করিয়া প্রলয়ের অভিনয় করে, তখন তাহার কোন স্থানেই আমরা নাস্তি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না; পক্ষান্তরে আমরা যখন রাত্রিকালে সুনিদ্রা হইতে প্রভাতে গাত্রোত্থান করি, তখন সুনিদ্রা যে কি আরামের বস্তু তাহা আমাদের জানিতে বাকি থাকে না। শ্রোতৃবর্গের জানা উচিত যে, জীবাত্মা, পরমাত্মা, ঐশীশক্তি, অবিদ্যা প্রভৃতির সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া আমি যে কয়েকটি কথা বলিলাম, তাহার একটিও আমার নিজের কথা নয়, সব বেদান্ত দর্শনের কথা। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁহার প্রণীত সর্ববেদান্তসারসংগ্রহে জীব ঈশ্বর এবং দোঁহার দুই উপাধি সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার অর্থ এই :

আপনার প্রতিবিম্বের সহিত মায়া-উপাধিতে অধিষ্ঠান করিতেছেন এমন-যে সত্ত্বগুণ-পরিপুষ্ট চৈতন্য, তিনি সর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, অব্যাকৃত এবং অব্যক্ত, এই অর্থে ঈশ বলিয়া অভিহিত হন। আর, তিনিই সর্বশক্তিমান সমষ্টি-অবিদ্যার (অর্থাৎ মায়ার) অবভাসক, স্বতন্ত্র, সত্যকাম এবং সত্যসংকল্প—এই অর্থে ঈশ্বর। এই মহীয়ান মহাবিষ্ণুর মহাশক্তি সত্ত্বগুণে পরিপুষ্ট সমষ্টি-অবিদ্যা, আর যেহেতু তাহা সর্বজ্ঞতা এবং সর্বাধিপত্যের কারণ, এই হেতু মনীষীরা তাহাকে বলিয়া থাকেন কারণ-শরীর। তাহা আনন্দবহুল এবং কোষের ন্যায় স্বরূপের আচ্ছাদক বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ; এবং তাহা সর্বজগতের লয়স্থান বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে সুষুপ্তিস্থান; আর বেদে উক্ত হইয়াছে যে, তাহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়। ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে অবিদ্যা অনেক এবং বিভিন্ন। অবিদ্যার ডালপালা অনেক এবং তাহার গুণবৈচিত্র্যও অশেষ প্রকার। বন এক হইলেও ব্যষ্টি-অভিপ্রায়ে তাহা যেমন অনেক বৃক্ষ, অবিদ্যার অনেকতাও সেইরূপ। ব্যষ্টি অবিদ্যা রজস্তমোগুণ দ্বারা মলিনসত্ত্বা বলিয়া তাহা আত্মার নিকৃষ্ট উপাধি। এই ব্যষ্টি-অবিদ্যা দ্বারা অবিচ্ছিন্ন যে জীবচৈতন্য তাহাকে বলা হইয়া থাকে প্রত্যগাত্মা। এই ব্যষ্টি-অবিদ্যারূপী উপধিতে স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত বর্তমান, আর, সেই উপাধির সহিত একীভূত হওয়া গতিকে তাহার গুণত্রয়ে অভিভূত—এমন-যে অল্পজ্ঞ পরতন্ত্র

এবং সংসারী চৈতন্য, তাহা জীব নামে অভিহিত হয়। ব্যষ্টি-অবিদ্যা অহঙ্কারের কারণ বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে জীবের কারণ-শরীর। কারণ-শরীরাভিমানী জীবচৈতন্যকে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন প্রাজ্ঞ; তাহাকে তাঁহারা প্রাজ্ঞ বলেন এইজন্য—যেহেতু তাহা ব্যষ্টি-অবিদ্যার অবভাসক। জীবেরও কারণ-শরীর স্বরূপের আচ্ছাদক এবং আনন্দবহুল বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তির অবস্থাই প্রকৃষ্ট আনন্দের অবস্থা। সুষুপ্তিকালের পরমানন্দ স্মরণ করিয়াই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি বলে— গতরাত্রে পরমসুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম—কোন্ দিক দিয়া রাত্রি প্রভাত হইল তাহা জানিতেও পারি নাই।'

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বেদান্তদর্শনের মতে প্রলয়রূপী ঐশ্বরিক কারণ-শরীর এবং সুষুপ্তিরূপী জৈব কারণ-শরীর দুইই আনন্দময় কোষ। প্রলয়ের বৃহৎ ব্যাপারটাকে আপাততঃ না ঘাঁটাইয়া সুষুপ্তির সহিত আনন্দময় কোষের কিরূপ সম্বন্ধ—অগ্রে তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

নিদ্রা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) তামসিক, (২) রাজসিক, (৩) সাত্ত্বিক। একপ্রকার পাশবপ্রকৃতির নিদ্রা আছে যাহা ভুরিভোজন এবং মাদক দ্রব্য সেবনাদির ফলস্বরূপ—ইহাই তামসিক নিদ্রা; আর একপ্রকার নিদ্রা আছে যাহা স্বপ্নের উপদ্রবে অশান্তিময়—ইহাই রাজসিক নিদ্রা; তৃতীয় আর এক প্রকার নিদ্রা আছে যাহা শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ফল স্বরূপ, আর সেইজন্য স্বর্গসুখের পূর্ব্বাভাস—ইহাই সাত্ত্বিক নিদ্রা; আর তাহারই নাম সুষুপ্তি। সুষুপ্তির মন্দাকিনী স্নানে সুপ্ত ব্যক্তির মন হইতে সমস্ত শ্রমক্লম নিঃশেষে ধৌত হইয়া গিয়া যখন তাহার স্থানে সুনির্ম্মলা শান্তি একাকী বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার অন্তঃকরণের গূঢ়তম প্রদেশে আনন্দময় কোষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় এবং তাহার মধ্য দিয়া পরমাত্মার সুমঙ্গল শান্তি তাহার শরীর মনের উপরে স্বচ্ছন্দমতে কার্য্য করিতে পথ পায়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কোন সুস্থ শরীর পুণ্যাত্মা রাত্রিকালে সুষুপ্তির স্বর্গে বাস করিয়া প্রাতঃকালে যখন মর্ত্ত্যে আগমন করেন, তখন, বুদ্ধির প্রসন্নতা, মনের স্ফূর্ত্তি, প্রাণের শান্তি, দেহের স্বচ্ছন্দতা সঙ্গে করিয়া প্রত্যাগমন করেন, বৈ বই, শূন্যহস্তে প্রত্যাগমন করেন না। ইহার ভিতরে একটি নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিতেছি—

পূর্ব্বে ঢের বলিয়াছি এবং এখানে ফের বলিতেছি যে, তোমারও যেমন, আমারও তেমনি, আর; তৃতীয় যে কোন ব্যক্তি—যেমন দেবদত্ত—তাহারও তেমনি, সত্তার সঙ্গে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা অবিচ্ছেদে লাগিয়া আছে। এখন

জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্তিয়া থাকিবার সেই সে ইচ্ছা –আসে তাহা কোথা হইতে? আসে যে তাহা কোথা হইতে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। সত্তার প্রকাশ হইলেই সত্তার রসানুভূতি হয়, সত্তার রসানুভূতি হইলেই সত্তার প্রতি প্রেম জন্মে, প্রেমের উপরে আনন্দের গোড়া পত্তন হয়, আর, সেই প্রেমানন্দের সঙ্গে এইরূপ একটি সদিচ্ছা আপনা হইতেই আসিয়া যোটে যে 'সত্তা চিরজীবী হইয়া বর্তিয়া থাকুক।' এইরূপে দেখা যাইতেছে যে সদিচ্ছার মূলে প্রেমানন্দ চাপা দেওয়া রহিয়াছে—প্রেমানন্দের মূলে চিৎপ্রকাশ চাপা দেওয়া রহিয়াছে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সদিচ্ছার উৎপত্তি হইয়াছে যেমন প্রেমানন্দের অনুভূতি হইতে সদিচ্ছার চরম উদ্দেশ্যও তেমনি প্রেমানন্দের অনুভূতি। কিন্তু এইমাত্র দেখিলাম যে, সত্তার প্রকাশ না হইলে সত্তার প্রতি প্রীতিজনিত আনন্দ অনুভূত হইতে পারে না। অতএব, যাহাকে বলিতেছি সদিচ্ছা তাহা বর্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা তো বটেই তা ছাড়া—তাহা চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্তিয়া থাকিবার এই যে ইচ্ছা—এ-ইচ্ছা ইচ্ছামাত্র নহে—পরন্তু উহা আত্মশক্তিরই আর এক নাম। কোন, সমষ্টিসত্তার বাহিরে যখন দ্বিতীয় কোন সত্তা নাই, তখন সমষ্টি সত্তা যে, আপনার স্বাভাবিকী শক্তি ব্যতিরেকে অপর কোন শক্তির আশ্রয়ে ভর্ করিয়া নিত্যকাল বর্তমান, এ-কথা একেবারেই অগ্রাহ্য। দাহিকা-শক্তি যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব, কাব্যরচনা শক্তি যেমন কবির কবিত্ব, তেমনি, চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্তিয়া থাকিবার শক্তি চিদানন্দস্বরূপ সদবস্তুর সত্ত্ব; আর, সদবস্তুর সেই যে, সত্ত্ব তাহা রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত এবং পরমপরিশুদ্ধ বলিয়া উপনিষদে উক্ত হইয়াছে 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া (সা)' পরমাত্মার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া (অর্থাৎ ঐশীশক্তি) স্বাভাবিকী। এই সঙ্গে আর একটি কথা দ্রষ্টব্য এই যে, ব্যষ্টিসত্তা যখন সমষ্টিসত্তা হইতেই আসিয়াছে, তখন ব্যষ্টিসত্তাতে সমষ্টিসত্তার গুণ ন্যূনধিক পরিমাণে কিছু-না-কিছু থাকিবেই থাকিবে। মনুষ্যের তো কথাই নাই—অধম শ্রেণীর জীবেরাও একপ্রকার বাধা-বিঘ্নের প্রতিকূলে আপনার আপনার সত্তা বাঁচাইয়া রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট। এখন প্রকৃত কথা যাহা তাহা এই:

একটু পূর্বে দেখিয়াছি যে, সদিচ্ছার উৎপত্তি হইয়াছে যেমন আনন্দের অনুভূতি হইতে, সদিচ্ছার চরম উদ্দেশ্যও তেমনি আনন্দের অনুভূতি; আর, এইমাত্র দেখিলাম যে, সেই যে সদিচ্ছা অর্থাৎ সকলে মিলিয়া চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা, তাহা শক্তিময়ী প্রবলা ইচ্ছা, তা বই, তাহা

ফাঁকা ইচ্ছা নহে। তবেই হইতেছে যে, সেই যে শক্তিময়ী ইচ্ছা বা ইচ্ছাশক্তি, অথবা যাহা একই কথা—আত্মশক্তি, তাহার গোড়াতেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ ; মাঝে শক্তির খাটুনি। গোড়ায় যেখানে আত্মশক্তি সুপ্তিগর্ভে বিশ্রাম করে, সেখানেও জীবাত্মার ভোগের জন্য আনন্দের নৈবেদ্য সাজানো থাকে ; আবার মাঝপথে যেখানে আত্মশক্তি উদ্যমের সহিত কার্য খাটে, সেখানেও আনন্দ ধ্রুবতারার ন্যায় চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। এমন কথা হইতেছে এই যে, প্রকাশের বাধা কিনা জড়তা এবং আনন্দের বাধা কি-না অশান্তি, এই দুইপ্রকার বাধা অতিক্রম করাই জীবাত্মার আত্মশক্তির মুখ্য কার্য। একদিনের মতো বাধা অপসারিত হইলেই আত্মশক্তির একদিনের কার্য পরিসমাপ্ত হয় ; আর তাহা যখন হয়, তখন, সেই অবসরে আত্মশক্তি সেদিনকার মতো বিশ্রাম করে। যে-পরিমাণে চিৎপ্রকাশ এবং প্রেমানন্দ বাধামুক্ত হয়। আবার, আত্মশক্তির বিশ্রামকালে সেই যথাপরিমাণে বাধামুক্ত প্রকাশ এবং আনন্দকে সঙ্গে লইয়া জীবাত্মা সুষুপ্তির আরাম-নীড়ে প্রবেশ করে , আর সেই গতিকে সুষুপ্তির নিভৃত নিকেতনে চিৎপ্রকাশ এবং আনন্দ উভয়েই একত্রে মিলিত হয়। তবে কিনা—চিৎপ্রকাশ সুযুপ্তির সঙ্গে মিশিয়া ঘনীভূত বা একীভূত হইয়া যায়, আর, সেইজন্য বেদান্তশাস্ত্রে সুষুপ্তিকে বলা হইয়া থাকে 'প্রজ্ঞানঘন' ; আনন্দ জীবাত্মার ভোগের জন্য অনাবৃত হয়, আর, সেইজন্য বেদান্তশাস্ত্রে সুষুপ্তিকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তিকালে চিৎপ্রকাশ যদি মূলেই বর্তমান না থাকিত—সুপ্তির সঙ্গে মিশিয়া সুপ্তবৎভাবেও বর্তমান না থাকিত, তাহা হইলে সুষুপ্তিতে আনন্দ অনুভূত হইতে পারিত না ; কেননা (একটু পূর্বে যেমন দেখিয়াছি) সত্তার প্রকাশ ব্যতিরেকে আনন্দের অনুভূতি সম্ভবে না ; আর সুষুপ্তিতে যদি আনন্দের অনুভূতি না হইত, তাহা হইলে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি কখনই এত বড় একটা মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিতে সাহসী হইত না যে, 'কাল রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম'।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সুষুপ্তি এই যেমন আনন্দময় কোষ ; বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের মহাসুষুপ্তি, যাহার নাম প্রলয়, তাহাও তেমনি আনন্দময় কোষ হইবারই কথা, কেননা, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধ। প্রভেদ কেবল এই যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে, পূর্বরাত্রের আনন্দ হইতে পররাত্রের আনন্দে প্রয়াণ করিবার সময় মাঝের পথে বাধাবিঘ্নের সহিত আত্মশক্তির সংগ্রাম এবং তজ্জনিত দুঃখক্লেশ অনিবার্য ; পরন্তু, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে, ঐশীশক্তির মূলেই বা কি, শেষেই বা কি— আর মাঝেই বা কি, সর্বত্রই আনন্দের অমৃতধারা চির-প্রবহমান। একটু পূর্বে

বলিয়াছি যে, জীবাত্মার আত্মশক্তি যে-পরিমাণে দিনগত বাধা-বিঘ্নের উপরে জয়লাভ করে, সেই পরিমাণে চিৎপ্রকাশ এবং প্রেমানন্দ বাধামুক্ত হয়, আর আত্মশক্তির বিশ্রামকালে—সেই পরিমাণে বাধামুক্ত প্রকাশ এবং আনন্দকে সঙ্গে লইয়া জীবাত্মা সুষুপ্তির আরাম নীড়ে প্রবেশ করে। এখন কথা হইতেছে এই যে, 'সম্মুখের বাধাবিঘ্ন অপক্রান্ত হইলেই ঈশ্বরপ্রসাদে আনন্দের অভ্যুদয় হইবে' এই বিশ্বাসে ভর করিয়া জীবাত্মার আত্মশক্তি যদিচ খাটুনির কষ্টকে কষ্টজ্ঞান করে না, তথাপি তাহাকে কষ্ট করিয়া গন্তব্য পথে প্রতিপদ অগ্রসর হইতে হয় তাহাতে আর ভুল নাই। একপ্রকার খাটুনি আছে - ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে **Labour of Lov** —প্রীতির খাটুনি। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, রামায়ণের রচনা কার্যে বাল্মীকি মুনি যেরূপ খাটিয়াছিলেন, তাহা প্রীতির খাটুনি ; কিন্তু তথাপি তাঁহার সেই সাধের রচনাকার্যটি সর্বাঙ্গসুন্দর পরিপাটীরূপে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে তাঁহাকে বিলক্ষণই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল ;—নারদ মুনির নিকট হইতে রামের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল ; আবার, ক্রৌঞ্চীপক্ষীটির জন্য তাঁহাকে যেরূপ মর্মবেদনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার সরস্বতীর গর্ভবেদনা ! দুঃসহ শোক-সন্তাপে তাঁহার মন যখন কিছুতেই শান্তি মানিতেছিল না—সেই মুখ্য সময়টিতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার নয়ন-সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন ; আর-অগ্নি-ব্রহ্মার দৈবশক্তিময়ী অভয়বাণীতে তাঁহার মনোমধ্যে কবিত্বরসের উৎস উন্মুক্ত হইয়া গেল। তবেই হইতেছে যে, রামায়ণের রচনা-কার্যে প্রীতির খাটুনি এবং কষ্টের খাটুনি দুইই একসঙ্গে জড়ানো ছিল। পরন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্যে ঐশীশক্তির যেরূপ অনুলোম-প্রতিলোম ক্রম-পদ্ধতির কথা দর্শনাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নিখুঁত আনন্দ-সঙ্গীত ; তাহা পরমাত্মার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া ; তাহা একান্ত পক্ষেই বাধাবিহীন ; তাহার কোথাও কোন স্থানে কষ্টকল্পনার নামগন্ধও নাই। ঐশীশক্তিতে বিশ্রামের আনন্দ এবং উদ্যমের স্ফূর্তি নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসের ন্যায় একসূত্রে গ্রথিত এবং উভয়ে উভয়ের প্রতিপোষক। অতএব এটা স্থির যে, ঐশীশক্তি নিত্যানন্দময়ী। এই যে নিত্যানন্দময়ী ঐশীশক্তি ইহাই নিত্য সত্ত্ব। এই নিত্যসত্ত্বের অমৃত-ভাণ্ডার সর্বজগতের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর উন্মুক্ত রহিয়াছে। যাহাতে অমৃতের পুত্র-কন্যারা সকলে মিলিয়া চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্তিয়া থাকিতে পারে, আত্মার এই অন্তরতম সদিচ্ছাটিকে বলবতী এবং ফলবতী করিবার অভিপ্রায়ে মনুষ্যের আত্মশক্তি যদি সম্মুখস্থিত বাধাবিঘ্নের অপনয়ন-কার্যে কায়মনোবাক্যে

সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে, আত্মশক্তি একদিনের কার্য একদিনের মতো সুসম্পন্ন করিয়া রাত্রিকালে যখন সুষুপ্তির আনন্দময় কোষে বিশ্রাম করে,' তখন পরমাত্মার সেই অমৃত-ভাণ্ডার হইতে—স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া হইতে—নিত্যসত্ত্ব হইতে—সুনির্মল আত্মপ্রসাদ শান্তি তৃপ্তি এবং আরোগ্য অবতীর্ণ হইয়া সুষুপ্ত ব্যক্তির নির্জীব শরীরে নবজীবনের সঞ্চার করে ; আর, পরমাত্মার প্রসাদ-লব্ধ সেই যে নবজীবন, যাহা সদাচারপরায়ণ পুণ্যাত্মারা সুষুপ্তির হস্ত হইতে প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের নিকটে তাহা অমূল্যধন, কেননা, পরদিনের কর্মক্ষেত্রে তাঁহারা তাহা বিধিমতে কাজে খাটাইয়া তাহা হইতে সোনা ফলাইয়া তোলেন।

মনে কর, রাজর্ষি জনক সমস্তদিন তাঁহার অধীনস্থ প্রজাদিগের মুখে তাহাদের নানা প্রকার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিবিধানকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি এমনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, প্রজা-দিগের জন্য তিনি কি করিয়াছেন না-করিয়াছেন তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই তখন তাঁহার মনোমধ্যে স্ফূর্তি পাইতেছে না, কেবল মোটের উপরে তিনি যে প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন—এই মোট জ্ঞানটি তাঁহার অন্তঃকরণে আত্মপ্রসাদের জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছে। এই যে মোট জ্ঞান এবং তজ্জনিত আত্মপ্রসাদ, এই দুইটি পুণ্যফল লইয়া তিনি যখন সুষুপ্তির আরামনীড়ে প্রবেশ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, তখন তাঁহার এরূপ মনে হইতেছে না যে, 'আমি এক্ষণে সর্বসংহারক মৃত্যুর ভীষণ বন্দিশালায় প্রবেশ করিতেছি' পরন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার মনে হইতেছে 'আমি এক্ষণে সর্বসন্তাপহারিণী জগজ্জননীর ক্রোড়ে নিলীন হইতেছি।' এ যাহা তাঁহার মনে হইতেছে—বাস্তবিকই তাই। কেননা সুষুপ্তির আনন্দময় কোষ হইতে আনন্দামৃত পান করিয়া যাবৎ পর্যন্ত না তাঁহার শরীর সবল হয়, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, মন তৃপ্ত হয় এবং বুদ্ধি প্রসন্ন হয়, তাবৎ পর্যন্ত সেই স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে আপনার শান্তিসদনের পরিধির মধ্যে যত্নের সহিত আগলিয়া রাখেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, সুষুপ্তিকালে সুপ্ত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনের যেরূপ প্রশান্ত সরল এবং নির্মল অবস্থা স্বভাবত ঘটিয়া দাঁড়ায়, তেমনি, জাগ্রৎকালে যদি কোন সাধক সজ্ঞানভাবে আত্মশক্তি খাটাইয়া আপনার মন হইতে বিষয়-বাসনা এবং অহঙ্কারাদি ধৌত করিয়া ফেলেন, তবে তাঁহারও মনের সেইরূপ প্রশান্ত সরল এবং নির্মল অবস্থা ঘটিয়া দাঁড়াইবারই কথা ; আর তাহা যখন ঘটিয়া দাঁড়ায় তখন পরমাত্মার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া হইতে—নিত্যসত্ত্ব হইতে—প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং আনন্দামৃত অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সমস্ত অভাব ঘুচাইয়া দেয়। এরূপ মহাত্মারা আপনার জন্য

নির্ভাবনা এবং নিশ্চিন্ত; ইহারা 'নির্যোগক্ষেম'। ইহাদের নিকটে আপনার মঙ্গল এবং অন্যের মঙ্গল—দুই মঙ্গল নহে, পরন্তু সব মঙ্গলই এক মঙ্গল; ইহাদের কার্যও তদনুরূপ। আর সেইরূপ কার্যে ইহাদের আত্মশক্তি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায়—যখন খাটিবার হয় তখন খাটে, যখন বিশ্রাম করিবার হয় তখন বিশ্রাম করে; ইহাদের আত্মশক্তি অনেক পরিমাণে বাধা-মুক্ত; ইহারা 'আত্মবান'। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে 'নিত্যসত্ত্বস্থ' হওয়া 'নির্যোগক্ষেম' হওয়া এবং 'আত্মবান' হওয়া একই ব্যাপার।

কেহ যদি মনে করেন যে, সুষুপ্তি কেবল সুষুপ্ত অবস্থারই নিজস্ব ধন, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। তাঁহার জানা উচিত যে, জাগরিতাবস্থাতে সবই আছে—বুদ্ধির জাগরণও আছে, মনের স্বপ্নও আছে, প্রাণের সুষুপ্তিও আছে; আর তিনের সামঞ্জস্য লোকমধ্যে দুর্লভ হইলেও মঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষে তাহা অতীব প্রার্থনীয়। বড় বড় চিত্রকরদিগের চিত্ররচনার একটি প্রধান গুণ হচ্ছে—জাগ্রৎসুষুপ্তি; আর, সে-যে সুষুপ্তি অর্থাৎ চিত্রময়ী জাগ্রৎসুষুপ্তি, তাহার ইংরাজি পারিভাষিক নাম Repose। অব্যবসায়ী লোকদিগের অভিধানে বুক-ফোলানো, চক্ষুরাঙানো. এবং বাহু আস্ফালন করার নামই বীরত্ব;—ফলে, বীরত্ব যে কাহাকে বলে তাহা নেলসন্ জানিতেন; আর তাহা জানিতেন বলিয়া—ভীষণ জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রারম্ভ মুহূর্তে সমস্ত খানোয়ারি সৈন্যবর্গকে সামনে ডাকিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন শুধু এই যে, **England expects every man to do his duty** ইংলণ্ড চান প্রতিজন আপনার কর্তব্য করে। ভাব এই যে, 'তোমরা যেমন সুনিশ্চিন্ত মনে আর-আর কর্তব্য কার্য সমাধা কর, উপস্থিত কর্তব্য কার্যও সেইরূপ সুনিশ্চিত মনে সমাধা কর।' ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সঙ্গতিপন্ন গৃহী ব্যক্তিরা যেরূপ নিশ্চিন্তমনে বন্ধুবর্গের সহিত প্রীতিভোজনে উপবিষ্ট হন—হাড়পাকা যোদ্ধারা অর্থাৎ Veteran শ্রেণীর যোদ্ধারা সেইরূপ নিশ্চিন্ত মনে তোপের মুখে অগ্রসর হয়। ইহারই নাম Repose। সিংহ প্রকৃতির যোদ্ধাবীরদিগের যুদ্ধকার্যে এই যেমন এক প্রকার জাগ্রৎসুষুপ্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব এবং ঈসামহাপ্রভুর ন্যায় ধর্মবীরদিগের অন্তঃকরণে এবং আচার-ব্যবহারে তাহা অপেক্ষা তাহা আরো সুপরিস্ফুটভাবে বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভকালে ইহুদীদেশীয় ফারিসীদিগের অভিধানে ধর্মের নিশান ওড়ানোর নামই ছিল ধর্ম; কিন্তু ঈসা তাঁহার শিষ্যবর্গকে সম্মুখে জড়ো করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা যখন দান করিবে, তখন তোমাদের ডান হাত কি করিতেছে—বাঁ

হাত যেন তাহা জানিতে না পারে। প্রকৃত কথা এই যে, কোনোপ্রকার মঙ্গলের উদ্দেশে আত্মশক্তিকে বিধিমতে কার্যে খাটাইতে হইলে বুদ্ধিকে জাগ্রত করা সাধকের পক্ষে যেমন আবশ্যক, অশান্ত এবং দুর্দান্ত জনকে সুষুপ্তির শান্তিসলিলে অবগাহন করানোও তেমনি আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইতে পারে কেমন করিয়া? গীতাশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, মনুষ্যের অন্তরাত্মার সুনিভৃত প্রদেশে রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত সে এক মহাসত্তা পরমাত্মাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে—যাহা পরমাত্মার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া—যাহাকে কোন প্রকার দুঃখক্লেশও স্পর্শ করিতে পারে না—অশান্তিও স্পর্শ করিতে পারে না—জড়তাও স্পর্শ করিতে পারে না সেই নিত্য সত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মনুষ্যের মন অটল প্রশান্তি এবং স্থিরত্ব লাভ করে। ব্যাপারটি সামান্য নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ! তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে কত না প্রভূত পরিমাণে আত্মশক্তির পুঁজি সংগ্রহ করা আবশ্যক? অর্জুনের ধনুক যেমন বিশ্ববিজয়ী গাণ্ডীব ধনু, অর্জুনের তুণীর যেমন অক্ষয় তুণীর, অর্জুনের রথধ্বজা যেমন দুদ্ধর্ষ ভীষণ মহাকপি; অর্জুনের আধ্যাত্মিক রণসজ্জা তেমনি উহাদেরই সঙ্গে পাল্লা দিতে পরিবার মতো বিরাট ছাঁচের হওয়া চাই; অর্জুনের ধৈর্য্য-বীর্য হিমালয় পর্বতের ন্যায় অটল হওয়া চাই; অর্জুনের জ্ঞাননেত্র নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় স্বর্গমর্ত্যঅন্তরীক্ষের পরিষ্কার প্রতিবিম্ব-গ্রাহী দর্পণ হওয়া চাই; বিশেষত, অর্জুনকে, ব্রহ্মের আনন্দের সহিত পরিচিত হওয়া চাই; কেননা, উপনিষদে আছে 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—ন বিভেতি কদাচন' 'ব্রহ্মের আনন্দের সহিত যিনি পরিচিত হইয়াছেন তিনি কুত্রাপি ভয় প্রাপ্ত হন না—কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় অর্জুনকে এই সকল আধ্যাত্মিক ব্রহ্মাস্ত্রে সুসজ্জিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে এই রূপ উপদেশ দিতেছেন যে, যাহারা ত্রৈগুণ্যের সেবক তাহারা বেদাদি শাস্ত্রই জানে সার—তুমি অর্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও, নির্যোগক্ষেম হও, আত্মবান্ হও।

দশম অধিবেশনের ব্যাখ্যান
প্রথম প্রকাশ ১৩২২ সাল
(সংক্ষেপিত)

দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্‌পলং খাদত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

দুই সুন্দর পক্ষী—কিনা জীবাত্মা আর পরমাত্মা; পরমাত্মার সৌন্দর্যের আভা পাইয়া জীবাত্মা ও সুন্দর হইয়াছে। এই জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন—কিনা এক শরীর অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্বদা একত্র থাকেন; পরমাত্মা আর জীবাত্মা আশ্রয় আশ্রিতভাবে একত্রে আছেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের সখা-পরমাত্মা প্রেম দান করিয়া পালন করিতেছেন, জীবাত্মা সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিতেছেন; এইজন্য উভয়েই উভয়ের সখা। তন্মধ্যে একজন সুখেতে ফল ভোজন করেন, ঈশ্বরের উদার সদাব্রতে জীবাত্মা জীবনের সমুদয় কল্যাণ উপভোগ করেন; অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন, সাক্ষী-স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার আশ্রিত সন্তানদিগকে সুখে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া পিতা-মাতার ন্যায় পরিতৃপ্ত হয়েন। জীবাত্মা পরমাত্মার এইপ্রকার নিকট সম্বন্ধ; একজন ফলপ্রদাতা, একজন ফলভোক্তা। তাঁহার করুণা-বারিতে যে-সকল সুখ প্রচুররূপে বর্ষিত হইতেছে, জীবাত্মা তাহাতে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্বক ভোগ করিতেছে। সেই আশ্রয়দাতার আশ্রয়লাভে জীবাত্মা নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিতেছে। আত্মার স্বাধীনতা দেখ। ইহা কোনপ্রকারেই কাহারও অধীন হইতে চাহে না। স্বাধীনতাতে আত্মার যে-প্রকার সুখ, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। এখানে নানা ঘটনা, নানা অবস্থায় পড়িয়া যদিও তাহাকে অধীন হইতে হইতেছে, কিন্তু আত্মার অন্তরের ভাব স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা-সুখই তাহার সকল সুখ, পরের অধীনতাতেই তাহার সকল দুঃখ; কিন্তু দেখ, ঈশ্বরের অধীনে থাকায় আত্মার কেমন আনন্দ। যে আর কাহারো অধীন হইয়া থাকিতে চাহে না; কিন্তু ঈশ্বরের অধীনতা ব্যতীত থাকিতে পারে না; তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার দাস ও সেবক হইয়া থাকিতেই তাহার আনন্দ; তাঁহার ইচ্ছার অধীনে আপনার ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারে, এই তাহার মহত্ত্ব। আমাদের যে মুক্তির অবস্থা, যাহাতে আমাদের সংসার আকর্ষণ ও বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইবে, সে-অবস্থা প্রার্থনীয় কিসে? সে কেবল এই জন্য যে-সংসারের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন থাকিতে পারিব তাঁহার পদতলেই সর্বদা বিশ্রাম করিব-তাঁহার সেবক হইয়া তাঁহার

অর্চনা করিব—যাহাতে তাঁহার প্রিয় অভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, আনন্দের সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিব। যদি কেবল দুঃখ ক্লেশ ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি হয়—যদি সে-অবস্থাতে তাঁহার সেবা, তাঁহার উপাসনা, তাঁহার প্রিয়কার্য সাধনে আমাদের অধিকার না হয়, তবে এই উদাসীন অবস্থাতে আমাদের কি হইবে? ঈশ্বরের অধীন হওয়াতেই আত্মার আনন্দ; তাহার সেবক হওয়াতেই তাহার মহত্ত্ব। সকল হইতে তাহার উচ্চ অধিকার এই যে, সে তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার পূজা করিবার, তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিবার অধিকারী হইয়াছে।

যিনি আমারদিগের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, আমাদের জীবনদাতা, যাঁহার অধীন না হইয়া থাকিলে, যাঁহার দক্ষিণ মুখ না দেখিতে পাইলে, জীবন বৃথা হয়; তিনিই আমাদের সখা। তিনি আমাদিগকে প্রীতি করিতেছেন এবং তিনি আমাদের নিকট হইতে প্রীতি চাহেন; তিনি প্রেম দান করিয়া আমাদের প্রেম আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রীতি-নয়নে আমাদিগকে দেখিতেছেন, আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিছেন; আপনার দিকে তাহাকে লইয়া যাইতেছেন; আনন্দের উপর আনন্দে তাহাকে প্লাবিত করিতেছেন; আমরা তাঁহাকে প্রীতি দান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। অতএব জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ে উভয়ের সখা। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল সুখ লাভ করিতেছি, তাহারই সীমা করা যায় না; তবে জ্ঞান ধর্ম প্রীতির প্রস্রবণ হইতে আরো কত বিমল আনন্দ উৎসারিত হইতেছে, তাহার কে পরিমাণ করিবে। এই প্রেম, এই জ্ঞান, এই আনন্দের ক্রমাগতই উন্নতি হইবে, ইহা দেখিয়া কৃতজ্ঞতা মনে কি-প্রকারে ধারণ করিব? যদি আপনার জন্যই কৃতজ্ঞতা সীমাকে অতিক্রম করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তবে সকলের হইয়া যদি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে যাই, তবে বাক্য কি বলিবে? আপনার উপরেই ঈশ্বরের যে প্রেম, মঙ্গলদৃষ্টি অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে গিয়া বাক্য যদি নীরব হয়, মনে করিতে গিয়া মন যদি নিস্তব্ধ হয়, তবে অনন্ত লোক হইতে অনন্ত লোকে অসংখ্য জীবের উপর তাঁহার যে প্রেম ও করুণার বর্ষণ হইতেছে, তাহা কি প্রকারে মনে ধারণ করিব? এইক্ষণে আমরা সকলে ভ্রাতৃসৌহার্দভাবে মিলিত হইয়া, ঈশ্বরের যে উদার প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, এই সকলের হইয়া তাঁহাকে কি শব্দে, কি মনে, কি প্রকারে, ধন্যবাদ দিতে পারি?

আমরা এমন ক্ষুদ্র—দোষেতে গ্লানিতে আবৃত; তথাপি ঈশ্বর আমাদের সখা। আমাদের কি উচ্চ অধিকার! যিনি দেবতার দেবতা, রাজার রাজা,

তাঁহার দৃষ্টি আমাদের উপরে—কেবল তাঁহার দৃষ্টি আমাদের উপরে নয়; কিন্তু তিনি আমাদের সখা? মনুষ্যের মধ্যে কোন উচ্চপদের লোককে আমরা সখা বলিতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু সেই মহেশ্বরকে সখা বলিয়া ডাকিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। সেই দেব-দেব আমাদের সখা। তাঁহার প্রীতিতে আমাদের প্রীতিতে সম্মিলিত হইতেছে। তাঁহার অধীনে থাকিতে আমাদের আহ্লাদ—আমাদের নেতা হইতে তাঁহার ইচ্ছা। আমরা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সেবা করিতেছি, তিনি আমাদিগকে ভৃত্যের ন্যায় শোষণ করিতেছেন। যখন তাঁহাকে বলি, 'তুমি আমাদের প্রভু, আমাদের শরণ্য, আমাদের পূজনীয়; তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা'—যখন 'মহান প্রভুর্বৈপুরুষঃ' এই বাক্য উচ্চারণ করি, তখন সমুদয় আত্মা হইতেই সায় পাই। অন্তরে ঈশ্বরের ভাব না থাকিলে, কথাতে ভাবেতে এ-প্রকার কখনই মিলিতে পারে না। যাহারা অহর্নিশি সাংসারিক সুখেই উন্মত্ত থাকে, তাহাদেরও কর্ণ-পথে যদি এই মহাবাক্য যায় 'সর্বস্য শরণং সুহৃৎ' তবে এই শব্দ শুনিবামাত্রই তাহাদের অন্তরের ভাব তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া ওঠে। দেখ আত্মাতে-পরমাত্মাতে কেমন যোগ! যদিও মহামোহে মুগ্ধ থাকি, তথাপি তাঁহার নাম শুনিবামাত্র সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতেও বিদ্যুৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আত্মার সঙ্গে তাঁহার যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা মুখে বলা যায় না। পরমাত্মার সহবাসেই যাঁহার জীবন, তাঁহার কত আনন্দ! ঘোর বিষয়ীর পাষাণ মনও ঈশ্বরের নামে যদি দ্রব হয়; তবে সেই অমৃতসাগরে যাঁহারা সর্বদাই অবগাহন করিতেছেন, তাঁহাদের আত্মার কি উজ্জ্বল ভাব! যাঁহারা সেই সূর্যকিরণে নিরন্তর রহিয়াছেন—সেই মঙ্গল ছায়াতে নিয়ত বাস করিতেছেন সেই মলয়বায়ুর হিল্লোল সর্বদা সেবন করিতেছেন, তাঁহাদের ভাব কি-প্রকার? তাঁহাদের নিকট এই মর্ত্যলোকই ব্রহ্মলোক, তাঁহার 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। বিষয়েই যাঁহারা মুগ্ধ, তাঁহারা এইসকল মহাত্মার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনাদিগকে শোধন করুন। তাঁহার নানা দুঃখ, নানা যন্ত্রণা পাইয়া তাহার ঔষধ চিন্তা করুন। ঈশ্বর বিপদ প্রেরণ করেন, দণ্ড বিধান করেন, এইজন্য যে, আমরা তাঁহার সৎপথে ফিরিয়া আসি, ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমাকে ভুলিয়া থাকিও না; আমার অজস্র দান উপভোগ কর, কিন্তু আমাকে শরণ করিয়া রহ। এই সমস্ত জগতের যাবদীয় সম্পদের এমন ক্ষমতা নাই যে, তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইবার ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। সমুদয় ত্রিভুবনে এমন আনন্দ নাই যে, তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইবার দুঃখ বিমোচন করিতে পারে। তিনি বিষয়ে

তৃপ্তি দেন নাই, ইহারই জন্য যে, বিষয়ে তৃপ্ত থাকিলে আমারা তাঁহার পবিত্র আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিব না। এইজন্যই তিনি এখানে সুখের সঙ্গে দুঃখ, সম্পদের সঙ্গে বিপদ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমরা সেই নিরাপদ স্থানকে অবলম্বন করিতে যত্ন করি। সংসার-কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হইলে আমরা তাঁহার অমৃত আশ্রয় প্রার্থনা করি। সংসারানলে দীপ্তশিরা হইলে তাঁহার শীতল বারির নিমিত্ত ধাবিত হই। আত্মার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে বিষয়-লালসা যেমন ক্ষীণ হইতে থাকে, ব্রহ্মানন্দ তত অধিক হয়। তখন ঈশ্বরের কার্যের জন্যই সংসার, আপনার ভোগের জন্য ঈশ্বর। আমরা এক্ষণে সেই সখার সঙ্গেই একত্রে আছি—তাঁহাকে প্রেমাশ্রু উপহার দেও, মনের সহিত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ কর। তাঁহাকে সর্বস্ব দান করিয়া জীবনকে সার্থক কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

১৩৫১ বঙ্গাব্দ

ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান

স্বামী বিবেকানন্দ

মুক্তি

যে-কোন কার্য বা যে-কোন চিন্তা কোন কিছু ফল উৎপন্ন করে, তাহাকেই কর্ম বলে। সুতরাং 'কর্মবিধানে'র অর্থ কার্য-কারণের নিয়ম—অর্থাৎ কারণ ও কার্যের অনিবার্য সম্বন্ধ। আমাদের (ভারতীয়) 'দর্শনে'র মতে এই 'কর্মবিধান' সমগ্র বিশ্ব-জগতের পক্ষেই সত্য। যাহা কিছু আমরা দেখি, অনুভব করি, অথবা যে-কোন কাজ করি—বিশ্ব-জগতে যাহা কিছু কাজ হইতেছে—সবই একদিকে পূর্বকর্মের ফল মাত্র, আবার অপর দিকে এগুলিই কারণ হইয়া অন্য ফল উৎপাদন করে। এই সঙ্গে বিচার করা আবশ্যক 'বিধি' বা 'নিয়ম' বলিতে কি বুঝায়। ঘটনা শ্রেণীর পুনরাবর্তনের প্রবণতার নামই নিয়ম বা বিধি। যখন আমরা দেখি, একটি ঘটনার পরেই আর একটি ঘটনা ঘটিতেছে, কখনও বা ঘটনা দুইটি যুগপৎ ঘটিতেছে, তখন আমরা আশা করি, সর্বদাই এরূপ ঘটিবে। আমাদের দেশের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ইহাকে 'ব্যাপ্তি' বলিতেন। তাঁহাদের মতে নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের সমুদয় ধারণার কারণ 'অনুষঙ্গ'। ঘটনাপরম্পরা আমাদের মনে অনুভূত বিষয়গুলির সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ভাবে জড়িত থাকে। সেইজন্য যখনই আমরা কোন বিষয় অনুভব করি, তখনই মনের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয় গুলির সহিত ইহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটি ভাব অথবা আমাদের মনোবিজ্ঞান অনুসারে চিত্তে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ সর্বদাই অনেক সদৃশ তরঙ্গ উৎপন্ন করে। মনোবিজ্ঞানে ইহাকেই 'ভাবানুষঙ্গ-বিধান' বলে, আর 'কার্য কারণ-সম্বন্ধ' এই ব্যাপক বিধানের একটি দিকমাত্র। ভাবানুষঙ্গের এই ব্যাপকতাকেই সংস্কৃতে 'ব্যাপ্তি' বলে। অন্তর্জগতে যেমন, বহির্জগতেও তেমনি বিধান বা নিয়মের ধারণা একই প্রকার ; একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটিবে —তাহা এবং ঘটনাপরম্পরা বার-বার ঘটিতে থাকিবে, আমরা এইরূপই আশা করি। তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ম প্রকৃতিতে নাই। কার্যতঃ ইহা বলা ভুল যে, মধ্যাকর্ষণ পৃথিবীতে আছে, অথবা প্রকৃতির কোন স্থলে বস্তুগত ভাবে কোন নিয়ম আছে। যে-প্রণালীতে আমাদের মন কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরা ধারণা করে, সেই প্রণালীই নিয়ম ; এই নিয়ম আমাদের মনে অবস্থিত। কতকগুলি ঘটনা একটির পর আর একটি অথবা একটি অথবা একসঙ্গে সংঘটিত হইলে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা হয়, ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে পুনঃপুনঃ এই রূপ ঘটিবে ; ঘটনাপরম্পরা কিভাবে সংঘটিত হইতেছে, আমাদের মন এই ভাবেই তাহা ধরিতে পারে। ইহাকে বলা হয় নিয়ম।

এখন জিজ্ঞাস্য, 'নিয়ম সর্বব্যাপক' বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের জগৎ অনন্ত সত্তার সেইটুকু অংশ, যাহাকে আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞান-বিদ্‌গণ 'দেশ-কাল-নিমিত্ত' বলেন এবং ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানে যাহা স্থান, কাল ও কারণ (**space, time, causation**) বলিয়া পরিচিত। এই জগৎ সেই অনন্ত সত্তার এতটুকু অংশমাত্র, একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা, দেশ-কাল-নিমিত্তে গঠিত। এইরূপে ছাঁচে ঢালা অস্তিত্ব-সমষ্টির নামই আমাদের জগৎ। অপরিহার্যভাবে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নিয়ম কেবল এই 'কার্য-কারণ-নিয়ন্ত্রিত' জগতের মধ্যেই সম্ভব, ইহার বাহিরে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না, যখন আমরা এই জগতের কথা বলি, তখন আমরা বুঝি, অস্তিত্বের যে-অংশটুকু আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, যে-ইন্দ্রিয়-গোচর জগৎ আমরা অনুভব করি, স্পর্শ করি, দেখি, শুনি, চিন্তা করি এবং কল্পনা করি, সেইটুকুই কেবল নিয়মাধীন; কিন্তু ইহার বাহিরের সত্তা নিয়মের অধীন নয়, যেহেতু কার্য-কারণ-ভাব আমাদের মনোজগতের বাহিরে আর যাইতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয় মনের অতীত কোন বস্তুই এই কার্য-কারণ-নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নয় কারণ ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে বিভিন্ন বস্তুর ভাবানুষঙ্গ-সম্বন্ধ নাই, এবং ভাব-সম্বন্ধ ব্যতীত কার্য-কারণ-সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। নাম-রূপের ছাঁচের মধ্যে পড়িলেই সত্তা বা চৈতন্য কার্য-কারণ-নিয়ম মানিয়া চলেন এবং তখনই বলা হয় উহা নিয়মের অধীন, যেহেতু কার্য-কারণ-সম্বন্ধই সকল নিয়মের মূল। এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; ঐ শব্দগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ, কারণ ইচ্ছা জ্ঞানের অন্তর্গত এবং যাহা কিছু আমরা জানি সে-সবই আমাদের জগতের অন্তর্গত। আবার জগতের অন্তর্গত সবকিছুই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে ঢালা। যাহা কিছু আমরা জানি বা যাহা কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব, সবই কার্য-কারণের অধীন; এবং যাহা কিছু কার্য-কারণ-নিয়মের অধীন, তাহা কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। অন্যান্য বস্তু ইহার উপর ক্রিয়া করে এবং ইহাও আবার অপরের কারণ হয়, এই রূপ চলিতেছে। যাহা পূর্বে 'ইচ্ছা' ছিল না, কিন্তু ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, যাহা এই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে পড়িয়া মানুষের ইচ্ছারূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা মুক্তস্বভাব; আর যখন এই ইচ্ছা কার্য-কারণ-চক্র হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তখন আবার স্বাধীন বা মুক্ত হইবে। স্বাধীনতা বা মুক্তি হইতেই উহা আসে, এই বন্ধনের ছাঁচে পড়ে এবং বাহির হইয়া আবার মুক্ত হয়।

প্রশ্ন উঠিয়াছিল, জগৎ কোথা হইতে আসে, কোথায় অবস্থান করে এবং

কিসেই বা লীন হয়? উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছে—মুক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি, বন্ধনে ইহার স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই প্রত্যাবর্তন। সুতরাং যখন আমরা বলি, মানুষ সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশ, তখন বুঝিতে হইবে সেই সত্তার অতি ক্ষুদ্র অংশ মানুষ। এই দেহ ও এই মন—যাহা আমরা দেখিতেছি, এগুলি সমগ্রের অংশমাত্র, সেই অনন্ত পুরুষের একটি বিন্দুমাত্র। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই সেই অনন্ত পুরুষের একটি কণামাত্র। আর আমাদের সকল নিয়ম ও বন্ধন, আনন্দ ও বিষাদ, আমাদের সুখ ও আশা—সবই এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে। আমাদের উন্নতি ও অবনতি সবই এই ক্ষুদ্র জগতে সীমাবদ্ধ। অতএব দেখিতেছ, আমাদের মনের সৃষ্টি এই ক্ষুদ্র জগৎ চিরকাল থাকিবে—এরূপ আশা করা এবং স্বর্গে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করা কি ছেলেমানুষি! স্বর্গের অর্থ—আমাদের পরিচিত এই জগতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। স্পষ্টই দেখিতেছ, অনন্ত সত্তাকে আমাদের সীমাবদ্ধ জগতের অনুরূপ করিতে চেষ্টা করা কি ছেলেমানুষি ও অসম্ভব বাসনা! অতএব যখন মানুষ বলে, সে এইভাবেই চিরদিন থাকিবে, এখন যাহা লইয়া আছে, তাহা লইয়াই চিরদিন থাকিবে, অথবা আমি যেমন কখন-কখন বলি, যখন মানুষ 'আরামের ধর্ম' চায়, তখন তোমরা নিশ্চয় জানিও—তাহার এত অবনতি হইয়াছে যে, সে বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা উন্নতর কিছুই ধারণা করিতে পারে না; সে নিজের অনন্ত স্বরূপ ভুলিয়াছে; তাহার সমগ্র চিন্তা এইসব ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ এবং সাময়িক ঈর্ষায় আবদ্ধ। সেই সান্ত জগৎকেই সে অনন্ত বলিয়া মনে করে। শুধু তাই নয়, সে এই মূর্খতা কোন মতে ছাড়িবে না। সে প্রাণ-পণে 'তৃষ্ণা'কে জীবন-বাসনাকে আঁকড়াইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা ইহাকে 'তণ্‌হা' বা 'তিস্‌সা' বলে।

আমাদের জ্ঞাত ক্ষুদ্র জগতের বাহিরে অসংখ্যপ্রকার সুখ-দুঃখ, অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য বিধি, অসংখ্যপ্রকার উন্নতি এবং অসংখ্য প্রকার কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু এ-সবই আমাদের অনন্ত প্রকৃতির এক অংশ মাত্র।

মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে; এখানে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা খ্রীষ্টানরা যাহাকে 'বুদ্ধির অতীত শান্তি' বলিয়া থাকেন, তাহা এই জগতে পাওয়া যাইতে পারে না—স্বর্গেও নয়, অথবা এমন কোন স্থানেও নয়, যেখানে আমাদের চিন্তাশক্তি ও মন যাইতে পারে, যেখানে ইন্দ্রিয়গণ অনুভব করিতে পারে, অথবা কল্পনা-শক্তি যাহা কল্পনা করিতে পারে—এরূপ কোন স্থানেই সেই মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে না, কারণ এ-সকল স্থান অবশ্যই আমাদের জগতের অন্তর্গত হইবে

এবং সেই জগৎ দেশ কাল নিমিত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্মতর স্থান থাকিতে পারে যেখানে ভোগ তীব্রতর, কিন্তু সে-সকল স্থানও জগতের অন্তর্গত, সুতরাং নিয়মের বন্ধনের ভিতর; অতএব আমাদিগকে এ-সকলের বাহিরে যাইতে হইবে এবং যেখানে এই ক্ষুদ্র জগতের শেষ, সেখানেই প্রকৃত ধর্মের আরম্ভ। এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আনন্দ, বিষাদ ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান সবই সেখানে শেষ হইয়া যায় এবং প্রকৃত সত্য আরম্ভ হয়। যতদিন না আমরা জীবনের জন্য এই তৃষ্ণা বিসর্জন দিতে পারি, যতদিন না এই ক্ষণস্থায়ী সত্তার প্রতি প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি, ততদিন জগতের অতীত সেই অনন্ত মুক্তির এতটুকু আভাসও পাইবার আশা আমাদের নাই। অতএব ইহা যুক্তিসঙ্গত যে, মনুষ্যজাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য 'মুক্তি' লাভ করিবার একটি মাত্র উপায় আছে, সে উপায়—এই ক্ষুদ্র জীবন, এই ক্ষুদ্র জগৎ, এই পৃথিবী, এই স্বর্গ, এই শরীর এবং যাহা কিছু সীমাবদ্ধ,—সব ত্যাগ করা। যদি আমরা ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জগৎ ত্যাগ করিতে পারি, তবে আমরা এখনই মুক্ত হইব। বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়—সমুদয় নিয়মের বাহিরে যাওয়া, কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের বাহিরে যাওয়া; আর যেখানেই এই জগৎ আছে, সেখানেই কার্য-কারণ-শৃঙ্খল বর্তমান।

কিন্তু এই জগতের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অতি অল্প লোকেই এই আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে আসক্তি ত্যাগের দুইটি উপায় কথিত হইয়াছে। একটিকে বলে নিবৃত্তিমার্গ—উহাতে 'নেতি নেতি' (ইহা নয় ইহা নয়) করিয়া সব ত্যাগ করিতে হয়; আর একটিকে বলে প্রবৃত্তিমার্গ—উহাতে 'ইতি ইতি' করিয়া সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া তাহার পর ত্যাগ করা হয়। নিবৃত্তিমার্গ অতি কঠিন। উহা কেবল উন্নতমনা অসাধারণ প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহারা শুধু বলেন, 'না, আমি ইহা চাই না'; শরীর ও মন তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করে, এবং তাঁহারা সাফল্যমণ্ডিত হন। কিন্তু এরূপ মানুষ অতিবিরল। অধিকাংশ লোক তাই প্রবৃত্তিমার্গ—সংসারেরই পথ বাছিয়া লয়; এবং বন্ধনগুলিকেই ঐ বন্ধন ভাঙিবার উপায়রূপে ব্যবহার করে। ইহাও একপ্রকার ত্যাগ, তবে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ত্যাগ করা হয়। সমস্ত পদার্থকে জানিয়া, ভোগ করিয়া, এইরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, সংসারের সকল বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইয়া মন অবশেষে ঐগুলি ছাড়িয়া দেয় এবং অনাসক্ত হয়। অনাসক্তি-লাভের প্রথমোক্ত মার্গের সাধন—বিচার, আর শেষোক্ত পথের সাধন—কর্ম ও অভিজ্ঞতা।

প্রথমটি জ্ঞান-যোগের পথ, কোনপ্রকার কর্ম করিতে অস্বীকার করাই এ-পথের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়টি কর্মযোগের পথ, এ-পথে কর্মের বিরতি নাই। এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ম করিতে হইবে। কেবল যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, যাঁহারা আত্মা ব্যতীত আর কিছুই চান না, যাঁহাদের মন কখনও আত্মা হইতে অন্যত্র গমন করে না, আত্মাই যাঁহাদের সর্বস্ব, শুধু তাঁহারাই কর্ম করিবেন না। অবশিষ্ট সকলকেই অবশ্যই কর্ম করিতে হইবে।

একটি জলস্রোত স্বচ্ছন্দগতিতে নামিতেছে। একটি গর্তের ভিতর পড়িয়া ঘূর্ণিরূপে পরিণত হইল; সেখানে কিছুকাল ঘুরিবার পর উহা আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বাহির হইয়া দুর্বার বেগে প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক মনুষ্যজীবন এই প্রবাহের মতো। উহাও ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে। নাম রূপাত্মক জগতের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খায়, কিছুক্ষণ। আমার পিতা, আমার মাতা, আমার নাম, আমার যশ প্রভৃতি বলিয়া চিৎকার করে, অবশেষে বাহির হইয়া নিজের মুক্ত-ভাব ফিরিয়া পায়। সমুদয় জগৎ ইহাই করিতেছে, আমরা জানি বা নাই জানি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই জগৎরূপ স্বপ্ন হইতে বাহির হইবার জন্য কাজ করিতেছি। সংসার আবর্ত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্যই মানুষের এই সাংসারিক অভিজ্ঞতা।

কর্মযোগ কি? কর্মরহস্য অবগত হওয়াই কর্মযোগ। আমরা দেখিতেছি সমুদয় জগৎ কর্ম করিতেছে। কিসের জন্য? মুক্তির জন্য, স্বাধীনতা লাভের জন্য। পরমাণু হইতে মহোচ্চ প্রাণী পর্যন্ত সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই এক উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া চলিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য—মনের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা। সকল বস্তুই সর্বদা মুক্তিলাভ করিতে এবং বন্ধন হইতে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী গ্রহ—সকলেই বন্ধন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র জগৎটাকে এই কেন্দ্রানুগা ও কেন্দ্রাতিগা শক্তিদ্বয়ের ক্রীড়াভূমি বলা যাইতে পারে। কর্মযোগ আমাদিগকে কর্মের রহস্য—কর্মের প্রণালী শিখাইয়া দেয়। এই জগতে চতুর্দিকে কেবল ধাক্কা না খাইয়া, অনেক বিলম্বে অনেক বিচার বিবেকের পর প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ জানিয়া আমরা কর্মযোগ হইতে কর্মের রহস্য, কর্মের প্রণালী এবং কর্মের সংগঠনী শক্তি শিক্ষা করি। ব্যবহার করিতে না জানিলে আমাদের বিপুল শক্তি বৃথা নষ্ট হইতে পারে। কর্মযোগ কাজ করাকে একটি রীতিমতো বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছে, এই বিদ্যা দ্বারা জানিতে পারিবে, এই জগতের সকল কর্মের সদ্ব্যবহার কিভাবে করিতে হয়। কর্ম করিতেই হইবে, ইহা অপরিহার্য—কিন্তু

উচ্চতম উদ্দেশ্যে কর্ম কর, কর্মযোগের সাধনায় আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই জগৎ পাঁচ মিনিটের জন্য, এবং ইহার মধ্য দিয়াই আমাদের চলিতে হইবে; আরও স্বীকার করিতে হয় যে, এখানে মুক্তি নাই, মুক্তি পাইতে হইলে আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে। জগতের বন্ধনের বাহিরে যাইবার এই পথ পাইতে হইলে আমাদিগকে ধীরে নিশ্চিতভাবে ইহার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। এমন সব অসাধারণ মহাপুরুষ থাকিতে পারেন, যাঁহাদের বিষয় আমি এইমাত্র বলিলাম, তাঁহারা একেবারে জগতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে ত্যাগ করিতে পারেন—যেমন সর্প উহার ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইতে দেখিয়া থাকে। এইসব অসাধারণ মানুষ কয়েকজন আছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অবশিষ্ট মানবগণকে ধীরে-ধীরে কর্মময় জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। অল্প-অল্প নিয়োগ করিয়া অধিক ফল লাভ করিবার প্রণালী রহস্য ও উপায় দেখাইয়া দেয় কর্মযোগ। কর্মযোগ কি বলে?—বলে, 'নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু কর্মে আসক্তি ত্যাগ কর।' কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইও না। মনকে মুক্ত রাখো। যাহা কিছু দেখিতেছ, দুঃখ-কষ্ট সবই জগতের অপরিহার্য পরিবেশ মাত্র; দারিদ্র্য ধন ও সুখ ক্ষণস্থায়ী, উহারা মোটেই আমাদের স্বভাবগত নয়। আমাদের স্বরূপ দুঃখ ও সুখের পারে—প্রত্যক্ষ বা কল্পনার অতীত; তথাপি আমাদিগকে সর্বদাই কর্ম করিয়া যাইতে হইবে। 'আসক্তি হইতেই দুঃখ আসে, কর্ম হইতে নয়।'

যখনই আমরা কর্মের সহিত নিজেদের অভিন্ন করিয়া ফেলি, তখনই আমরা দুঃখ বোধ করি কিন্তু কর্মের সহিত ঐরূপ এক না হইয়া গেলে সেই দুঃখ অনুভব করি না। কাহারও একখানি সুন্দর ছবি পুড়িয়া গেলে সাধারণতঃ অপর এক-জনের কোন দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন তাহার নিজের ছবিখানি পুড়িয়া যায়, তখন সে কত দুঃখ বোধ করে! কেন? দুইখানিই সুন্দর ছবি, হয়তো একই মূলছবির নকল, কিন্তু একক্ষেত্র অপেক্ষা অন্যক্ষেত্রে অতি দারুণ দুঃখ অনুভূত হয়। ইহার কারণ—এককক্ষেত্রে মানুষ ছবির সহিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অপর ক্ষেত্রে তাহা করে নাই। এই 'আমি ও আমার, ভাবই সকল দুঃখের কারণ। অধিকারের ভাব হইতেই স্বার্থ আসে এবং স্বার্থপরতা হইতেই দুঃখ আরম্ভ। প্রতিটি স্বার্থপর কার্য বা চিন্তা আমাদিগকে কোন-না-কোন বিষয়ে আসক্ত করে, এবং আমরা সঙ্গে-সঙ্গে সেই বস্তুর দাস হইয়া যাই। চিত্তের যে-কোন তরঙ্গ 'আমি ও আমার' ভাব উত্থিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করে, যতই আমরা 'আমি ও

আমার' বলি, ততই দাসত্ব বাড়িতে থাকে, ততই দুঃখও বাড়িতে থাকে। অতএব কর্মযোগ বলে জগতে যত ছবি আছে, সবগুলির সৌন্দর্য উপভোগ কর, কিন্তু কোনটির সহিত নিজেকে এক করিয়া ফেলিও না; 'আমার' কখনও বলিও না। আমরা যখনই বলি, 'এটি আমার', তখনই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিবে। 'আমার সন্তান' এ-কথা মনে-মনেও বলিও না; ছেলেকে আদর কর, তাহাকে নিজ আয়ত্তে রাখো, কিন্তু 'আমার' বলিও না। 'আমার' বলিলেই দুঃখ আসিবে। 'আমার বাড়ি', 'আমার শরীর' এরূপও বলিও না। এইখানেই মুশকিল। এই শরীর তোমারও নয়, আমারও নয়, কাহারও নয়। এগুলি প্রকৃতির নিয়মে আসিতেছে, যাইতেছে; কিন্তু আমরা মুক্ত—সাক্ষিস্বরূপ। একখানি ছবি বা দেওয়ালের যতটুকু স্বাধীনতা আছে, শরীরের তদপেক্ষা বেশি নাই। একটা শরীরের প্রতি আমরা এত আসক্ত হইব কেন? যদি কেহ একখানি ছবি আঁকে, সেটি শেষ করিয়া অন্যটিতে হাত দেয়। 'আমি উহা অধিকার করিব'—বলিয়া স্বার্থজাল বিস্তার করিও না। যখনই এই স্বার্থজাল বিস্তৃত হয়, তখনই দুঃখের আরম্ভ।

অতএব কর্মযোগে বলা হয়: প্রথমে এই স্বার্থপরতার জাল বিস্তার করিবার প্রবণতা বিনষ্ট কর, যখন উহা দমন করিবার শক্তি লাভ করিবে, তখন মনকে আর স্বার্থপরতার তরঙ্গে পরিণত হইতে দিও না। তারপর সংসারে গিয়া যত পারো কর্ম কর, সর্বত্র গিয়া মেলামেশা কর, যেখানে ইচ্ছা যাও, মন্দের স্পর্শ তোমাকে কখনই দূষিত করিতে পারিবে না। পদ্মপত্র জলে রহিয়াছে, জল যেমন কখনও উহাতে লিপ্ত হয় না, তুমিও সেইভাবে সংসারে থাকিবে; ইহাই বৈরাগ্য বা অনাসক্তি। মনে হয়, তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, অনাসক্তি ব্যতীত কোনপ্রকার 'যোগ'ই হইতে পারে না। অনাসক্তি সকল যোগেরই ভিত্তি। যে-ব্যক্তি গৃহে বাস, উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং সুখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমিতে গিয়া থাকে, সে অতিশয় আসক্ত হইতে পারে। তাহার এক মাত্র সম্বল নিজের শরীর তাহার নিকট সর্বস্ব হইতে পারে ক্রমশঃ তাহাকে তাহার দেহের জন্যই প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইবে। অনাসক্তি বাহিরের শরীরকে লইয়া নয়, অনাসক্তি মনে। 'আমি ও আমার' এই বন্ধনের শৃঙ্খল মনেই রহিয়াছে। যদি শরীরের সহিত এবং ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহের সহিত এই যোগ না থাকে, তবে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যাহাই হই না কেন, আমরা অনাসক্ত,—একজন সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইতে পারে, আর একজন হয়তো ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত হইয়াই ভয়ানক

আসক্ত। প্রথমে আমাদিগকে এই অনাসক্ত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। যে-কর্মপ্রণালী আমাদিগকে সর্বপ্রকারে আসক্তি ত্যাগ করিতে সাহায্য করে, কর্মযোগ আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া দেয়। অবশ্য ইহা অতি কঠিন।

সকল আসক্তি ত্যাগ করিবার দুইটি উপায় আছে। একটি—যাহারা ঈশ্বরে অথবা বাহিরের কোন সহায়তায় বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য। তাহারা নিজেদের কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে। তাহাদিগকে নিজেদেরই ইচ্ছা-শক্তি, মনঃশক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে হইবে—তাহাদিগকে জোর করিয়া বলিতে হইবে, 'আমি নিশ্চয় অনাসক্ত হইব'। অন্যটি—যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহারা কর্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া কাজ করিয়া যান, সুতরাং কর্মফলে আসক্ত হন না। তাঁহারা কাজ কিছু দেখেন, অনুভব করেন, শোনেন বা করেন, সবই ভগবানের জন্য। আমরা যে-কোন ভালো কাজ করি না কেন, তাহার জন্য যেন আমরা মোটেই কোন প্রশংসা বা সুবিধা দাবি না করি। উহা প্রভুর, সুতরাং কর্মের ফল তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমাদিগকে একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইবে, আমরা প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, এবং আমাদের প্রত্যেক কর্ম-প্রবৃত্তি প্রতি-মুহূর্তে তাঁহা হইতেই আসিতেছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥[১]

—'যাহা কিছু কাজ কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু পূজা হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সবই আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অর্পণ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান কর'। আমরা নিজেরা যেন সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকি এবং আমাদের শরীর মন ও সবকিছু ভগবানের উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য বলি প্রদত্ত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া যজ্ঞ করিবার পরিবর্তে অহোরাত্র এই ক্ষুদ্র 'অহং'কে আহুতি-দানরূপ মহাযজ্ঞ কর।

'জগতে ধন অন্বেষণ করিতে গিয়া একমাত্র ধনস্বরূপ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমারই চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম। জগতে একজন প্রেমাস্পদ খুঁজিতে গিয়া একমাত্র প্রেমাস্পদ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম।' দিবারাত্র আবৃত্তি করিতে হইবে: আমার জন্য কিছুই নয়; কোন বস্তু শুভ, অশুভ বা নিরপেক্ষ—যাহাই হউক না কেন, আমার পক্ষে সবই সমান; আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না, আমি সবই তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম।

দিবারাত্র এই আপাত প্রতীয়মান 'অহং' ভাব ত্যাগ করিতে হইবে, যে-পর্যন্ত না ঐ ত্যাগ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যে-পর্যন্ত না উহা শিরায়-শিরায়, মজ্জায় ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সমগ্র শরীরটি প্রতি মুহূর্তে ঐ আত্মত্যাগ রূপ ভাবের অনুগত হইয়া যায়। মনের এরূপ অবস্থায় কামানের গর্জন ও কোলাহলপূর্ণ রণক্ষেত্রে গমন করিলেও অনুভব করিবে, তুমি মুক্ত ও শান্ত।

কর্মযোগ আমাদিগকে শিক্ষা দেয় কর্তব্যের সাধারণ ভাব কেবল নিম্ন-ভূমিতেই বর্তমান; তথাপি আমাদের প্রত্যেককেই কর্তব্যকর্ম করিতে হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই অদ্ভুত কর্তব্যবোধ অনেক সময় আমাদের দুঃখের একটি বড় কারণ। কর্তব্য আমাদের পক্ষে রোগবিশেষ হইয়া পড়ে এবং আমাদিগকে সর্বদা টানিয়া লইয়া যায়। কর্তব্য আমাদিগকে ধরিয়া রাখে এবং আমাদের সমগ্র জীবনটাই দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলে। ইহা মনুষ্যজীবনের ধ্বংসের কারণ, এই কর্তব্য—এই কর্তব্যবুদ্ধি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সূর্য; উহা মানুষের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিয়া দেয়। এইসব কর্তব্যের হতভাগ্য ক্রীতদাসদের দিকে ঐ চাহিয়া দেখ! কর্তব্য—বেচারাদের ভগবানকে ডাকিবার অবকাশটুকুও দেয় না, স্নানাহারের সময় পর্যন্ত দেয় না? কর্তব্য যেন সর্বদাই তাহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে। তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আবার পরদিনের কর্তব্যের কথা চিন্তা করে; কর্তব্যের হাত হইতে মুক্তি নাই! এ-তো ক্রীতদাসের জীবন—অবশেষে ঘোড়ার মতো গাড়িতে জোতা অবস্থায় ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পথেই পড়িয়া গিয়া মৃত্যুবরণ! কর্তব্য বলিতে লোকে এইরূপই বুঝিয়া থাকে! অনাসক্ত হওয়া, মুক্ত পুরুষের ন্যায় কর্ম করা এবং সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করাই আমাদের একমাত্র প্রকৃত কর্তব্য। আমাদের সকল কর্তব্যই ঈশ্বরের। আমরা যে জগতে প্রেরিত হইয়াছি, সেজন্য আমরা ধন্য। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া যাইতেছি, কে জানে, ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি? ভালভাবে কর্ম করিলেও আমরা ফল ভোগ করিব না, মন্দভাবে করিলেও চিন্তান্বিত হইব না। শান্ত ও মুক্ত ভাবে কাজ করিয়া যাও। এই মুক্ত অবস্থা লাভ করা বড় কঠিন। দাসত্বকে কর্তব্য বলিয়া, দেহের প্রতি দেহের অস্বাভাবিক আসক্তিকে কর্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা কত সহজ। সংসারে মানুষ টাকার জন্য বা অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করে, চেষ্টা করে এবং আসক্ত হয়। জিজ্ঞাসা কর, কেন তাহারা উহা করিতেছে, তাহারা বলিবে, ইহা আমাদের কর্তব্য,' বাস্তবিক উহা কাঞ্চনের জন্য অস্বাভাবিক তৃষ্ণামাত্র। এই তৃষ্ণাকে তাহারা কতকগুলি ফুল দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

তবে শেষপর্যন্ত কর্তব্য বলিতে কি বুঝায়? উহা কেবল দেহ-মনের আবেগ আসক্তির তাড়না। কোন আসক্তি বদ্ধমূল হইয়া গেলেই আমরা তাহাকে কর্তব্য বলিয়া থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ: যেসব দেশে বিবাহ নাই, সেসব দেশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কর্তব্য নাই। সমাজে যখন বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়, তখন স্বামী ও স্ত্রী আসক্তিবশতঃ একত্র বাস করে। পুরুষানুক্রমে এরূপ থাকার পর একত্র বাস করা রীতিতে পরিণত হয়, তখন উহা কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। বলিতে গেলে ইহা একপ্রকার পুরাতন ব্যাধি। রোগ যখন প্রবলাকারে দেখা দেয়, তখন আমরা উহাকে 'ব্যারাম' বলি; যখন উহা স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়, উহাকে আমরা 'স্বভাব' বলিয়া থাকি। যাহাই হউক, উহা রোগ-মাত্র। আসক্তি যখন প্রকৃতিগত হইয়া যায়, তখন উহাকে 'কর্তব্য'রূপ আড়ম্বরপূর্ণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমরা উহার উপর ফুল ছড়াইয়া দিই, তদুপলক্ষে তুরীভেরীও বাজানো হয়, উহার জন্য শাস্ত্র হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। তখন সমগ্র জগৎ ঐ কর্তব্যের অনুরোধে সংগ্রামে মত্ত হয়, এবং মানুষ পরস্পরের দ্রব্য আগ্রহ সহকারে অপহরণ করিতে থাকে।

কর্তব্য এই হিসাবে কতকটা ভাল যে, উহাতে পশুভাব কিছুটা সংযত হয়। যাহারা অতিশয় নিম্নাধিকারী, যাহারা অন্য কোনরূপ আদর্শ ধারণা করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে কর্তব্য কিছুটা ভাল বটে; কিন্তু যাঁহারা কর্মযোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে কর্তব্যের ভাব একেবারে দূর করিয়া দিতে হইবে। তোমার আমার পক্ষে কোন কর্তব্যই নাই। জগৎকে যাহা দিবার আছে অবশ্যই দাও, কিন্তু কর্তব্য বলিয়া নয়। উহার জন্য কোন চিন্তা করিও না। বাধ্য হইয়া কিছু করিও না। বাধ্য হইয়া কেন করিবে? বাধ্য হইয়া যাহা কিছু কর, তাহা দ্বারাই আসক্তি বর্ধিত হয়। কর্তব্য বলিয়া তোমার কিছু থাকিবে কেন? 'সবই ঈশ্বরে সমর্পণ কর'। এই সংসার রূপ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় কটাহে—যেখানে কর্তব্যরূপ অনল সকলকে দগ্ধ করিতেছে, সেখানে এই অমৃত পান করিয়া সুখি হও। আমরা সকলেই শুধু তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতেছি, পুরস্কার বা শাস্তির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদি পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত তোমাকেও শাস্তি লইতে হইবে। শাস্তি এড়াইবার একমাত্র উপায়—পুরস্কার ত্যাগ করা। দুঃখ এড়াইবার একমাত্র উপায়—সুখের ভাবও ত্যাগ করা, কারণ উভয়ে একসূত্রে গ্রথিত। একদিকে সুখ, আর একদিকে দুঃখ। একদিকে জীবন, অপরদিকে মৃত্যু। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার উপায়—জীবনের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করা।

জীবন ও মৃত্যু একই জিনিস, শুধু বিভিন্ন দিক হইতে দেখা অতএব 'দুঃখশূন্য সুখ' এবং 'মৃত্যুহীন জীবন' কথাগুলি বিদ্যালয়ের ছেলেদের ও শিশুগণের পক্ষেই ভাল; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখেন, বাক্যগুলি স্ববিরোধী, সুতরাং তিনি দুই-ই পরিত্যাগ করেন। যাহা কিছু কর, তার জন্য কোন প্রশংসা বা পুরস্কারের আশা করিও না। ইহা অতি কঠিন। আমরা যদি কোন ভাল কাজ করি, অমনি তাহার জন্য প্রশংসা চাহিতে আরম্ভ করি। যখনই আমরা কোন চাঁদা দিই, অমনি আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি—কাগজে আমাদের নাম প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপ বাসনার ফল অবশ্যই দুঃখ। জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণ অজ্ঞাত-ভাবেই চলিয়া গিয়াছেন। যে-সকল মহাপুরুষের সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না, তাহাদিগের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত বুদ্ধগণ ও খ্রীষ্টগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিমাত্র। এইরূপ শত-শত ব্যক্তি প্রতি দেশে আবির্ভূত হইয়া নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। নীরবে তাহারা জীবন-যাপন করিয়া নীরবে চলিয়া যান; সময়ে তাঁহাদের চিন্তা-রাশি বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের মতো মহামানবে ব্যক্তভাব ধারণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণই আমাদের নিকট পরিচিত হন। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ তাঁহাদের জ্ঞানের জন্য কোন নাম-যশ আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহারা জগতে তাঁহাদের ভাব দিয়া যান, তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছু দাবি করেন না, নিজেদের নামে কোন সম্প্রদায় বা ধর্মমত বা সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া যান না। ঐরূপ করিতে তাঁহাদের সমগ্র প্রকৃতি সঙ্কুচিত হয়। তাঁহারা শুদ্ধ-সাত্ত্বিক; তাঁহারা কখনও কোন আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাঁহারা কেবল প্রেমে গলিয়া যান। আমি এইরূপ একজন যোগী দেখিয়াছি, তিনি ভারতে এক গুহায় বাস করেন। আমি যত আশ্চর্য মানুষ দেখিয়াছি, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত আমিত্বের ভাব এমনভাবে বিলুপ্ত করিয়াছেন যে, অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, তাঁহার মনুষ্যভাব একেবারে চলিয়া গিয়াছে; পরিবর্তে শুধু ব্যাপক ঈশ্বরীয় ভাব তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। যদি কোন প্রাণী তাঁহার একহাত দংশন করে, তিনি তাঁহাকে অপর হাতটিও দিতে প্রস্তুত, এবং বলেন—ইহা প্রভুর ইচ্ছা। যাহা কিছু তাঁহার কাছে আসে, তিনি মনে করেন সবই প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছে, তিনি লোকের সম্মুখে বাহির হন না, অথচ তিনি প্রেম সত্য ও মধুর ভাবরাশির অফুরন্ত ভাণ্ডার।

তারপর অপেক্ষাকৃত অধিক রজঃশক্তি সম্পন্ন বা সংগ্রামশীল পুরুষগণের স্থান। তাঁহারা সিদ্ধপুরুষগণের ভাবরাশি গ্রহণ করিয়া জগতে প্রচার করেন।

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সত্য ও মহান্ ভাবরাশি নীরবে সংগ্রহ করেন, এবং বুদ্ধ-খ্রীষ্টগণ সেইসব ভাব স্থানে-স্থানে গিয়া প্রচার করেন ও তদুদ্দেশ্যে কাজ করেন। গৌতম বুদ্ধের জীবন-চরিতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্বদাই নিজেকে পঞ্চবিংশ বুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার পূর্বে যে চব্বিশজন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহারা অপরিচিত। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ঐতিহাসিক বুদ্ধ তাঁহাদের স্থাপিত ভিত্তির উপরই নিজ ধর্মপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও অপরিচিত। তাঁহারা জানেন—ঠিকঠিক চিন্তার শক্তি কতদূর। তাঁহারা নিশ্চিতভাবে জানেন, যদি তাঁহারা কোন গুহায় দ্বার বন্ধ করিয়া পাঁচটি সৎচিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই পাঁচটি চিন্তা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। সত্যই সেই চিন্তাগুলি পর্বত ভেদ করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া সমগ্র জগৎ পরিক্রমা করিবে এবং পরিশেষে মানুষের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া এমন সব নরনারী উৎপন্ন করিবে, যাঁহারা জীবনে ঐ চিন্তাগুলিকে কার্যে পরিণত করিবে। পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবানের এত নিকটে অবস্থান করেন যে, তাঁহাদের পক্ষে সংগ্রাম-মুখর কর্ম করিয়া জগতে পরোপকার, ধর্ম-প্রচার প্রভৃতি কর্ম করা সম্ভব নয়। কর্মীরা যতই ভাল হউন না-কেন, তাঁহাদের মধ্যে কিছু-না-কিছু অজ্ঞান থাকিয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্বভাবে একটু মলিনতা অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণই আমরা কর্ম করিতে পারি—কর্মের প্রকৃতিই এই যে, সাধারণতঃ উহা অভিসন্ধি ও আসক্তি দ্বারা চালিত হয়। সদাক্রিয়াশীল বিধাতা চড়াইপাখিটির পতন পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছেন; তাঁহার সমক্ষে মানুষ তাহার নিজ কার্যের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করে কেন? তিনি যখন জগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণীটির পর্যন্ত খবর রাখিতেছেন, তখন ঐরূপ করা কি এক-প্রকার ঈশ্বরনিন্দা নয়? আমাদের শুধু কর্তব্য সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলা—'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।' সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবেরা কর্ম করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের মনে কোন আসক্তি নাই। 'যিনি আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোন কার্য নাই'। ইঁহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ইঁহারা কার্য করিতে পারেন না, তা-ছাড়া প্রত্যেককেই কার্য করিতে হইবে। এইরূপ কার্য করিবার সময় আমাদের কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জগতের অতিক্ষুদ্র প্রাণীকেও কিছু সাহায্য করিতে পারি; তাহা আমরা পারি না। এই জগৎরূপ শিক্ষালয়ে পরোপকারের দ্বারা আমরা নিজেরাই নিজেদের উপকার করিয়া থাকি। কর্ম করিবার সময় এইরূপ ভাব অবলম্বন করাই কর্তব্য। যদি আমরা এইভাবে কার্য করি, যদি আমরা সর্বদাই মনে রাখি যে, কর্ম করিতে সুযোগ

পাওয়া আমাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের বিষয়, তবে আমরা কখনও উহাতে আসক্ত হইব না। তোমার আমার মতো লক্ষ-লক্ষ মানুষ মনে করে, এ-জগতে আমরা সব মস্ত লোক, কিন্তু আমরা সকলেই মরিয়া যাই, তারপর পাঁচ মিনিটে জগৎ আমাদের ভুলিয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের জীবন অনন্ত—'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'। যদি সেই সর্বশক্তিমান্ প্রভু ইচ্ছা না করিতেন, তবে কে এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিত, কে এক মুহূর্তও শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিত? তিনিই নিয়ত কর্মশীল বিধাতা। সকল শক্তিই তাঁহার এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে, পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে এবং মৃত্যু জগতীতলে বিচরণ করিতেছে। তিনিই সর্বেসর্বা; তিনিই সব তিনিই সকলের মধ্যে বিরাজিত। আমরা কেবল তাঁহার উপাসনা করিতে পারি। কর্মের সমুদয় ফল ত্যাগ কর, সৎকর্মের জন্যই সৎকর্ম কর, তবেই কেবল সম্পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে। এইরূপে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইবে, এবং আমরা পূর্ণ মুক্তিলাভ করিব। এই মুক্তিই কর্মযোগের লক্ষ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

দর্শনচর্চার ভূমিকা

কাণ্টের নিরিখে দিক্‌নির্ণয়

অধিবিদ্যার বিষয় অর্থাৎ অধিসত্তা হিসেবে আত্মাকে জানা যায় কি-না এ প্রশ্নের জবাবে কাণ্ট বলছেন—আত্মা আমাদের চিন্তার পক্ষে প্রয়োজনীয় ধারণা, আত্মা আমাদের নৈতিক বিশ্বাসের বিষয়, কিন্তু স্বরূপত সে অজ্ঞেয়, আমি বলছি—আত্মা জ্ঞেয়, যদিও তাকে চিন্তায় ধরা যায় না। অবশ্য আমরা বাস্তবিক তাকে জানি না আর তার সম্বন্ধে শুধু নৈতিক বিশ্বাসই রাখি, তবু সেই আত্মাকে যে চিন্তার মাধ্যম ছাড়াই জানা সম্ভব এটা মানতে হবে তা জানছি। এইজন্যেই যে তাকে জানবার জন্যে আমাদের অন্তরে একটা দাবি রয়েছে। এই দাবি আমাদের অন্তরের অনেক আধ্যাত্মিক দাবির অন্যতম। আমি চিন্তা ও জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানতত্ত্বের গোটা প্রশ্নটাই ফের আলোচনায় আনতে চাই।

এই যে আমি আত্মাকে অচিন্ত্য বলছি, তার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি কাণ্ট বর্ণিত 'প্রজ্ঞাগত ধারণা'কে জ্ঞান, এমনকি আক্ষরিক অর্থে চিন্তা বলেও মানতে অস্বীকার করছি। অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে চিন্তার প্রসারণ, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা— এসব বলতে আমি বুঝি চিন্তার ভাষাগত রূপকে অচিন্ত্য কোন সত্তার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করাটাকে। এই প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা আর চিন্তা করা কিন্তু এক নয়। আরো বলব, তর্কশাস্ত্রে যাকে চিন্তা বলে, প্রতীকীকরণ থেকে তফাং করে, সেও আক্ষরিক অর্থে চিন্তা নয়। আজকালকার স্পষ্টার্থবাদীরা অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করলে ও তাঁদের মধ্যে কেউই তর্কশাস্ত্রের সম্ভাবনাকে সংশয় করতে যাবেন না। বস্তুত তাঁরা তর্কশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে তাকে বিশুদ্ধ চিন্তা জেনে অধিবিদ্যাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে থাকেন। আমার দৃষ্টিতে তর্কশাস্ত্র বিজ্ঞানের নয়, দর্শনের অন্তর্গত। তর্কের বুদ্ধিগত রূপাবলী অধিবিদ্যার প্রতীকগুলির ছায়ামাত্র, তাই সেগুলি আপনাতে প্রতীকধর্মী।

অস্বীকৃতির দিকে আমি কাণ্টের চেয়ে আরো অনেক দূর এগিয়েছি। স্বীকৃতির দিকে কিন্তু আমি তাঁর অজ্ঞেয়বাদের সুর নিচু করে ধরব। আত্মা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস যে আছে অথচ সেই আত্মা যে আমার জানা নয় এ-কথারও উপরে বলব যে আত্মাকে চিন্তা ব্যতীত জানা যায় আর জানা দরকার। কাণ্টের দর্শনে আত্মা বা স্বাধীনতাকে 'নৈতিক স্বীকার্য' বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু নৈতিক স্বীকার্য হিসেবে এদের থিয়োরি করে লাভ হচ্ছে না নীতির দিক থেকে, না অধিবিদ্যার দিক থেকে। 'নৈতিক স্বীকার্য' বলতে শুধু প্রজ্ঞাগত ধারণাই

বা নন্দিনী কল্পনার সৃষ্টি বোঝাবে না। এই নৈতিক স্বীকার্যের প্রবচন ও ধ্যান তাকে নৈতিক কল্যাণ বা উপভোগ্য মূল্যরূপ হিসেবে অবলোকন করবার জন্যে নয়, তাকে সত্য বলে জানবার জন্য। এমন ধ্যান ভাববিলাস নয়, খেলাও নয়। এর পিছনে সেই বিশ্বাস থাকা চাই, যে বিশ্বাস সেই চিন্তা ছাড়া সত্যকে পাওয়া ব্যাপারটার সঙ্গে অভিন্ন। এই ধ্যান করাটা কর্তব্য নিশ্চয়ই নয়, তবে সেটা বাস্তবিক আরম্ভ হয়ে রয়েছে বলেই তাতে প্রকাশিত জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটুক এই দাবিও এসেছে। আত্মা সত্য এই জেনে যে ধ্যান, সেটা নৈতিক চেতনা ছাড়া অন্য চেতনা থেকেও আরম্ভ হতে পারে। নৈতিক চেতনা তার মধ্যে বিশেষভাবে নাও আসতে পারে। যাকে আধ্যাত্মিক ক্রিয়া বলে চেনা যায় সে ক্রিয়া আপনিই শুরু হয় তার অপর কোনো উৎস খুঁজবার দরকার নেই। আত্মা যে সত্য এ ধ্যান যে জ্ঞানের মধ্যে পূর্ণতা দাবি করে, সেটা অবশ্য শুধু তেমন মানুষেরই চেতনায় যার মধ্যে এই ক্রিয়া ইতিপূর্বেই আরম্ভ হয়ে গেছে। এ একটা অনন্যসাপেক্ষ পরম দাবি, অন্যান্য অনন্যসাপেক্ষ দাবিদের সমপর্যায়ী।

আত্মার বেলাতে যা, অন্য যে কোনো অধিসত্তার বেলাতেও যথাযোগ্য অদলবদল করে তাই খাটবে। অধিবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্বলিত দর্শনশাস্ত্র বাস্তবিক জ্ঞান নয়, এমনকি চিন্তাও নয়। তবু যে এদের বিষয়কে সত্য বলে ধ্যান করি সে শুধু এই বিশ্বাসে যে এরকম ধ্যান করেই পরম সত্যকে জানা সম্ভব হবে।

থিয়োরিধর্মী চেতনার পর্যায়ভেদ

দর্শন বলতে জ্ঞান বোঝায় কি না আর দর্শনে অক্ষরনিষ্ঠ চিন্তার কোনো কাজ আছে কি না সেটা নিয়ে হয়তো মতানৈক্য ঘটবে। সে যাই হোক, দর্শনে এমন কিছু প্রত্যয় এনে ধরে যেগুলি কথনযোগ্য, যেগুলি রীতিবদ্ধ সংজ্ঞাপনের উপযোগী, বিজ্ঞানের মতো দর্শন ও থিয়োরিধর্মী চেতনার প্রকাশ। থিয়োরিধর্মী চেতনার ন্যূনতম প্রকাশ হচ্ছে যা কথনযোগ্য তার বোধ। যা বলা যায় সেটা বলবার আগে প্রত্যয় করতে হয়। বা অপ্রত্যয় করা যায় সেটা আগে কাউকে না কাউকে একবারও অন্তত প্রত্যয় করতে হয়। শশকের শৃঙ্গ বা চতুষ্কোণ বৃত্তের মতো শব্দ সংযোগের বিষয় প্রত্যয় তো করা যায়ই না, এমনকি অপ্রত্যয়ও করা যায় এ পর্যন্ত বলা যায় না। অমন শব্দ সংযোগ ভাষায় বলা হয় একমাত্র কি বলা হয় না তার উদাহরণ হিসেবে। কিছু বলা মানেই একটা প্রত্যয়ের প্রবচন। অনুজ্ঞাবাচক বা অন্তর্ভাববাচক কথা ও বক্তার প্রত্যয়কেই

প্রকাশ করে, যদিও এক্ষেত্রে প্রত্যয়টা সংজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যযুক্ত নয়। মিথ্যে কথা, অর্থাৎ যে কথায় বক্তার প্রত্যয় নেই, আর কারও কাছে না হোক অন্তত নিজের কাছে সংজ্ঞাপনের বা সাযুজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে নেই; বক্তা তাকে বোঝে সব কথার পূর্বগামী, প্রত্যয় পাবার যে অনুক্ত বাসনা, তারই অঙ্গ বলে। প্রত্যয়ের বিষয়ই কথায় বলা সম্ভব, যা কথনযোগ্য তার বোধই থিয়োরিধর্মী চেতনা।

এই বোধ জ্ঞান নাও হতে পারে। কিন্তু কিছু যে জানা গেছে বা জানা যায় সে প্রত্যয়টা তার মধ্যে আছে। প্রকটভাবে হয়ত নেই, কিন্তু তাকে প্রকট করা সর্বদাই সম্ভব। 'জানি না' এই ভাবের প্রকট চেতনাতেও 'জানি' এই প্রত্যয় জড়িয়ে থাকে। অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবিরোধী বা সংশয়বাদী—এঁরা সকলে 'জানি না' এই-ই মনে রাখেন। কিন্তু 'জানি না' মনে করতে গেলে 'জানি' এও মনে করতে হয়। তাঁরা অজ্ঞাতকে 'জানেন' বলতে পারেন না, কিন্তু তার প্রত্যয় রাখেন, তাই পরোক্ষে কিছু না কিছুকে জানা গেছে বলে মেনে নেন। সেই কিছু না কিছুকে ভাষাতীত বলে ধরে নেওয়া হলেও অন্তত ঐ নামেই সেটা ভাষায় পরিচিত হবে। দর্শনের আওতায় এসব মতবাদ ততদূরই আসে, যতদূর এদের মধ্যে 'কিছু না কিছুকে জানি' এই প্রত্যয়যুক্ত থিয়োরিধর্মী চেতনার প্রকাশ ঘটে।

থিয়োরিধর্মী চেতনার সব রূপেই কথনযোগ্য কোনো না কোনো বিষয়ের বোধ জড়িয়ে থাকে। সাধারণত এ রূপগুলির সকলকেই 'চিন্তা' নাম দেওয়া হলেও এদের মধ্যে একটিই আক্ষরিক অর্থে চিন্তা। অন্যগুলিকে চিন্তা নাম দেওয়া উচিত নয়। সবসুদ্ধ চিন্তার চারটে রূপ বা পর্যায় ভাগ করা যেতে পারে। মোটামুটি এদের নাম দিচ্ছি অভিজ্ঞতাশ্রয়ী চিন্তা, বিশুদ্ধ বিষয়ের চিন্তা আধ্যাত্মিক চিন্তা আর অধিরোহী চিন্তা। অভিজ্ঞতাশ্রয়ী চিন্তা বলতে বুঝি কোনো বিশেষ আধেয় সম্বন্ধীয় থিয়োরিধর্মী চেতনার সেই রূপ যাতে প্রত্যক্ষ-লভ্য বা প্রত্যক্ষলভ্য বলে কল্পিত বিষয়ের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, উপরন্তু যার পক্ষে এই নির্দেশ আধেয়ার্থের অন্তর্গত। এমন আধেয়ও আছে যেগুলি বিষয় নির্দেশী হলেও ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক জানায় না। এই ধরনের আধেয়ের চেতনাকে বিশুদ্ধ বিষয়ের চিন্তা বা 'অবলোকনী' চিন্তা বলা যেতে পারে। আধ্যাত্মিক চিন্তার আধেয় কোনো 'বিষয়' নয়, এমন কিছু নয় যাকে বিষয়মুখী ভঙ্গিতে অবলোকন করা যেতে পারে। ও হচ্ছে বিষয়ীমুখী ভঙ্গিতে 'উপভোগ' করার বস্তু। অধিরোহী চিন্তা হচ্ছে সেই আধেয়ের চেতনা যে আধেয় বিষয় বা বিষয়ী কারও অভিমুখে নির্দেশ রাখে না। এর সম্বন্ধে পরে

আরো কথা হবে। চিন্তার এই চার পর্যায়ের আধেয়দের নাম দেওয়া যাক—তথ্য, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বাস্তব আর সত্য। বিজ্ঞানের কারবার অভিজ্ঞতাশ্রয়ী চিন্তার আধেয় বা তথ্যকে নিয়ে। বিশুদ্ধ চিন্তার বিষয়মুখী, বিষয়ীমুখী ও অধিরোহী ভঙ্গিতে পাওয়া বাকি তিন ধরনের আধেয়কে নিয়ে দর্শনের কারবার। অধিরোহধর্মী চেতনার সব আধেয়ই কথনযোগ্য। চিন্তার পর্যায় যাদের বলা গেল সেগুলি আসলে কথারই পর্যায়। বিজ্ঞানে বিবৃত হয় তথ্য, খবর হিসেবে; তাকে বোঝা যায় তার ভাষায় পরিস্ফুট রূপটার প্রতি উপেক্ষা করেই। কথায় ধরা না গিয়ে থাকলেও তথ্যের প্রত্যয় সম্ভব। অভিজ্ঞতাশ্রয়ী চিন্তার আধেয়ের পক্ষে কথনযোগ্যতা একটা অনাবশ্যক ঘটনাসংযোগ, কিন্তু বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তার আধেয়ের পক্ষে তা নিতান্ত আবশ্যক। দর্শনের আধেয় কথিত না হলে তার অর্থ বোধ সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ চিন্তায় আধেয় আধার ভেদ নেই, এই জন্যেই কখনো কখনো তাকে উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা ভাবা হয়েছে, দর্শনকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভাষার বিকার বলে। দর্শনের আধেয়কে স্বপ্রকাশ বলে প্রত্যয় হয়; স্বপ্রকাশ বা স্বতঃপ্রমাণ তাই যা কোনো বিশেষ ব্যক্তির কথায় প্রকট প্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে না। এই বাক-অনপেক্ষতা দর্শনের আধেয়ের অর্থের অন্তর্গত, কিন্তু বিজ্ঞানের আধেয়কে তার ভাষায় ধরা রূপটাকে উপেক্ষা করেও বোঝা যায়।

প্রতীত হয়েছে এমন কোনো আধেয়ের সঙ্গে যদি তার নিজের কথিত হওয়ার নির্দেশ থাকে তাহলে সেটা তথ্য হিসেবে বিবৃত হয় না। যাকে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বা বাস্তব বা সত্য বলা যায় তাকে তথ্য বলে উপস্থিত করা যেতে পারে না। এদের প্রত্যয় বিচারের কথিত রূপে প্রকট হতে পারে। সে বিচারের রূপটা কিন্তু কৃত্রিম বা প্রতীকধর্মী হবে। 'ক আছে খ-এর সঙ্গে এই সম্পর্কে'—এ ধরনের বিচারে তথ্যকে সব সময়েই ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে আনা যায়। শুধু এ ধরনের বিচারই আক্ষরিক অর্থে বোঝা যায়। 'ক আছে' এমন বিচার যদি কখনো তথ্যকে প্রকাশ করে তো সেটা উপরোক্ত ধরনের বিচারের সংক্ষেপে। 'ক আছে' এ বিচারে 'ক' বলতে যদি বোঝায় 'ক-এর খ-র মধ্যে এই সম্পর্ক' তবে বিচারটার অর্থ দাঁড়ায় সোজাসুজি-হয় ক খ-এর সঙ্গে এইভাবে সম্পর্কিত আছে কিংবা ক যে খ-এর সঙ্গে এইভাবে সম্পর্কিত আছে সেই ব্যাপারটা অন্য কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত। তথ্য মানেই অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কবদ্ধ তথ্য। যদি কখনো কোথায় 'ক আছে' এই বিচারটা সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু বিচার করে, তাহলে বুঝতে হবে 'ক' বলতে তথ্যকে নয়, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, বাস্তব বা সত্যকে বোঝাচ্ছে, এমন বিচার শুধু আপাতদৃষ্টিতেই বিচার বলে

গ্রাহ্য, উদ্দেশ্য এখানে বিধেয়কে আগে থেকেই ধরে নিয়ে বসেছে।, বিধেয় এখানে পূর্বপ্রতীত উদ্দেশ্যের অর্থ প্রসারিত বা পরিস্ফুট করছে না। এখানে উদ্দেশ্য শুধু স্বপ্রকাশ বলে প্রতীত বিধেয়ের স্বতঃপ্রমাণ বিস্তার।

দর্শনচর্চা এমনিই স্বপ্রকাশের স্বতঃপ্রমাণ বিস্তার। কতকগুলি বিচারের সমষ্টি দর্শনশাস্ত্র নয়। স্বপ্রকাশ বা স্বতঃপ্রমাণকে কথিত করা যায়, বিবৃত করা যায় না। যা শুধু কথিতই হয়, নিজের কথিত হওয়ার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা আবশ্যিক। মনোগত ভঙ্গি অনুসারে এই তিনটি রূপ বা পর্যায় ভাগ করা যায়—বিষয়মুখী, বিষয়ীমুখী এবং অধিরোহী। প্রথম দুই পর্যায়ের মধ্যে যে তফাত সেটা ধরা পড়ে 'বিষয় আছে' আর 'আমি আছি' এই দুই বিচারাভাগের পার্থক্যে। বিচারের যে রূপ—'ক আছে খ-এর সঙ্গে এই সম্পর্কে'—তাতে 'আছে' শব্দটার যদি কোনো অতিরিক্ত অর্থ থাকে, যদি সেটা ক এবং খ-এর সম্পর্ক ছাড়া আরও কিছু বোঝায়, তবে ওই বিশিষ্ট আধেয়টা হবে—যাকে বিষয়ত্ব বলা যায় তাই। একে বিচারাভাস করে বলা যেতে পারে, 'সম্পর্কটা ক এবং খ-এর মধ্যে আছে।' বিচারের আসল রূপে 'আছে' বলতে বোঝায় শুধু বিষয়ীর যে বিষয়মুখিতা সেইটেই, কিন্তু এই বিচারভাসে 'আছে' বলতে বোঝাচ্ছে এমন একটা বিষয়-আধেয় যেটা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, যেটা তথ্য নয়। অবশ্য এই আধেয়কে প্রকাশিত বা ব্যক্ত করলে মনোগত ভঙ্গিটা বিষয়মুখীই থাকে। যে ভঙ্গি ছাড়া হয় যখনি আমি বলি 'আমি আছি'। এবার আধেয়কে কথিত করা হচ্ছে, বিবৃত করা হচ্ছে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একে বিষয়নির্দেশী নয় বলেই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এর মধ্যে বিষয়নির্দেশিতা যদি কিছু থাকে তো তা প্রতীকধর্মী আভাস মাত্র। 'আছি' এই শব্দটার অর্থ যে কি সেটা বিষয়মুখী চেতনায় অবলোকনে ধরা যায় না, ধরা যায় বিষয়ীমুখী চেতনায় উপভোগে, তাকে অবলোকনের বস্তু বলে মনে হয় শুধু কথার আভাসে। তথ্যকে বিবৃত করা যায়, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠকে কথিত করা যায়; উভয়কেই ভাষায় প্রকাশ করা হয় তাদের কোনো না কোনো অর্থরূপে গ্রহণ করে, কিন্তু যা বাস্তব তাকে কোনো অর্থরূপে নেওয়া যায় না, কথনে প্রকাশ পায় তার প্রতীকরূপে।

এ তিনটেই অক্ষরনিষ্ঠভাবে কথনযোগ্য, বিষয় যে বিষয়ী নয়, আর সেটা যে বিষয়ীর প্রতীক একথা অক্ষরনিষ্ঠভাবেই বলা যাচ্ছে। যে শব্দটার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার সেটা আক্ষরিক অর্থে গৃহীত হচ্ছে না, কিন্তু সেটা যার প্রতীক তা (এবং তার যে প্রতীক গৃহীত হচ্ছে এই ব্যাপারটা) আক্ষরিক অর্থেই কথিত হচ্ছে। বিষয়ী এখানে সেই সুনিশ্চিত সত্তা যাকে দিয়ে বিষয়টাকে

বোঝা যাচ্ছে। বিষয় সাধারণ বা বিষয়তত্ত্বের ধারণা বিজ্ঞানের বিষয়ধর্মী তথ্যরাশি পর্যবেক্ষণ করে আসে না। বিষয়ী 'আমার' সাক্ষাত চেতনা ও কথনযোগ্যতা না থাকলে বিষয় সাধারণের ধারণা কখনোই দানা বাঁধতে পারত না। উত্তমপুরুষ 'আমি' হচ্ছি এই ধরনের আধেয়ের আদি উদাহরণ যার সঙ্গে তার নিজের কথিত হওয়ার আবশ্যিকতা জড়িয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে কথিত বস্তু আর কথনকার্য অভিন্ন। 'আমি আছি' এই বিচারাভাসে বিধেয়টা আক্ষরিক-ভাবে কথিত উদ্দেশ্যের প্রতীক মাত্র, যাকে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বা বাস্তব বলে চেনা যায়, তার কথন ও বোধ আক্ষরিকভাবেই সম্ভব হয়। কিন্তু যাকে সত্য বলে মানা যায় তাকে আক্ষরিকভাবে একেবারেই বোঝা যায় না।

তাহলে বাস্তবের অতীত যে সত্য তার কথন কি করে সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে তথ্য, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ আর বাস্তবের ধারণাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আরও পরিষ্কার করা দরকার। এদের নেতিকরণ বা অস্বীকৃতি সম্ভব। 'ক আছে খ-এর সঙ্গে এই সম্পর্কে' এ বিচারকে অস্বীকার করা যায় 'ক যে এই সম্পর্কে আছে এটা তথ্য নয়' এমনি বিচার দিয়ে। 'ক যে এই সম্পর্কে আছে' এটা বিচার নয়; আজকাল এর নাম দেওয়া হবে প্রস্তাব। এর প্রবচন ও অস্বীকৃতি সম্ভব, কারণ স্বয়ংপ্রতিষ্ঠের প্রত্যয় আমাদের আগে থেকেই রয়েছে। প্রস্তাবটা যদি তথ্য নয় এই হিসেবে গৃহীত হয় তবে তা শুধু আমরা তার স্বয়ং-প্রতিষ্ঠভাবে অস্বীকার করতে পারছি না বলেই। (বস্তু কথাটার বদলে আমি স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ কথাটার ব্যবহার করছি, কারণ আমরা কিছুকে অর্থরূপে নিতে পারি প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই। প্রতীত বস্তুই অর্থিত স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। অর্থরূপ মাত্রেই প্রতীত আধেয়, কোনো এক বিশেষ পর্যায় না হলে উচ্চতর পর্যায়ে।) স্বয়ংপ্রতিষ্ঠকে অস্বীকার করা যায় 'বিষয় নেই' এইরূপ বিচারে; বিষয় হচ্ছে যা বিষয়ী থেকে ভিন্ন এমন কোনো নির্দিষ্ট বা আত্ম-অভিন্ন আধেয় যাকে অবলোকন করা যেতে পারে। এ হল একটা বিশিষ্ট দার্শনিক মতের কথা, সে মতটাকে অর্থহীন মনে করার আপাতত কোনো কারণ দেখছি না। এ ধরনের অস্বীকৃতি সম্ভব, কেননা আমরা আগেই বিষয়ীকে উপভোগলভ্য বাস্তব বলে বুঝেছি। বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় 'আমি (ব্যক্তিত্ববিশেষ বিষয়ী) নেই' এই বিচারে। এও আপাতত সহজবোধ্য। এ হচ্ছে অস্বীকৃতি বা নেতিকরণের আর এক নতুন পর্যায়। ব্যক্তিত্ববিশেষ বিষয়ীকে শুধু বিষয়ী হিসেবেই বাস্তব বলে বোঝা যায়। অবশ্য বলা যেতে পারে যে নিজেকে বিষয়ের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে অভিন্ন মনে করছে এবং সেইভাবেই তার ব্যক্তি-বিশেষত্ব সম্ভব

হচ্ছে। ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট হলেও 'আমার' প্রত্যয় উপভোগের মধ্য দিয়েই। এই আধেয়ের অস্বীকৃতি সম্ভব হচ্ছে, কারণ আমরা আগেই বাস্তবের অতীত যে সত্য তার ধারণায় এসে পৌঁছে গেছি।

বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যা

বিষয়তত্ত্বকে বিজ্ঞান থেকে তফাত করতে হবে। উভয় চর্চাই বিষয়কে নিয়ে, সে বিষয় জানা গেছে বলে বিষয়মুখী ভঙ্গিতে প্রত্যয় হয়। বিজ্ঞানে যে বিষয়ের প্রকাশ সে হল তথ্য। তথ্য বলতে বোঝায় যা প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা আক্ষরিকভাবে বিচাররূপে কথিত হতে পারে, যাতে তার কথিত হওয়ার প্রতি উপেক্ষা করেই প্রত্যয় করা যায়। স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বলতে বোঝায় যার প্রত্যক্ষের প্রতি কোনো নিশ্চিত নির্দেশ নেই, যা আক্ষরিকভাবে বিচার-রূপে কথিত হতে পারে না, যাতে প্রত্যয় হয় শুধু তার কথনের সঙ্গে সঙ্গেই। কথনযোগ্য বলতে বোঝায় তাই যার হয় প্রত্যক্ষ, নয় তার নিজের কথিত হওয়ার প্রতি নিশ্চিত নির্দেশ রয়েছে। যার প্রত্যয় ও বোধ শুধু তার কথনের সঙ্গে সম্পর্ক যোগেই ঘটে, তা স্বতঃপ্রমাণ ও স্বপ্রকাশ অর্থাৎ ব্যক্তিমানস-অনপেক্ষ বলেই প্রত্যয় হয়। বিষয়মুখী ভঙ্গিতে স্বপ্রকাশ হতে পারে এক স্বয়ং-প্রতিষ্ঠই। বিজ্ঞানের তথ্য স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ নয়; এমন নয় যা করেও প্রত্যয় না হলেও থাকবে।

স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বিষয়, যাকে দর্শনের ব্যাপার বলছি, বিজ্ঞানের বিষয় নয়। এমনকি, তাকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অস্বীকার করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বিষয়ের ধারণা করে কোনো কাজের সুবিধা হয় না। বিজ্ঞানের পক্ষে সব বিষয়ই জানা যায়, ব্যবহার করা যায়। কোনো বিষয় স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ একথা বলতে কিন্তু তাই বোঝায় যে-বিষয়টা স্বরূপত অজ্ঞেয় হলেও হতে পারে। বিষয়ী অনপেক্ষ বিষয়-অজ্ঞেয় হয়তো বাস্তবিক নয়, তবু তাকে জানাটা অধিকার সূত্রে ঘটে না। বিজ্ঞানের কাছে একথা মিথ্যে ঠেকবে। সত্য যে স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, সে যে রহস্য, নিজেকে প্রকাশ করাই যে তার স্বভাব এসব কথা বিজ্ঞানের কাছে গোপনতা-বিলাস বলে মনে হবে। বিজ্ঞানের কাছে কোনো দিকেই এমন কোনো বিষয় নেই যা তার নিজের প্রকাশ ঘটাতে পারে; বিষয় অর্থই জ্ঞাত কিংবা জ্ঞেয় বিষয় জানা নাও যেতে পারে এমন কোনো বিষয় থাকতে পারে না।

সব বিষয়কেই যে জানা যায়, ব্যবহার করা যায় এটা বিজ্ঞানের কাছে তর্কাতীত বিশ্বাসের জিনিস। এই বিশ্বাসকে তর্কের সভায় টেনে নিয়ে আসা

দর্শনের অন্যতম কাজ। দর্শনের কাছে অমন বিশ্বাস বিষয়ীর স্বয়ংসম্পূর্ণমানিতার প্রকাশ বলে ঠেকে। সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে প্রকৃতিকে যে সচেতনভাবে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা মোটেই নয়। তার সঙ্গে লেনদেন চলে বরং আদিম বন্ধুতার মনোভাব নিয়েই। বিষয়ের প্রতি বিজ্ঞানের এই উদ্ধত শোষণেচ্ছু মনোভাবের প্রতিবাদ ওঠে দর্শন বা অমনি কোনো আধ্যাত্মিক প্রয়াসের রূপ ধরে। প্রকৃতিকে যে শুধুমাত্র প্রয়োজন সাধনের জন্যে ব্যবহার করা চলবে না, তাকে যে ধ্যানের বস্তু হিসেবেও নিতে হবে, এটা আধ্যাত্মিক চেতনারই দাবি। বিজ্ঞানে থিয়োরি তৈরি হয় ব্যবহারিক স্বার্থে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক রীতি-পদ্ধতিগুলি বাস্তব বা অবাস্তব প্রকল্পের প্রয়োগমাত্র, ব্যবহার সিদ্ধির কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। বিষয়ের প্রতি বিজ্ঞানের যে মনোভাব তার দোষ আর অপূর্ণতার বোধ থেকে আসে বিষয় সম্বন্ধে দার্শনিক উৎপ্রেক্ষার প্রেরণা। এই প্রেরণা বিজ্ঞানের তথাকথিত স্বতোবিরোধিতা ইত্যাদি থেকে আসতে পারে না, কারণ দার্শনিক যেখানে দোষ আর অপূর্ণতা দেখেছেন বৈজ্ঞানিক সেখানে কোনো অভাব বোধ করেন না। স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বিষয়ের ধারণাটা হচ্ছে দর্শনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানী বুদ্ধিকে সংশোধনের চেষ্টার প্রথম প্রকাশ। বাস্তববাদ অন্য সব দর্শনের মতোই একটা বিশ্বাস। বিজ্ঞানের মনের কথা খুলে বললে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণমানী ভাববাদের একটা প্রয়োগবাদী-রূপ।

বিজ্ঞান ও বিষয়তত্ত্বের পারস্পরিক সম্বন্ধটা পরিষ্কার করা যেতে পারে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ সমস্যা আলোচনা করে। এই সমস্যাগুলিকে কখনও কখনও ভুল করে দার্শনিক সমস্যা বলে ভাবা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রয়োগ ও লব্ধ ফলাফল একত্রিত করে একটা বিশ্বরূপদর্শন খাড়া করাটা এদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই চেয়েছেন বিজ্ঞানগুলির প্রাথমিক নীতিগুলি থেকে ব্যাপকতর মূলনীতিতে পৌছতে। কিন্তু বিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যতীত দর্শন যে এ কাজটা করতে পারবে অমন ধারণা বাতুলতা, এভাবে কিছু বর্ণনাত্মক ধারণা সংগ্রহ করা যেতে পারে। যদি প্রকৃত কোনো নীতি এভাবে ধরা যেত তাহলে তো বিজ্ঞানের কাজ দর্শনই হাতে নিতে পারত। এদিক দিয়ে বিশ্বের একটা কল্পনাময় বর্ণনা বেশ বানানো যেতে পারে। সেটা বাস্তবিকজ্ঞান হবে না, এমনকি এমন প্রকল্পও হবে না যাকে পরে জ্ঞান বলে প্রতিপন্ন করা যায়। তর্কনীতি বা অধিবিদ্যার থিয়োরির যে অভিজ্ঞতানপেক্ষ নিশ্চিত সেও এধরনের চিন্তায় মিলতে পারে না। দর্শনের আধেয় জানা না গিয়ে থাকলেও অন্তত

থিয়োরিতে প্রতীত হয়। কিন্তু এ ধরনের বিশ্বরূপদর্শন বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। এ হচ্ছে শুধু নন্দনী কল্পনায় গঠিত ধ্যানরূপ, যার মূল্য বিজ্ঞানের পক্ষে ইঙ্গিতে ইশারায় আর দর্শনের পক্ষে উদাহরণে উপমায়। এ ধরনের উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ হিসেবে নাম করতে পারি তার যা অভিব্যক্তি দর্শন বলে খ্যাত হয়েছে, অভিব্যক্তি ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থেকে তফাত হয়েছে, অভিব্যক্তি বলতে কি বোঝায় সেটা সাধারণভাবে অধিবিদ্যায় আলোচনা করা যেতে পারে। বস্তুত ওটা জীবনের ধারণার সঙ্গে অভিন্ন। ওর পদার্থবাদী, অধ্যাত্মবাদী এমনি নানান্ ব্যাখ্যা সম্ভব। এই আলোচনার জন্যে অধিবিদ্যাকে বসে বসে বিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্যরাশি জুড়তে গোছাতে হবে না। তার যা প্রমাণ দরকার তা পাওয়া যাবে পদার্থ, জীবন, মন—এদের অস্তিত্বে। এ তো নিজেকে দেহী বলে জানার মধ্যেই পেতে পারি। বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি তথ্য ও বিশেষ বিশেষ সামান্য সিদ্ধান্ত অভিব্যক্তি দর্শনে ব্যবহার হতে পারে প্রমাণ হিসেবে নয়, শুধুই অধিবিদ্যায় থিয়োরির উদাহরণ হিসেবে। অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জ্ঞান বা অন্তত প্রকল্প বলতে হয়, জীবনকে পদার্থ ও মন থেকে আলাদা দেখে তার সম্পর্কিত অধিবিদ্যাকে প্রতীত বলতে হয়, কিন্তু তথাকথিত অভিব্যক্তি দর্শন হচ্ছে আসলে যা জানা গেছে আর যা ধরে নেওয়া গেছে দু-ধরনের কথা মিশিয়ে বলা গল্প। সেই একক অদ্বিতীয় বিশ্বজীবনের আশ্চর্য কাহিনী। বিশ্বজীবন বলে কোনো তথ্য নেই, তাকে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হিসেবে হয়তো বা প্রত্যয় করা যেতে পারে। বিশ্বজীবনের ইতিহাসটা তাই বিজ্ঞানের তথ্যসমাবেশের ফাঁকফাটল কল্পনার জোরে জুড়ে বুজিয়ে বানানো গল্প, স্বতঃপ্রমাণ নয়, পরতঃপ্রমাণও নয়। বিশ্বঅভিব্যক্তির কাহিনী বিজ্ঞান বা দর্শন কোনোটাই নয়, ও হচ্ছে কল্পনাত্মক সাহিত্যসৃষ্টি।

বিজ্ঞানের স্বীকার্য বা কাঠামোগত ধরণাগুলির প্রবচনকেও এককালে দর্শনের সমস্যা বলে মনে করা হয়েছে। কাণ্ট তো বিশুদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞান নামে একটা কিছুকে অধিবিদ্যার শাখা বলে ধরে নিয়ে সংশ্লেষধর্মী জ্ঞানের অভিজ্ঞতা-নপেক্ষ নীতিগুলি থেকে তাকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। আজকাল রিলেটিভিটি থিয়োরি ঘিরে যে রোমান্টিক দর্শন চালু হয়েছে তার মধ্যেও এই ধরনের চিন্তার বিপর্যয় দেখতে পাই। তবে কাণ্ট দর্শনকে বিজ্ঞান ভেবে নিয়েছিলেন, আর এখন বিজ্ঞানকে দর্শন ভেবে নেওয়া হচ্ছে। উভয়ক্ষেত্রেই তথ্য ও স্বয়ংপ্রতিষ্ঠের মাঝখানের অলঙ্ঘনীয় ব্যবধানকে অস্বীকার করা হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের স্বতঃসিদ্ধগুলি স্বীকার্যমাত্র, তাদের প্রবচন বিজ্ঞানেরই কাজ।

স্বীকার্য বলা যায় সেই প্রকল্পকে যার উদ্দেশ্য তথ্যকে এগিয়ে জানা নয়, তাকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। তার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য প্রকল্প সম্ভব। তাকে বাতিল করে দেওয়া যায়, তথ্যের সঙ্গে খাপখাচ্ছে না এ কারণে নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পের চেয়ে জবড়জঙ ও অসুবিধাজনক বলেই। বিজ্ঞানের স্বীকার্য থেকে বিষয়টার কোনো ধারণাতে সরাসরি পৌছনো যায় না। জগতটা সত্যি সত্যি চতুঃপরিসর কিনা, বা আচরণে স্বরূপত অনির্দেশ্য কিনা, এসব কথার কোনো জবাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকের তথ্যসমূহকে যে ধারণাকৌশলগুলি সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারছে তাদের ওপর নির্ভর করে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞানের স্বীকার্য আর বিষয়ের অধিবিদ্যাগত ধারণার মধ্যে কোনো তর্কনীতিসম্মত সম্বন্ধ নেই।

বিষয়তত্ত্ব

তাহলে বিষয় সম্বন্ধে দর্শনের কিই বা বলবার থাকতে পারে? বিষয়মুখী মনোভঙ্গি বোঝা যায় শুধু বিষয়ীমুখী বা উপভোগী মনোভঙ্গির সঙ্গে তুলনায়। বিষয়কে অর্থাৎ যাকে বিষয়মুখী ভঙ্গিতে প্রত্যয় করা যায়, বিষয়ীর সঙ্গে সম্পর্কিত না করেও বোঝা যেতে পারে। তেমন হলে সে বিষয়কে বলে তথ্য। বিজ্ঞানের কাজ তথ্যের চর্চা। দর্শন যে বিষয় নিয়ে কারবার করে সে বিষয়কে বিষয়ীর সম্বন্ধ ছাড়া বোঝা যায় না। বিষয়ী বলতে বুঝি ব্যক্তিসত্তা, 'আমি'। একে থিয়োরিগত চেতনায় সেই কথন ক্রিয়া বলে চেনা যায়, যেটা কথিত বিষয়ের রূপে নিজেরই প্রতীক সৃষ্টি করে। যে বিষয়ে মধ্যে তার কথনের আবশ্যিক নির্দেশ রয়েছে সে বিষয় দর্শনের পক্ষে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ।

স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বিষয়ের ধারণা প্রবচন ও ব্যাখ্যান দর্শনে ঘটে। অমন বিষয় আর বিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যে মিল আনছে উভয়ের বিষয়ভাব। এই বিষয় ভাবটা নিজে কিন্তু তথ্য যাকে বলে তা নয়। এ হল, বিষয়ীমুখী চেতনাতে উভয়কেই বোঝা যায়, শুধু এই ঘটনাসংযোগটা। বিষয়ের বিষয়রূপটুকুই তার স্বয়ংপ্রতিষ্ঠা রূপ; তাই সেটা তর্কনীতিতে আলোচিত হতে পারে। এই রূপ কথিত তথ্য ও স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ উভয়েরই রূপ; তাই তথ্য বা প্রত্যক্ষলভ্য কোনোকিছুর সঙ্গে তার কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। এই রূপের অধ্যয়ন তর্কনীতিতে; তাই তর্কনীতি বিজ্ঞানের নয়, দর্শনেরই একটা শাখা। এই রূপটা বিশুদ্ধ বিষয় এবং বিশুদ্ধ বিষয়ের রূপ, এক সঙ্গে দুইই। তর্কনীতির বিষয় অধিবিদ্যালভ্য বিশুদ্ধ বিষয়েরই প্রতীক, তারই ছায়া। তর্কনীতি ও অধিবিদ্যা বিষয়তত্ত্বের দুই শাখা।

(বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা—সংক্ষেপিত)

তারকচন্দ্র রায়

প্লেটোর দর্শন

পৃথিবী কোন্ পদার্থে নির্মিত, এই প্রশ্ন হইতেই গ্রীক দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল। চিন্তা করিতে শিখিবার পর হইতেই মানুষ এই প্রশ্ন জিজ্ঞসা করিয়া আসিতেছিল। কেহ উত্তর দিয়াছিল, 'শূন্য হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল, অর্থাৎ কোথাও কিছু ছিল না, ঈশ্বর ছিলেন একমাত্র। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর অমনি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সমন্বিত ধরণীর আবির্ভাব হইল।' কিন্তু গ্রীকগণ এই উত্তর সন্তোষজনক বলিয়া মনে করে নাই। গ্রীক দার্শনিকগণও প্রথমে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও খুব ভাল উত্তর নয়। তাহাদের কেহ বলিলেন জলই পৃথিবীর মূল উপাদান, কেহ বলিয়াছিলেন বাতাস, কেহ বলিয়াছিলেন অগ্নি। অচিরেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, তাহারা আরও ভাল উত্তরের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় অন্য একটি সমস্যার উদ্ভব হইল। পৃথিবী আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট অতি সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়দিগকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় কি? ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে। যাহা দেখিতে পাই, দৃষ্টিগোচর হইবার পরক্ষণেই তাহার অনুভূতি পরিবর্তিত হয়; প্রতি পলে, প্রতি বিপলে তাহার পরিবর্তন চলিতে থাকে, প্রতিক্ষণের অনুভূতি তিরোহিত হয়, নূতন অনুভূতি তাহার স্থান গ্রহণ করে। যাহা পরিণামী, তাহাকে তো সত্য ও নিত্য বলা চলে না। যাহা সত্য, তাহা সব সময়েই সত্য। এখনই যাহা আবির্ভূত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহাকে সত্য বলিব কিরূপে? যাহা সত্য, তাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণ যে সত্যের সন্ধান দেয় না, দিতে পারে না, সেই অপরিণামী সত্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরেই প্লেটো তাঁহার সামান্যবাদের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

জ্যামিতি হইতে সম্ভবত প্লেটো তাঁহার মতের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। জ্যামিতিতে 'বৃত্ত', 'সরলরেখা', 'ত্রিভুজ' প্রভৃতির সংজ্ঞা দেওয়া আছে। 'বৃত্তের' সংজ্ঞার বিষয় আলোচনা করা যাউক। যে সংজ্ঞা জ্যামিতিতে দেওয়া আছে, তাহার অনুরূপ নির্দোষ বৃত্ত কেহ কখনও দেখে নাই। উৎকৃষ্ট কম্পাসের সাহায্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, কেহ সজ্ঞানুরূপ বৃত্ত অঙ্কিত করিতে পারেন না। তাহা সত্ত্বেও জ্যামিতিক পণ্ডিত অঙ্কিত বৃত্তের সাহায্যে দোষ স্পর্শহীন বৃত্তের ধর্ম প্রমাণ করিতে পারেন। যখন তিনি কম্পাসের ব্যবহার করেন, তখন তিনি নির্দোষ বৃত্তের ধর্মচিন্তা করিয়া তাহার এমন প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন, যাহা দেখিলে নির্দোষ বৃত্তের রূপ মনে উদিত হইতে পারে। নির্দোষ

বৃত্তের সহিত অঙ্কিত বৃত্তের সম্বন্ধ ভাষায় প্রকাশ করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু পার্থক্য যে আছে, তাহা বোঝাও কষ্টকর নহে। সে পার্থক্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেননা জ্যামিতিক যাহা প্রমাণ করেন, তাহা নির্দোষ বৃত্ত সম্বন্ধেই সত্য, অঙ্কিত বৃত্ত সম্বন্ধে নহে, কেননা সে বৃত্ত কখনও সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়া সম্ভব-পর নয়। আবার মনে করুন, শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন, 'কোনও ত্রিভুজের কোণসমষ্টি দুই সমকোণের সমান।' তিনি ছাত্রকে বোর্ডে একটি ত্রিভুজ আঁকিতে বলিলেন। ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরূপ ত্রিভুজ ?' শিক্ষক বলিলেন, 'যে কোনও রূপই আঁকিতে পারে।' শিক্ষক যাহা প্রমাণ করিয়া বুঝাইতে চাহেন, তাহা সকল ত্রিভুজের পক্ষেই সত্য, কেবল যে সমবাহু অথবা দ্বিসমবাহু অথবা বিষমবাহু ত্রিভুজের সম্বন্ধে সত্য, তাহা নহে। কিন্তু ছাত্র যে ত্রিভুজ আঁকিল, তাহার সম্বন্ধে তাহা সত্য নহে। কেননা কোনও ত্রিভুজ তাহার পক্ষে নির্দোষ-ভাবে অঙ্কিত করা সম্ভব নহে। অঙ্কিত ত্রিভুজ মুছিয়া ফেলিয়া অন্যরকমের ত্রিভুজ আঁকিলেও, প্রমাণের হানি হইবে না। কেননা প্রমাণের সময় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই মনে নির্দোষ ত্রিভুজের জ্ঞানই উদিত হইতেছে। অঙ্কিত ত্রিভুজ নির্দোষ-না হইলেও, নির্দোষ ত্রিভুজের প্রতীকের কাজ করিতেছে। এই প্রতীকের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার জন্যে ইহাকে ত্রিভুজ বলা চলে, যাহা হইতে প্রতীকের মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, প্রতীক তাহা প্রাপ্ত হয়, যাহা না থাকিলে প্রতীক কি, তাহাই বোধগম্য হইত না, তাহাকে অর্থহীন খড়ির দাগ বলিয়া মনে হইত। যাহার অস্তিত্ববশত প্রতীকের দ্বারা নির্দোষ ত্রিভুজের কাজ চলে, তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য। ইহা হইতে প্রতীত হয়, যে পদার্থের যে অংশ বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহাই প্রকৃত সত্য, অবশিষ্ট অংশ প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র। এই প্রাতিভাসিক অংশ ইন্দ্রিয়ের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে। বহির্জগতের সংবাদের জন্য আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে প্রাতিভাসিক সত্তার সংবাদই দিতে পারে, প্রকৃত সত্তার জ্ঞান দিতে পারে না। ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত আমাদের একটি বৃত্তি আছে, যাহার সাহায্যে প্রতিভাস সমূহ যাহাদের প্রতীয়মান রূপ সেই সকল নিত্য সত্তার জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি। এই বৃত্তি 'প্রজ্ঞা'। বুদ্ধিগ্রাহ্য এই সমস্ত সত্তাই প্লেটোর সামান্য। এই মতে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক জগৎ যে আংশিকভাবে সত্য—জগতে সামান্য অনুস্যূত থাকার জন্য সত্য—তাহা স্বীকৃত, ব্যবহারিক জগৎ সামান্যদিগের প্রতিরূপ। সামান্যগণ ব্যবহারিক জগতের সর্বত্র অনুস্যূত। এই জন্যই ব্যবহারিক জগতের সত্যতা। সামান্য-বর্জিত ব্যবহারিক জগতের কোনও

সত্যতা নাই।

প্লেটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ হইতে স্বতন্ত্রে বুদ্ধিগ্রাহ্য সামান্য জগতের কথা বলিয়াছেন, সামান্য-জগৎ বহির্জগতের প্রতিরূপ নয়, ফোটোগ্রাফে বহির্জগতের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহার মত নয়। বরঞ্চ বহির্জগতকেই এই সামান্য জগতের প্রতিবিম্ব বলা যায়।

প্লেটোর সামান্য কি, তাহা বুঝিতে হইলে সামান্য প্রত্যয় কি তাহা প্রথম বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান লাভ করি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বস্তুর জ্ঞান। জাতির জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কোনও বিশেষ মানুষের জ্ঞান—রাম, শ্যাম অথবা যদুর জ্ঞান—আমরা ইন্দ্রিয় হইতে পাই। 'মানুষ' জাতির জ্ঞান পাই বুদ্ধি হইতে। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সাধারণ যে ধর্মগুলি আমরা প্রত্যেক মানুষে প্রত্যক্ষ করি, বুদ্ধি তাহাদিগের সমবায়ে মানুষ জাতির ধারণা গঠন করে, বহুদ্রব্যের পর্য্যবেক্ষণও তাহাদের ধর্মের বিশ্লেষণ ও তুলনা করিয়া বুদ্ধি সাধারণ ধর্মগুলিকে অন্য ধর্ম হইতে নিষ্কর্ষণ করিয়া লয়। তাহার পরে সেই সাধারণ ধর্মগুলির একত্র চিন্তা করিয়া তাহাদের সঙ্গে একটি নাম সংযুক্ত করিয়া দেয়। এই নামের সাহায্যে সাধারণ গুণের সমবায়কে স্মৃতির ভাণ্ডারে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা, প্রয়োজনমত স্মরণ ও অন্যের নিকট প্রকাশ সম্ভবপর হয়। এই রকম গঠিত ও রক্ষিত মানসিক সৃষ্টিকে 'সামান্য প্রত্যয়' বলে। সামান্য প্রত্যয়ের স্বরূপ লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে বহু বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, জগতে বিশিষ্ট সত্তাবিশিষ্ট পৃথক পৃথক দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। জাতি অর্থাৎ সাধারণ পদার্থ বলিয়া কিছুই নাই। কেবল নাম আছে, যার সাহায্যে এক ধর্মবিশিষ্ট বহু পদার্থের চিন্তা করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু সেই নামের সঙ্গে কোনও সাধারণ প্রকৃতিবিশিষ্ট মানসিক ভাব নাই। সাধারণ প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রত্যয় গঠন করিবার ক্ষমতাই মানুষের মনের নাই। যুবক নয়, বৃদ্ধ নয়, শিশু নয়, কিশোর নয়, খর্ব নয়, দীর্ঘ নয়, গৌর নয়, কৃষ্ণ নয়, পীত নয়, এমন কোনও মানুষের চিন্তা করা অসম্ভব। সুতরাং 'মানুষের কোন সামান্য প্রত্যয় হইতে পারে না। যখনই আমরা মানুষ' শব্দের ব্যবহার করি, তখনি কোন বিশিষ্ট বয়সের, বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের ও বিশিষ্ট বর্ণের মানুষের মূর্তিই মনে উদিত হয়। মানুষের নামের সঙ্গে সাধারণ প্রকৃতিবিশিষ্ট কোনও মানসিক ভাবের অস্তিত্ব নাই। মনের বাহিরেও বাহ্যজগতে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই মতকে নামবাদ বলে।

সামান্য প্রত্যয়বাদিগণ বলেন, সামান্য প্রত্যয় গঠন করিবার ক্ষমতা মানুষের

আছে। 'মানুষ', এই সামান্য প্রত্যয়ের মধ্যে আছে প্রাণিত্ব ও প্রজ্ঞাবত্তার ভাব। এই দুই ভাবের সমাবেশে 'মানুষ' প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। যখন 'মানুষ' শব্দ শ্রুত হয়, তখন এই সামান্য জ্ঞানের উদয় হয়। এই সামান্য-প্রত্যয় সম্পূর্ণ মানসিক পদার্থ, মনের বাহিরে ইহার অস্তিত্ব নাই।

কিন্তু বাস্তববাদিগণ বলেন, প্রত্যেক সামান্য প্রত্যয়ের প্রতিরূপ এক একটি বাস্তব পদার্থ মনের বাহিরে আছে। মনের মধ্যে যেমন মানুষের সামান্য-প্রত্যয় আছে, বাহিরে তেমনি সেই প্রত্যয়ের অনুরূপ পদার্থ আছে। সে পদার্থ মনের বাহিরে হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগতে নাই, অন্য জগতে আছে। এই মনঃ-নিরপেক্ষ সত্তাবিশিষ্ট পদার্থই প্লেটোর সামান্য। এই সমস্ত সামান্যবিশিষ্ট পদার্থ সকলের আদর্শ, তাহাদের অনুরূপ করিয়াই বিশিষ্ট পদার্থ সকল গঠিত হইয়াছে, যদিও সম্পূর্ণ অনুরূপ হয় নাই। প্লেটোর মতে নানা বস্তুর মধ্যে যাহা সাধারণ, ব্যক্তির মধ্যে যাহা সার্বিক, ক্ষারের মধ্যে যাহা অক্ষার, বহুর মধ্যে যাহা এক, তাহাই সামান্য। বিষয়ীর দিক হইতে বিবেচনা করিলে, তাহার জ্ঞানের মূলতত্ত্ব। অভিজ্ঞতা হইতে তাহাদের উৎপত্তি অসম্ভব। সহজাত জ্ঞান-নিয়ামক তত্ত্ব তাহারা। বিষয়ের দিক হইতে দেখিলে, তাহারা সত্তার ও বহির্জগতের অব্যয় তত্ত্ব, নিরবয়ব, অবিভাজ্য, মৌলিক পদার্থ, যাহা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ ও যাবতীয় বস্তুতে বিদ্যমান। বস্তুর সারভাগ, যাহা না থাকিলে বস্তুর বস্তুত্ব থাকে না, সত্মার মধ্যে যাহা চিন্তার সহিত অভিন্ন, তাহাই সামান্য-প্রত্যয়ের সহিত বর্ণনা করা এবং বাস্তব জগৎকে বুদ্ধির জগৎরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা হইতেই সামান্য বাদের উৎপত্তি বলিয়া অ্যারিস্টটল লিখিয়াছেন। অ্যারিস্টটল আরও বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে হেরাক্লিটাসের মত যে সত্য, সে সম্বন্ধে প্লেটোর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যাহা পরিণামী, স্থির হইয়া যাহা থাকে না, তাহার সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনার সম্ভব হয় না। একবারের অধিক যদি কোনও পদার্থের সাক্ষাৎ না পাওয়া যায়, উৎপন্ন হইয়াই যদি প্রত্যেক পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়, যাহা দেখিলাম, দেখিতে না দেখিতেই যদি তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, জগৎ যদি কেবল পরিণাম-প্রবাহ-মাত্র হয়, স্থির কোন কিছু যদি তাহাতে না থাকে, তাহা হইলে কোনও বিজ্ঞানেরই সম্ভব হয় না। তাই প্লেটো পরিবর্তনরাজির মধ্যে নিত্য পদার্থের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে সামান্যবাদ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার সামান্যগণই তাঁহার অভিষ্ট নিত্য পদার্থ। জগতের পরিণামীরূপ সামান্যদিগের কালিক ও দেশিক রূপ, অসম্পূর্ণ রূপ। সুন্দর ও মঙ্গলেরই যে সামান্য আছে, তাহা

নহে। যেখানেই জাতি আছে, সেখানেই সামান্য আছে। তাই প্লেটো শয্যা, টেবিল, স্বাস্থ্য, কণ্ঠস্বর ও বর্ণের সামান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটি দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ, দ্রব্যের গুণ ও গণিতের ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্রের সামান্যের কথাও তিনি বলিয়াছেন। এমন কি 'অসৎ'-এরও সামান্য আছে, বলিয়াছেন। চরিত্রভ্রষ্টতা ও ব্যভিচারের সামান্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানে এক নামের দ্বারা বহুর নির্দেশ করা হয়, সেখানেই সামান্য আছে। প্রত্যেক জাতীয় পদার্থেরই এক একটি সামান্য আছে।

প্লেটো সামান্যদিগের তিনটি ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমত প্রত্যেক সামান্যই এক, বহু নয়। সুন্দর বস্তু অনেক আছে ; কিন্তু সুন্দরের সামান্য একের বেশি নাই। সেই এক সুন্দরের সামান্যের প্রতিবিম্বই যাবতীয় সুন্দর বস্তু। দ্বিতীয়ত সামান্যগণ অপরিণামী ও সনাতন। ইহারা নিত্য, অচল ও স্থাণু। কখনও ইহাদের পরিবর্তন হয় না। প্রত্যেক সামান্যের বহু বিশেষ আছে। বহুরূপে ব্যবহারিক জগতে তাহারা অভিব্যক্ত। এই সকল বিশেষের আবিভাব ও তিরোভাব হয়, কিন্তু সামান্য নিত্য ও অবিনশ্বর। পার্থিব জগতের বিরামহীন পরিবর্তন ও ধ্বংসের বাহিরে স্থির অবিচল সামান্যের জগতেই আমরা অবিচল স্থিতির সাক্ষাৎলাভ করি। সামান্যদিগের তৃতীয় ধর্ম পূর্ণতা। যে যে দ্রব্যে কখনও সামান্য অভিব্যক্ত, তাহাদের ভালমন্দ বিচারের জন্য সেই সামান্যই মানদণ্ড ; সেই সামান্যের সুষ্ঠু প্রকাশের উপরে সেই সেই দ্রব্যের তৎ-ত্ব (সেই দ্রব্যত্ব) নির্ভর করে, সূত্রধর যখন কোনও পালঙ্ক অথবা চেয়ার নির্মাণ করে তখন পালঙ্ক ও চেয়ারের পূর্ণ আদর্শেরই চিন্তা করে। শিল্পীর নিমিত দ্রব্য কখনও নির্দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতিতে ও শিল্পে সর্বত্রই সামান্যরূপ আদর্শ বিবর্তমান, কিন্তু সে আদর্শ কখনও সম্পূর্ণ রূপায়িত হয় না। সৌন্দর্যের আদর্শ ও শিল্পীর কল্পনা উত্তেজিত করিয়া কবিতায়, চিত্রে ও ভাস্কর্যে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সে প্রকাশ পূর্ণ হয় না। সামান্য কিন্তু সদাই পূর্ণ।

অ্যারিস্টটল্‌ বলেন, হেরাক্লিটাসের পরিণাম-প্রবাহ-বাদের সঙ্গে সক্রেটিসের সামান্যদিগের সমন্বয় হইতে প্লেটোর সামান্য-বাদের উৎপত্তি হইয়াছে। হেরাক্লিটাসের মতে জগতে নিত্য পদার্থ কিছুই নাই ; সকলই অস্থির ও ক্ষণ-স্থায়ী; জগৎ পরিবর্তন-প্রবাহমাত্র। পারমেনিদিস ও অন্যান্য দার্শনিকগণ পরিণাম ও গতির অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। বহুর অস্তিত্বও তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে মাত্র এক পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহা নিত্য ও পরিণামবিহীন। পরিবর্তন প্রবাহরূপে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহা

মায়া, তাহার অস্তিত্ব নাই। সক্রেটিসের সামান্য-প্রত্যয়েরও কোন পরিবর্তন হয় না। সক্রেটিস্ মুখ্যত সুবিচার, তিতিক্ষা, সাহস প্রভৃতি সামান্য-প্রত্যয়েরই আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্মনীতির বহির্ভূত সামান্য-প্রত্যয়েও কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। 'গো' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে কোন পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। বিশেষ গরুর পরিবর্তন আছে, যে গরু আজ ছোট আছে, কিছুদিন পরে তাহা বড় হইবে, তাহার পরে তাহা মরিয়া যাইবে। কিন্তু 'গো' এই সাধারণ নামে যাহা বুঝায়, 'গো' শব্দের সংজ্ঞা দ্বারা যাহা নির্দিষ্ট হয়, তাহা পরিবর্তনহীন, তাহা নিত্য। কিন্তু নিত্য হইলেও সামান্য-প্রত্যয় এক নহে, বহু। প্লেটো এই সকল সামান্য-প্রত্যয়কে I[illegible] নাম দিয়া পারমেনিদিসের 'একের' স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বহু হইলেও সামান্যগণ পরস্পর সম্পন্ন, এক অঙ্গীর বিভিন্ন অঙ্গের মত সম্বন্ধ। এই সমস্ত পরস্পর-সম্বন্ধ সামান্যরাজির শীর্ষদেশে যে সামান্য, প্লেটো তাহার নাম দিয়াছেন 'শ্রেয়ঃ'। পারমেনিদিসের 'একের' স্থানে প্লেটো নানা সামান্যের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বন্ধ শ্রেয়ঃ অথবা 'পরমার্থকে' স্থাপন করিয়াছেন। সামান্য শব্দ দ্বারা যে সার্বিক ও অপরিণামী সত্তা ব্যক্ত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুই অপরিণামী নহে।) তাহা নিত্য ও সার্বলৌকিক বলিয়াই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বিশেষ বস্তু হইতে স্বতন্ত্র সত্তা তাহার আছে। সামান্য দ্বারা যে সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহারা বাহ্যদ্রব্য, মনের বাহিরে অবস্থিত। সামান্য-প্রত্যয় (জাতির প্রত্যয়—concepts) মানসিক পদার্থ, মনে তাহাদের স্থিতি। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, তাহারা প্রত্যেকে বিশেষ-অবস্থা-প্রাপ্ত, তাহারা জাতি নহে, জাতির অন্তর্গত বিশেষ। জাতি-জ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য নহে। জাতির অন্তর্গত বিশেষদিগকে পৃথক পৃথকভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কোনও নির্বিশেষ মানুষ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। যে যে ধর্ম থাকিলে কোনও পদার্থ মানুষ পদবাচ্য হয়, প্রত্যেক মানুষে তাহা তো আছেই, তদ্ব্যতিরিক্ত ধর্মও আছে। সুতরাং যখন কোনও একটি মানুষ দেখি, তখন বিশেষত্বপ্রাপ্ত মানুষই দেখি, বিশেষত্ববর্জিত মানুষ দেখিতে পাই না। 'মানুষ' শব্দের সজ্ঞায় যে জীবের বর্ণনা আছে, তাহা বিশেষত্ববর্জিত মানুষ। সেই সংজ্ঞার অনুরূপ যে সামান্য-প্রত্যয় আমাদের মনে আছে, তাহা মানসিক পদার্থ। কিন্তু সেই প্রত্যয়ের যাহা উচ্ছিষ্ট, বিশেষত্ববর্জিত মানুষ। প্লেটো বলেন, ইন্দ্রিয়ের জগতে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও, তাহা আমাদের মনের বাহিরে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান। তাহাদিগকেই প্লেটো সামান্য নামে অভিহিত

করিয়াছেন। সামান্য শব্দ দ্বারা সাধারণত প্রত্যয়ই (মানসিক পদার্থ) বোঝায়। কিন্তু প্লেটোর সামান্য, প্রত্যয় যাহার প্রতিরূপ, তাহা মনের বহির্ভূত স্বতন্ত্র পদার্থ। বিশিষ্ট পদার্থের প্রত্যয়ের বিষয়ও বাহ্য; তাহারা মনের বাহিরে প্রত্যক্ষজগতে অবস্থিত। কিন্তু সামান্য জাতি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যবহারিক জগতে তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাহারা থাকে স্বতন্ত্র জগতে, যেখানে ইন্দ্রিয়ের অধিকার নাই, কিন্তু বুদ্ধির অধিকার অবারিত। ব্যবহারিক জগতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, কিন্তু তাহারা সেই জগতের বিশিষ্ট পদার্থ সকলে অনুস্যূত।

ব্যবহারিক জগতে যদি সামান্যদিগের অস্তিত্ব না থাকে, তবে কোথায় আছে? তাহারা আছে অতীন্দ্রিয় জগতে। কোথায় যে জগৎ? ব্যবহারিক জগতে—দেশ-কালের জগতে—বহু ভিন্ন আর কিছুরই সত্তা নাই, নিত্য কিছু নাই, অনবদ্য পূর্ণ কিছু নাই। কিন্তু এই অপূর্ণ ও দোষযুক্ত প্রত্যেক দ্রব্যেই তাহার আদর্শের, যে আদর্শের তাহা অপূর্ণ প্রকাশ, তাহার ইঙ্গিত আছে। যে জগতে সামান্যদিগের অধিষ্ঠান, তথায় দেবগণ বা পবিত্রাত্মাগণ তাহাদিগকে দেখিতে পান। সে জগৎকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে স্বর্গ দেশ ও কালের অতীত। ব্যবহারিক জগতে যেমন ক্রমভেদ আছে, উচ্চ-নীচ ভেদ নিতান্ত অসম্পূর্ণ দ্রব্য হইতে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতর, তাহার পরে পূর্ণতম দ্রব্য আছে, তেমনি সামান্য জগতেও সামান্যদিগের মধ্যে ক্রমভেদ আছে, অপূর্ণ হইতে পূর্ণতর ও সর্বশেষে পূর্ণতম সামান্য আছে। এই পূর্ণতম সামান্যের নামই শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ের সামান্য যাবতীয় সামান্যের যোজক অর্থাৎ তাহাদের যোগসূত্ররূপে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের একত্ববিধান করে। প্লেটোর দর্শনের পরিণতি এই শ্রেয়ের সামান্যে। সামান্য জগতে প্রত্যেক সামান্য এক একটি বিশেষ, তাহাদের সকলের সমবায়ে তাহাদের একত্ব বিহিত হইয়াছে। সমবেত সামান্য-সংঘ অঙ্গী, প্রত্যেক সামান্য-অঙ্গ। শ্রেয়ঃকে প্লেটো এই জগতের সম্রাট বলিয়াছেন। সূর্য যেমন ইন্দ্রিয় জগতের সম্রাট, জড় জগতের প্রত্যেক অংশ যেমন সূর্য হইতে আলোক ও প্রাণপ্রাপ্ত হয়, তেমনি সামান্যজগতে শ্রেয়ের সামান্য অন্যান্য সামান্যের প্রাণস্বরূপ; তাহা হইতেই তাহাদের সত্তা। শ্রেয়ঃই এই সমস্ত সামান্যের মধ্যে প্রকাশিত জ্ঞানের কারণ। সকল জ্ঞানের কারণই শ্রেয়ঃ। তাহার আলোকেই অন্যান্য সামান্য প্রকাশিত ও জ্ঞাত হয়। সত্তার যাবতীয় প্রকাশ যাহার বিশেষ, তাহার কারণও শ্রেয়ঃ। জ্ঞানের বিষয় যে জ্ঞানগম্য হয়, তাহার কারণ শ্রেয়ঃ। সেই সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বের কারণও শ্রেয়ঃ। সূর্য যেমন যাবতীয় দ্রব্যের প্রকাশক, শ্রেয়ও তেমনি জ্ঞানের যাবতীয়

বিষয়ের প্রকাশক। সূর্য যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল দ্রব্যের উৎপত্তি ও পুষ্টির কারণ, শ্রেয়ঃও তেমনি জ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের উৎপত্তির কারণ। নিম্নস্থ প্রত্যেক **Idea** শ্রেয়ের **Idea**-রই বিশেষ ভাবপ্রাপ্ত অবস্থা।

তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত শ্রেয়ের সম্বন্ধে কি? শ্রেয়ঃই ঈশ্বর, ঈশ্বরই শ্রেয়ঃ। কেহ কেহ বলেন, শ্রেয়ঃ ও ঈশ্বরের অনন্যত্ব প্লেটোর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু তাহাদের অনন্যতা স্বীকার না করিলে জগতে দুইটি স্বতন্ত্র তত্ত্বের অস্তিত্ব মানিতে হয়।

প্লেটো অনেক স্থলে এমন কথা বলিয়াছেন, যাহা হইতে তিনি যে শ্রেয়ঃকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন মনে করিতেন, তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'যত পদার্থ আছে তার মধ্যে শ্রেয়ঃই সর্বোত্তম। শ্রেয়ঃই বিশ্বের আদি, অন্ত, সূর্যের স্রষ্টা ও পিতা এবং সূর্যের স্রষ্টা ও পিতা বলিয়া আমাদের জগতেরও স্রষ্টা ও পিতা।' ঈশ্বরকেও প্লেটো সকলের স্রষ্টা ও পিতা বলিয়াছেন, জগতে যাহা কিছু কল্যাণকর, সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গত, তাহাদের সকলেরই পিতা ও স্রষ্টা বলিয়াছেন। এই সর্বোত্তম সত্তা যে ব্যক্তিত্বহীন, তাহা নহে। অনেক স্থলে প্লেটো তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাকে পিতা ও রাজা বলিয়াছেন। তিনি শ্রেয়ঃকে ইন্দ্রিয়-জগতের ও চিন্তা-জগতের স্রষ্টা বলিয়াছেন। ইহা হইতে তিনি যে শ্রেয়ঃকে বুদ্ধি সমন্বিত পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, তাহা অনুমিত হয়।

[পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড—সংক্ষেপিত।]

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কোম্‌ত দর্শন

কোম্‌ত দর্শন লইয়া এক্ষণে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সমাজে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় পক্ষপাত পরিত্যাগপূর্বক তদীয় প্রধান প্রধান মতগুলি পর্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

কোম্‌ত কেবল দার্শনিক নহেন, তিনি একজন নূতন ধর্মশাস্ত্র প্রবর্তক। এই প্রবন্ধে আমরা তদীয় Positive Philosophy, অর্থাৎ প্রামাণিক দর্শনের স্থূল স্থূল কথাগুলি বলিব।

কোম্‌ত বলেন যে, জগৎকার্য সম্বন্ধে মনুষ্য-সমাজে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইয়া থাকে; প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক; দ্বিতীয় দার্শনিক, কাল্পনিক শক্তিমূলক; তৃতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক। সকল বিষয়ে জ্ঞানেরই উন্নতি-পথে ক্রমান্বয়ে এই তিনটি সোপান আছে।

লোকে যখন প্রথমে বিশ্ব ব্যাপার বুঝিতে যায়, তখন প্রত্যেক কার্যের একটি একটি সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার একটি গূঢ় কারণ আছে। আমাদিগের জ্ঞান স্ফূর্তি হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, আমরা যে সকল কার্য করি, সে সকল আমাদিগের সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতে সমুদ্ভূত। এ নিমিত্ত প্রথমাবস্থায় যেখানে যে কার্য প্রত্যক্ষ করি, সেখানেই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তার কল্পনা করি। এই কারণেই শিশুগণ গতিবিশিষ্ট বা কার্যকরী নির্জীব পদার্থদিগকে সজীব জ্ঞান করে। এই কারণেই প্রাচীনকালে মানবগণ প্রচণ্ড ঝটিকাপ্রবাহে ক্ষুব্ধ সিন্ধুসলিলে, তিমিরবিনাশী দিবাকরে, গৃহকাননগ্রাসী অনলরাশিতে, বিদ্যুন্মালাশোভিত বজ্রগর্জনে দেবতা দেখিতেন।

এইরূপে পুরাকালে পুরাণবর্ণিত বায়ু, বরুণ, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা-গণের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানের প্রথম সোপানকে পৌরাণিক বলা গিয়াছে; আর প্রত্যেক ঘটনাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান ও ইচ্ছা বিদ্যমান দৃষ্ট হইত বলিয়া পৌরাণিক ব্যাখ্যাকে আধ্যাত্মিক ও ইচ্ছামূলক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

কালে কালে যত জগতের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, ততই লোকে জানিতে পারে যে পূর্বে যে সকল পদার্থকে সচেতন বিবেচনা করিয়াছিল, চৈতন্যের পরিচায়ক লক্ষণগুলিই তাহাদিগের নাই। তখন তাহাদিগের দ্বারা কিরূপে কার্য সাধন হয় এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে, তাহাদিগের

অন্তর্নিহিত কার্যসাধিকা শক্তি আছে। এ প্রকার অনুমান অস্বাভাবিক নহে। ইচ্ছার চৈতন্যাংশ বাদ দিলে, কার্যসাধিকা শক্তি ভিন্ন আর কি থাকে? কিন্তু এতদ্দ্বারা কি কোন কার্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়? আদিমাবস্থায় লোকে ভাবে, অগ্নি দেবতা আমাদের ন্যায় ইচ্ছাপূর্বক বস্তুনিচয় ধ্বংস করেন; দ্বিতীয়াবস্থায় লোকে কল্পনা করে যে অগ্নিতে দাহিকাশক্তি আছে তাহাতেই পদার্থ সকল দগ্ধ হয়। কিন্তু অগ্নিতে পদার্থনিচয় দগ্ধ হয়, এতদতিরিক্ত কি জ্ঞান দাহিকাশক্তির নিকটে পাওয়া গেল? যখন পৌরাণিক মতে অনাস্থা জন্মিয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার আরম্ভ হয়, তখন ঈদৃশ শক্তি সকল পরিমাণে কল্পিত হয় বলিয়া, জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপানের নাম দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক রাখা হইয়াছে।

পরিণামে অনেক দেখিয়া শুনিয়া লোকে অবগত হয় যে সকল কার্যেরই নিয়ম আছে; অর্থাৎ নির্দিষ্ট পূর্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা কোন বিষয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং কার্যসাধিকা শক্তি পরিত্যাগপূর্বক নিয়মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমরা তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হই। নিয়মই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য এবং বিজ্ঞান পদে পদে প্রমাণ চায়। এ নিমিত্ত জ্ঞানের চরম সোপানের নাম বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বলিয়া নির্দেশ করা গিয়াছে।

কোম্‌ত বলেন যে বিশ্বমণ্ডলের সকল বস্তুই নিয়মের অধীন। আকাশে যে ধূমকেতু কখন কখন দেখা যায়, আর মানুষের মনে যখন যে ইচ্ছা উদিত হয়, সকলই নিয়মের অধীন। পৃথিবীতে লোকের পদাঘাতে যে রেণুরাশি উড়িতে থাকে, নভোমণ্ডলে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কগণ বিরাজিত, মনুষ্যসমাজে যখন যে ঘটনা ঘটে, সকলই নিয়মের অধীন। উল্কা ছুটিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, পাখি উড়িতেছে, মৎস্য সন্তরণ করিতেছে, মানবসন্তান হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, নাচিতেছে, গাইতেছে, সমাজ বিশেষের উদয়, উন্নতি বা বিলয় হইতেছে, সকলই নিয়মানুসারে। কিন্তু কোম্‌ত যদিও নিয়ম-ভক্ত, তথাপি তিনি অদৃষ্টবাদী নহেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতি অদৃষ্টবাদ দোষ যে আরোপিত হইবে, ইহা আশ্চর্য নহে। কারণ যখন কোন প্রকার কার্য ইচ্ছার অধিকার হইতে নিয়মের অধিকারে আইসে, নিয়মের স্থৈর্য ইচ্ছার অস্থিরতার সহিত তুলনায় এত অবিচলিত লক্ষিত হয় যে, অদৃষ্টশাসনবৎ প্রতীয়মান হইবারই কথা। প্রথমে গগনের জ্যোতিষ্কগণের গতি হইতে নৈসর্গিক নিয়মের যে প্রকার জ্ঞান লাভ হয়, তাহাতেও এইরূপ ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা; যেহেতু যত কেন ইচ্ছা করি না, আমরা তাহাদিগের গতি পরিবর্তন করিতে

সক্ষম নহি। যদিও প্রকৃতির নিয়মাবলী অপরিবর্তনীয়, তথাপি জ্যোতিষাধিকার বহির্ভূত জগৎকার্য সকল অনেক দূর পরিবর্তনীয়। তাপ, তাড়িত প্রভৃতি পদার্থ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিবিধ প্রকার জীব এবং সামাজিক ঘটনা, কত দূর মনুষ্যের ক্ষমতাধীন, প্রতিদিনই দৃষ্ট হইতেছে। যদিও নিয়মানুসারে সকলই ঘটে, তথাপি ইচ্ছানুসারে তাপ, তাড়িত প্রভৃতি কমাইয়া, বাড়াইয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন করিয়া, জীববিশেষকে কার্যবিশেষে নিয়োগ করিয়া, কোনরূপ সমাজ-সংস্কার কার্যের সূচনা করিয়া অভিমতানুরূপ সংযোগ বিয়োগ দ্বারা মানবগণ জগতে কত প্রকার পরিবর্তন সংঘটন করিতেছে।

কোম্‌ত যদিও বিবেচনা করেন যে জগৎকার্য এবং তদীয়নিয়ম এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার অধিকার আমাদের নাই, যদিও তিনি বলেন জগতের মূল কারণ ও চরম লক্ষ্য অপরিজ্ঞেয়, তথাপি তিনি নাস্তিক নহেন। তাঁহার মতে নাস্তিকেরা অজ্ঞেয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা জগতের উৎপত্তি জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি অননুসন্ধেয় ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত। তিনি কহেন যে, যদি নৈসর্গিক নিয়মাতিরিক্ত জগৎকার্য শৃঙ্খলসমুৎপাদক গূঢ় কারণের তত্ত্বানুসন্ধান কর, তাহা হইলে তন্নিহিত বা তদ্বহিঃস্থ ইচ্ছাবিশেষ কল্পনা করা যেমন সঙ্গত এমন আর কিছুই নহে, কারণ এরূপ অনুমান দ্বারা আমাদিগের কার্যসম্ভবা ইচ্ছাব সহিত তাহার সাদৃশ্য রক্ষিত হয়। দার্শনিক শিক্ষাজনিত অহঙ্কার না থাকিলে, কেহই এমন সহজ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ কষ্টকল্পনা করিতে যাইত না এবং যতদিন না লোকে নির্বিকল্পক সত্যানুসন্ধানের নিষ্ফলতা বুঝিয়াছিল, ততদিন এই ব্যাখ্যাতেই মনুষ্যবুদ্ধি সন্তুষ্ট ছিল। কোম্‌তের বিবেচনায় প্রকৃতির পদ্ধতিতে নিঃসন্দেহে অনেক দোষ আছে; কিন্তু সচেতন ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এ অনুমানটি যেমন সঙ্গত, অচেতন যন্ত্রবাদ তেমন নহে। সুতরাং তিনি বলেন যে নাস্তিকেরা পৌরাণিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্তিহীন; কারণ তাহারা পৌরাণিক বিষয় লইয়া ব্যস্ত, অথচ তদুপযোগী অনুসন্ধান প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছে।

কোম্‌ত প্রকৃতির পদ্ধতিতে কিরূপে দোষারোপ করেন, আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার চক্ষে যাহা দোষ বলিয়া লাগে, তাহাই কি প্রকৃত দোষ? বিজ্ঞানবিৎ ও বহুদর্শী হইয়া তিনি কি প্রকারে এরূপ অযৌক্তিক মত প্রচার করিলেন? আমরা জগতের একদেশমাত্র দেখিতেছি, তদুপযোগী যাহা লক্ষিত না হয়, সমুদয় বিশ্বমণ্ডল সম্বন্ধে তাহার অস্তিত্বের আবশ্যকতা নাই, আমরা কি সাহসে বলিব? যদি বলিতে যাই, তাহা হইতে কি আমরা ধরিয়া লই না যে আমরা সকল বস্তুর

বা প্রাকৃতিক কার্যের চরম উদ্দেশ্য জানি ? যাহারা বিবেচনা করে যে সূর্য, চন্দ্র, তারা আমাদিগকে আলোক প্রদান করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতির কার্যে দোষারোপ করিয়া কি কোম্‌ত তাহাদিগের দলে পড়িতেছেন না ?

জগতস্থ সমস্ত ব্যাপারই যে নিয়মের অধীন, কোম্‌ত যদিও এ-মতের প্রতিপোষক অনেক কথা বলিয়াছেন, তথাপি তিনি ইহার সংস্থাপক নহেন। বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিৎ সমাজে এ মতটি চলিয়া আসিতেছে ; এবং বহুবিস্তীর্ণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে। এক একটি নৈসর্গিক নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া ইহার আর একটি মূল এবং প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির যত্নে ইহার পুষ্টিসাধন হইয়াছে। কিন্তু বিগত তিন শত বৎসরের মধ্যে ইহার প্রভাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গালিলিও গতির নিয়ম এবং নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে গগন-মণ্ডলস্থ জোতিষ্কগণ নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ। লাভইসর, ডেবি, ফ্যারাডে, ড্যালটন প্রভৃতির যত্নে প্রকাশিত হইয়াছে যে পদার্থ সকল নির্দিষ্ট নিয়মে সংযুক্ত বিযুক্ত হয়। বিষা (Bichat) গল (Gall) প্রভৃতির পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে শারীরিক-যন্ত্রনিচয়ের কার্য সকলও নিয়মের অধীন। অর্থশাস্ত্রবিৎ, নীতিশাস্ত্রবিৎ এবং ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা সামাজিক ঘটনা সমূহের নিয়মপরতন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে বিজ্ঞানবেত্তৃদলে এই সংস্কারটি দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, যে সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে যুক্তিশালী মনুষ্য মনের চিন্তা পর্যন্ত সমুদয় বিশ্ব ব্যাপারই নিয়মের অধীন।

আমরা জগৎকার্য সম্বন্ধে যথাক্রমে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বন করি এ মতটিও সম্পূর্ণরূপে নূতন নহে। হিউম এবং তুর্গোর গ্রন্থে ইহার আভাস পাওয়া যায়। [See Hume's Natural History of Religion and Turgot's Sur les Progress successifs de Pesprit humain]। কিন্তু কোম্‌ত যেরূপ নানাপ্রকার ঘটনার ব্যাখ্যা এতদ্দ্বারা করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহই করেন নাই এবং ইহার কীদৃশ বহুবিস্তীর্ণ প্রয়োগস্থল আছে, কেহই বিশদরূপে বুঝিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং সম্পূর্ণরূপ নূতন না হউক, কোম্‌ত যে ইহাকে অনেক নূতনত্ব দিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন এবং এক প্রকার যে তিনি ইহার প্রকাশক নামের অধিকারী তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, পিথাগোরস্‌ এবং আর্য্যভট্ট যদিও পূর্বকালে একথা কহিয়াছিলেন, তথাপি কোপার্নিকস এতদসংক্রান্ত প্রবল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষিক মত-

সংস্থাপন রূপে পরিগণিত, তদ্রূপ জ্ঞানোন্নতি বিষয়ক সোপানত্রয়ের আভাস হিউম এবং তুর্গোর লিখিত প্রবন্ধে লক্ষিত হইলেও কোম্‌তকে উহার সংস্থাপক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

জ্ঞানানুশীলনের প্রারম্ভ সময়ে সমুদায় বিজ্ঞান শাখার সমান অবস্থা ছিল; সর্বত্রই পৌরাণিক ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইত। কিন্তু সমকালে সকল শাখা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কোনটা বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে, কোনটা দার্শনিক সোপানে; কোনটা বা পৌরাণিক সোপানেই পড়িয়া রহিয়াছে। কোম্‌ত বলেন, যাহার বিষয় যত সরল তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হইয়াছে। বিষয়ের জটিলতা নিবন্ধন কোনটা বা দার্শনিক, কোনটা বা পৌরাণিক সোপানেই আছে। এইরূপ দৃষ্ট হয় যে একই ব্যক্তির কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মত, কোন বিষয়ে দার্শনিক মত এবং কোন বিষয়ে পৌরাণিক মত। জাতিভেদেও ভিন্ন ভিন্ন ফল লক্ষিত হয়। যে বিষয়ে জাতিবিশেষের বৈজ্ঞানিক মত, তদ্বিষয়েই জাত্যন্তরের দার্শনিক বা পৌরাণিক মত। এই প্রকারে সংসারে অনেক মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। প্রথমে যেমন সকল বিষয়ে পৌরাণিক ব্যাখ্যা গৃহীত হইত বলিয়া লোকসমাজে ঐক্যমত ছিল, পরিশেষে কোম্‌তের বিবেচনায় বিজ্ঞান দ্বারা তদ্রূপ একতা সংস্থাপিত হইবে। যে সকল শাস্ত্র সম্যকরূপে বৈজ্ঞানিক পদ পাইয়াছে, পণ্ডিত সমাজে তাহাদিগের সম্বন্ধে মতভেদ অত্যল্পই দেখা যায়; যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্ট হয় তাহাও বিষয়ের জটিলতার ফল। ক্রমেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার বাড়িতেছে এবং দর্শন পুরাণের অধিকার কমিতেছে। সুতরাং এরূপ আশা করা অন্যায় নহে যে, কালক্রমে বিজয়ী বিজ্ঞানের রাজ্য সর্বব্যাপ্ত হইয়া ঐক্যমত বিধান করিবে।

ভূমণ্ডলের বর্তমান অবস্থা এবং ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সাধারণত কোম্‌তের মতের সত্যতা অনেক দূর দেখা যায়। জ্ঞানবিভূষিত ইউরোপখণ্ডে গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব ও রসায়ন বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে; কিন্তু শারীরতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের অনেকাংশ দার্শনিক বা পৌরাণিক সোপানে রহিয়াছে। এতদ্দেশে কেহ চন্দ্রসূর্যকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের উপাসনা করিতেছেন, কেহ তাহাদিগকে জড় বিবেচনা করিয়াও তাহাদিগের শুভাশুভফল-বিধায়িনী শক্তিতে প্রত্যয় স্থাপনা করেন এবং কেহ বা তাহাদিগের আকার, গতি প্রভৃতি জানিয়াই সন্তুষ্ট। ভারতবর্ষে জল প্রথমে বরুণদেবের আবাস বলিয়া গণ্য হইত; পরে স্নেহশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহার কার্যকলাপের ব্যাখ্যা হইত; এক্ষণে উদজান ও অম্লজানের সমষ্টি বলিয়া উহা শিক্ষিত সমাজে পরিগৃহীত।

অগ্নি পূর্বে দেবতা ছিলেন, পরে দাহিকা শক্তিশালী বলিয়া দহননিপুণ হইয়াছিলেন ; এক্ষণে রাসায়নিক কার্যবিশেষের ফল বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু ভাল করিয়া কোম্‌তের মত বুঝিতে হইলে তদীয় বিজ্ঞান বিভাগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তিনি বলেন যে বিজ্ঞানসকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, মুখ্য বা সামান্য এবং গৌণ বা বিশেষ। সম্ভবস্থল মাত্রে খাটিবে এরূপ নিয়মাবলীর আবিষ্কার করা মুখ্য বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং এই সকল নিয়মের দ্বারা বর্তমান পদার্থপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

সুতরাং জানা যাইতেছে যে শারীরতত্ত্ব মুখ্য বিজ্ঞান, কিন্তু উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা গৌণ বিজ্ঞান ; রসায়ন মুখ্য বিজ্ঞান এবং খনিজ বিদ্যা গৌণবিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রত্যেক গৌণ বিজ্ঞানে অনেকগুলি মুখ্য বিজ্ঞানের সাহায্য লাগে। উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলে কেবল শারীরতত্ত্ব জানিলে চলিবে না। উদ্ভিজ্জ এবং জীবদেহে তাপাদির কার্য বুঝিতে পদার্থতত্ত্ব, পুষ্টিসাধনাদি বুঝিতে রসায়ন এবং বর্তমান জীবোদ্ভিদ্‌গণের সংস্থান ও গুণসকল বুঝিতে মনুষ্যপ্রভাবপ্রকাশক সমাজতত্ত্ব জানা আবশ্যক। এইরূপ খনিজবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্ব জানা চাই। পাথুরিয়া কয়লাও একটি খনিজ পদার্থ, কিন্তু পদার্থতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্ব না জানিলে কে উহার প্রকৃতি এবং উপাদান প্রভৃতি নির্ণয় করিতে পারে ?

মুখ্য বিজ্ঞানদিগকে আবার পরস্পরের সাপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া কোম্‌ত শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমস্থান তিনি গণিতকে দিয়াছেন ; কারণ ইহার বিষয় সংখ্যা, বিস্তৃতি ও গতি এবং এ-সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে অন্য কোন বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক করে না। তাঁহার মতে জ্যোতিষ দ্বিতীয়স্থানের যোগ্য ; কারণ ইহাতে গাণিতিক তত্ত্বাতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মাত্র লইতে হয়। তৃতীয়স্থান পদার্থতত্ত্বকে প্রদত্ত হইয়াছে ; যেহেতু উহাতে গণিতের সাহায্য আবশ্যক এবং মাধ্যাকর্ষণজনিত গুরুত্বাতিরিক্ত তাপ, তাড়িত, শব্দ প্রভৃতির তত্ত্ব নির্ণীত হয়। চতুর্থস্থানে রসায়ন সংস্থাপিত হইয়াছে ; কেননা তাপতাড়িতাদির সহায়তায় পদার্থ সংযোগের নিয়মাবলী নিরূপণ করাই রসায়নের উদ্দেশ্য। পঞ্চমস্থানে শারীরতত্ত্ব সন্নিবেশিত হসয়াছে ; কারণ ইহাতে রাসায়নিক কার্যাতিরিক্ত অনেক দৈহিক ব্যাপারের মীমাংসা করিতে হয়। ষষ্ঠস্থান সমাজতত্ত্বকে দেওয়া হইয়াছে ; শারীরিকতত্ত্বনিচয়কে মূল করিয়া সামাজিক নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করাই ইহার অভিপ্রায়। সপ্তমস্থানে নীতিতত্ত্ব রক্ষিত হইয়াছে ; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ নিরূপণ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য।

বিজ্ঞানশাখাগুলির পরস্পর সাপেক্ষতানুসারে শ্রেণীবন্ধনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবে, যাহার বিষয় যত জটিল তাহাই তত অন্যসাপেক্ষ, যাহার বিষয় যত সরল তাহাই তত অন্যনিরপেক্ষ। গণিতের বিষয় সর্বাপেক্ষা সরল এবং গণিতই সর্বনিরপেক্ষ। নীতিতত্ত্বের বিষয় সর্বাপেক্ষা জটিল এবং নীতিতত্ত্বই সর্ব-সাপেক্ষ। অন্যান্য বিজ্ঞানশাখাগুলির জটিলতার তারতম্যানুসারে অপরসাপেক্ষ।

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে, যে বিজ্ঞানশাখা যতদূর অন্যসাপেক্ষ তাহা তত বিলম্বে বৈজ্ঞানিক সোপানে আরোহণ করিবে। ইতিহাসও এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, গণিতই সর্বাগ্রে বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে; তদনন্তর জ্যোতিষ; তারপর পদার্থতত্ত্ব; তৎপরে রসায়ন। শারীরতত্ত্বের কিয়দংশমাত্র বৈজ্ঞানিক পদে উন্নীত হইয়াছে, সমাজতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব প্রায় সর্বত্রই পৌরাণিক বা দার্শনিক সোপানে পড়িয়া রহিয়াছে। কালসহকারে বিজ্ঞানশাখানিচয়ের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহার বিষয় যত সরল তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উত্তীর্ণ হয়।

কোম্‌ত মুখ্য বিজ্ঞানগুলিকে যেরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দুইটি দোষ দৃষ্ট হয়; প্রথম এই যে, তিনি অন্যায়পূর্বক জ্যোতিষকে মুখ্য বিজ্ঞান-দলভুক্ত করিয়াছেন; দ্বিতীয় এই যে, তিনি মনস্তত্ত্বকে অবিবেচনাপূর্বক উক্ত দলে স্থান দেন নাই। তিনি যখন বলিয়াছেন যে বর্তমান পদার্থপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং যখন তিনি এই কারণে খনিজবিদ্যা, উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যাকে গৌণ বিজ্ঞান শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন তখন তিনি কি প্রকারে জ্যোতির্বিদ্যাকে গৌণ বিজ্ঞান না বলিবেন? বর্তমান সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং তারকাপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করাই জ্যোতিষের উদ্দেশ্য। যদি বল সম্ভবস্থলমাত্রে খাটে এরূপ মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম নির্ণয়ও জ্যোতিষের কার্য, আমাদিগের বিবেচনায় এটি ভ্রম। গণিতের যে ভাগ দ্বারা গতির নিয়মাবলী নির্ণীত হয়, মাধ্যাকর্ষণ তাহারই আলোচ্য একটি বিষয়মাত্র।

আমাদিগের বোধ হয় যে, সমাজতত্ত্বের অব্যবহিত পূর্বেই মনস্তত্ত্ব সংস্থাপন করা আবশ্যক। কেবল কতকগুলি শরীরীর সংযোগে সমাজ সংগঠিত হয় না। কাননে অসংখ্য তরুলতা একত্রে আছে; কিন্তু সেখানে আমরা সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। সেখানে আমরা মনের সহিত মনের ঘাত প্রতিঘাত উপলব্ধি করি, যেখানে অনেকের মন একত্রিত হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত দেখি, সেখানেই কেবল আমরা সমাজ আছে বলিয়া থাকি। অতএব যে মন সমাজের মূলস্বরূপ তদ্বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সংগ্রহ না হইলে সমাজতত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণই হয় না। সুতরাং

সমাজতত্ত্বের পূর্বে মনস্তত্ত্ব সন্নিবেশ করা চাই। আবারও ভাবিয়া দেখ, শরীরী-মাত্রেই মনবিশিষ্ট নহে। জন্ম, পুষ্টিসাধন, বংশবৃদ্ধি, মৃত্যু প্রভৃতি শরীরী সকলেরই আছে; কিন্তু অর্ধেকের প্রায়, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জদলের কাহারও মন নাই। সুতরাং শরীরীমাত্রের সাধারণ তত্ত্বগুলি শারীরতত্ত্ব-বিজ্ঞানের বিষয় রাখিয়া মানসিকতত্ত্ব সমুদায় লইয়া একটি বিজ্ঞানশাখা সংস্থাপন করা উচিত। এতৎসম্বন্ধে আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে। গণিত হইতে শারীরতত্ত্ব পর্যন্ত সকল শাস্ত্রের তথ্যনির্ণয়ার্থে আমরা কেবল বহিরিন্দ্রিয়সাপেক্ষ। মনস্তত্ত্বানুসন্ধানার্থে আমরা একটি নূতন যন্ত্র পাইতেছি; সেটি আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়। কোম্‌ত বলেন যে আন্তরিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিবার শক্তি আমাদিগের নাই; কারণ যখনই আমরা কোন মানসিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিতে যাই, তখনই তাহা বিলীন হইয়া যায়। এ-বিষয়ে আমাদিগের উত্তর এই, যখন আমরা প্রতিক্ষণে জানিতে পারিতেছি যে, আমাদিগের মনে সুখ-দুঃখ কি কোনরূপ চিন্তা উদিত হইতেছে, তখন আমাদিগের আপন আপন মানসিক ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ইহাও কাহারও অবিদিত নহে যে স্মৃতিদ্বারা বিগত মানসিক অবস্থার জ্ঞান অনেকদূর লাভ করা যায়। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সত্য-নির্ণয় বিষয়ে কোম্‌তের আপত্তি বিফল হইতেছে।

কোম্‌তের মতে জ্ঞানোপার্জনের উপায় তিনটি; পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপমা। যখন যে নৈসর্গিক ব্যাপার স্বতঃই আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয় তাহার পর্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অনুসন্ধানের তত্ত্বটি বিশদ করিয়া বুঝিবার জন্য দেশকালপাত্র ভেদে তদীয় পর্যালোচনাকে উপমা বলে আমাদিগের বোধ হয় যে, অন্তরিন্দ্রিয়গোচর বলিয়া আমাদিগের মানসিক ব্যাপারও পর্যবেক্ষণের বিষয়; এবং উপমাটি একপ্রকার কৌশলপ্রতিষ্ঠিত পরীক্ষামাত্র। কোম্‌ত দেখাইয়াছেন যে বিষয়ের জটিলতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বনিরূপণের উপায় বৃদ্ধি ঘটে। গণিতে পর্যবেক্ষণ করিতে হয় কিনা আমরা বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষে কেবল চক্ষুদ্বারা পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়নে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা চলে। শারীরতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্বে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপমা তিনটিই অনেক স্থলে ঘটে। কোম্‌ত যদি মনস্তত্ত্ব পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে আর একটি তত্ত্বনির্ণায়ক উপায়ের বিশেষ উল্লেখ করিতেন, ইহা বলা পুনরুক্তিমাত্র।

[নানা প্রবন্ধ, নূতন সংস্করণ, ইং ১৯৪৪।]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানবসত্য

আমাদের জন্মভূমি তিনটি, তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র। শীতপ্রধান তুষারাদ্রি, উত্তপ্ত বালুকাময় মরু, উৎতুঙ্গ দুর্গম গিরিশ্রেণী আর এই বাংলার মতো সমতলভূমি, সর্বত্রই মানুষের স্থিতি। মানুষের বস্তুত বাসস্থান এক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নয়, সমগ্র মানুষজাতির। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবী তার কাছে হৃদয় অবারিত করে দিয়েছে।

মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। অতীতকাল থেকে পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত। এ শুধু এক-একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষ-জাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। বিশ্বমানবের বাসস্থান— এক দিকে পৃথিবী, আর-এক দিকে সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।

তারতৃতীয় বাসস্থান আত্মিকলোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্ব-মানবচিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারও চিত্ত হয়তো সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারও বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু, একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। অকস্মাৎ মানুষ সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে উৎসুক হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়—যখন সে স্বার্থ ভোলে, যেখানে সে ভালোবাসে, নিজের ক্ষতি করে ফেলে, তখন বুঝি মনের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা সর্বমানবের চিত্তের দিকে

বিশেষ প্রয়োজনে ঘরের সীমায় খণ্ডাকাশ বদ্ধ, কিন্তু মহাকাশের সঙ্গে তার সত্যকার যোগ। ব্যক্তিগত মন আপন বিশেষ প্রয়োজনের সীমায় সংকীর্ণ হলেও তার সত্যকার বিস্তার সর্বমানবচিত্তে। সেইখানকার প্রকাশ আশ্চর্যজনক। একজন কেউ জলে পড়ে গেছে, আর-একজন জলে ঝাঁপ দিলে তাকে বাঁচাবার জন্যে। অন্যের প্রাণরক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ সংকটাপন্ন করা। নিজের সত্তাই যার একান্ত সে বলবে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কিন্তু আপনি বাঁচাকে সব-চেয়ে বড়ো বাঁচা বললে না, এমনও দেখা গেল। তার কারণ, সর্বমানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত।

আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের।

উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি ইস্কুলে-পালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডি দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারি নি কখনও। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু পিতৃদেব সেজন্যে কখনও ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কখনও কখনও তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেন নি।

বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার বার আবৃত্তিদ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থ ভাবে না। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করেছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।

যখন বয়স হয়েছে হয়তো আঠারো কি উনিশ হবে, বা বিশও হতে পারে, তখন চৌরঙ্গিতে ছিলুম দাদার সঙ্গে। এমন দাদা কেউ কখনও পায় নি। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, ভাই, সহযোগী।

তখন প্রত্যুষে ওঠা প্রথা ছিল। আমার পিতাও খুব প্রত্যুষে উঠতেন। মনে আছে, একবার ডালহৌসি পাহাড়ে পিতার সঙ্গে ছিলুম। সেখানে প্রচণ্ড শীত। সেই শীতে ভোরে আলো হাতে এসে আমাকে শয্যা থেকে উঠিয়ে দিতেন। সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের

হাতাটা দেখা যেত। সেদিকে চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।

সুন্দর কাকে বলি। বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপ ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর, যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি না, বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে। পাবনার গ্রামবাসী কবি যখন প্রতিকূল প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের জন্যে 'ট্যাহা দামের মোটরি' আনার প্রস্তাব করেন তখন মোটরির দাম এক টাকার চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। এই মোটরি বা গোলাপের আন্তরিক অর্থটি যখন দেখতে পাই তখনই সে সুন্দর। সেদিন তাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। দেখলুম সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ। আমার এক বন্ধু ছিল, সে সুবুদ্ধির জন্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল না। তার সুবুদ্ধির একটু পরিচয় দিই। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, ঈশ্বরকে দেখেছ?' আমি বললুম, 'না, দেখি নি তো।' সে বললে, 'আমি দেখেছি'। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী রকম'। সে উত্তর করলে, 'কেন। এই-যে চোখের কাছে বিজ্ বিজ করছে।' সে এলে ভাবতুম, বিরক্ত করতে এসেছে। সেদিন তাকেও ভালো লাগল। তাকে নিজেই ডাকলুম। সেদিন মনে হল, তার নির্বুদ্ধিতাটা আকস্মিক, সেটা তার চরম ও চিরন্তন সত্য নয়। তাকে ডেকে সেদিন আনন্দ পেলুম। সেদিন সে 'অমুক' নয়। আমি যার অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হল, এই মুক্তি। এই অবস্থায় চারদিন ছিলুম। চারদিন জগৎকে সত্যভাবে দেখেছি। তারপর জ্যোতিদা বললেন, 'দার্জিলিঙ চলো।' সেখানে গিয়ে আবার পর্দা পড়ে গেল। আবার সেই অকিঞ্চিৎকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা। কিন্তু তার পূর্বে কয়দিন সকলের মাঝে যাকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে, যে ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে—প্রভাতসংগীতের মধ্যে। তখন স্বতই যে ভাবে আপনাকে প্রকাশ করেছে তাই ধরা পড়েছে প্রভাতসংগীতে। পরবর্তীকালে চিন্তা করে লিখলে তার উপর ততটা নির্ভর করা যেত না। গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, প্রভাত-সংগীত থেকে যে কবিতা শোনাব তা কেবল তখনকার ছবিকে স্পষ্ট দেখাবার জন্যে, কাব্য হিসাবে তার মূল্য অত্যন্ত সামান্য। আমার কাছে এর একমাত্র মূল্য এই যে, তখনকার কালে আমার মনে যে-একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস এসেছিল তা এতে ব্যক্ত হয়েছে। তার ভাব অসংলগ্ন, ভাষা কাঁচা, যেন হাতড়ে হাতড়ে বলবার চেষ্টা। কিন্তু 'চেষ্টা' বললেও ঠিক হবে না। বস্তুত চেষ্টা নেই তাতে—অস্ফুটবাক্‌ মন বিনা চেষ্টায় যেমন করে পারে ভাবকে ব্যক্ত করেছে, সাহিত্যের আদর্শ থেকে বিচার করলে স্থান পাওয়ার যোগ্য সে মোটেই নয়।

যে কবিতাগুলো পড়ব তা একটু কুণ্ঠিতভাবেই শোনাব, উৎসাহের সঙ্গে নয়। প্রথম দিনেই যা লিখছি সেই কবিতাটাই আগে পড়ি। অবশ্য, ঠিক প্রথম দিনেরই লেখা কি না, আমার পক্ষে জোর করে বলা শক্ত। রচনার কাল সম্বন্ধে আমার উপর নির্ভর করা চলে না; আমার কাব্যের ঐতিহাসিক যাঁরা তাঁরা সে কথা ভালো জানেন। হৃদয় যখন উদ্‌বেল হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য ভাবোচ্ছ্বাসে, এ হচ্ছে তখনকার লেখা। একে এখনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আমি বলেছি, আমাদের একদিক অহং, আর-একটা দিক আত্মা। অহং যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয়কর্ম মামলা-মকদ্দমা এই-সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই; সেই আকাশ অসীম, বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে বিরাট পুরুষ, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক আমাতেই বদ্ধ, আর-এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট-পুরুষ, যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন তার সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

জাগিয়া দেখিনু আমি, আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ 'পরে।

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপনগীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে লীলা, সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা, নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবনলাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এল বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে

যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে, অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুরুষ। সেই-যে মহামানব তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই-যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়। সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে —

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।

এর দু-চারদিন পরেই লিখেছি 'প্রভাত-উৎসব'। একই কথা, আর-একটু স্পষ্ট করে লেখা—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

এই তো সমস্তই মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির যে সম্বন্ধ সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ করে দেখা, বড়ো ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে সে তার একটা একটা ঐক্য, একটা তাৎপর্য লাভ করে। সেদিন যে দুজন মুটের কথা বলেছি তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম, সে সখ্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন কিছু যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুশি হয়েছিলুম। আরও খুশি হয়েছিলুম এই জন্যে যে, যাদের মধ্যে ঐ আনন্দটা দেখলুম তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর বলেই দেখে এসেছি। যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম অমনি পরম সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম। মানবসম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ,

অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন। সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আঁকু-বাঁকু করে নিজেকে প্রকাশ করেছে কোনোরকমে, পরিস্ফুট হয় নি। সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি। আমি যে যা খুশি গেয়েছি, তা নয়। এ গান দু দণ্ডের নয়, এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, এর অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।

কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন
আজ যবে হয়েছে প্রভাত।

কিসের হরষ-কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল্‌!
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দ হতেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী-পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর-এক দিন।

এই-যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে তা দেখি নি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটা আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই-যে আনন্দের রস তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ। রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই অনুভূতিকে প্রকাশের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু ভালোরকম প্রকাশ করতে পারি নি। যা বলেছি অসম্পূর্ণভাবে বলেছি।

প্রভাতসংগীতের শেষের কবিতা—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হেরো আজি ভোরবেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারি দিকে,
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক,
আজ আমি গান গাহিব না।

এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন কী ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল। যা-কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিলছে, আবার ফিরেও আসছে সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নানা রসে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে। এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়। সেসময় বালকের মন এই অনুভূতিদ্বারা যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তারই অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রভাত-সংগীতের মধ্যে। সেদিন অক্স্‌ফোর্ডে যা বলেছি তা চিন্তা করে বলা। অনুভূতি থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপর খাড়া করে সেটা বলা। কিন্তু,তার আরম্ভ ছিল এখানে। তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতেরও তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে তর্কের কিছু নেই, সেই দেখাকে তখন সত্যরূপে জেনেছি। এখনও বাসনা আছে, হয়তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোন-এক শুভমুহূর্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনও দেখতে পাব। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখছিলুম, সেইজন্যেই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তা নিয়ে তর্ক কেন— স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।

৩

বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এ পারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা, দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর—ধূ ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি। সেখানে যে-সব ছোটো গল্প লিখেছি তার মধ্যে আছে পদ্মা-তীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ 'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি', 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।

সেই সময়কার একদিনের কথা মনে আছে। ছোটো শুকনো পুরানো খালে জল এসেছে। পাঁকের মধ্যে ডিঙিগুলো ছিল অর্ধেক ডোবানো, জল আসতে তাদের ভাসিয়ে তোলা হল। ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেছে। তারা দিনের মধ্যে দশবার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নিচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল ; সামনে দেখতে পেলুম নিত্য-কালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করেছি, যা ভোগ করছি, চারদিকে ঘরে-ঘরে জনে-জনে মুহূর্তে-মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নাটক নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ডপ্রকাশ চলেছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরমদ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্ত-ভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্য-সাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

এমনি করে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবা-মাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীরভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল।

একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসরযাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন ; ইচ্ছে করছে, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করছেন তাঁর নিত্যে। তখনই মনে হল, আমার একদিক থেকে বেরিয়ে এসে আর-একদিকের পরিচয় পাওয়া গেল। এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। আমার মধ্যে এ এবং সে—এই এ যখন সেই সে'র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।

সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম, আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজনমান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু, পরমপুরুষ আছেন সেই-সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুইদিককে

সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারি নে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখি নে। কোনো-এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যে।

ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমীন সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলুম, 'তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।'

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতির সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্ব মানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেককাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত ; তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।

যিনি সর্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, 'লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।' এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত, আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিলমানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝাবার শক্তি আমার নেই। কেননা আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না।

আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।

এক সময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পালাবার ইচ্ছে করেছি, শান্তি পাই নি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েছি। প্রলোভনের হাত থেকে এমনিভাবে উদ্ধার পেয়েছি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম, মানব-নাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই যে দেখা একে ছোটো বলব না। এও সত্য। জীবন-দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে]